সাধনকুসুমাঞ্জলি

ওঁ ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ রাধিকানাথ বিষ্ণুপাদানুগত
ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী

বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক রচিত

১৩৪৩ সাল

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

শ্রীধামনবদ্বীপস্থ লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ
হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্, এস্ সি,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

২। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
উকিল, হাইকোর্ট, ত্রিপুরা রাজ্য,
পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য।

৩। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস,
পোঃ যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণা।

৪। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৫। বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ২১নং পটুয়াটোলা লেন,
ক্লাসিক প্রেসে
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমো নমঃ

"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ",—শ্রীভগবদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবে সমস্ত দেবতাই আছেন। তিনি সর্ব্ববেদময়ও বটেন। ভগবৎপ্রাপক ভগবৎপ্রকাশক জ্ঞানঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ভগবানের কথা যেমন মধুর, যেমন স্পষ্ট, বেদ বুঝি তেমন মধুর করিয়া, তেমন স্পষ্ট করিয়া ভগবানের কথা বলেন না,—শ্রীমূর্ত্তি যে বাৎসল্যঘন, করুণাঘন বিগ্রহ, সাক্ষাৎ করুণা বিতরণের জন্যই প্রকট হয়েন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন লীলাপ্রকটবিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিসাধনকে উপলক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধিৎসু হইয়া বেদকল্পকাননে বিচরণ করেন, তখন তাঁহার কোমলকরস্পর্শে নিগমবল্লীসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া শোভাসার ধারণ করে ; তিনি তখন তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মর্য্যাদা প্রকটনপূর্ব্বক তাঁহার **সাধনের** ধন, তাঁহার প্রাণের ধন **কুসুম**রাজি অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করেন। ইহা যেন শ্রীগঙ্গার গঙ্গাজলে শ্রীগঙ্গাপূজা। মাতা গঙ্গা যখন মানবী হইয়া আসিয়া গঙ্গা পূজা করেন, তখন তাঁহাকে গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করিতে হয়। বেদময়তনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'সাধনকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীগুরুপূজাও ঠিক তাহাই। এই শ্রীগুরুপূজা দর্শনের ভাগ্য হইল ইহাতেই জন্ম সফল মনে করিতেছি। নির্ম্মাল্য গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করার ধৃষ্টতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা ক্ষমা করুন।

শ্রীগ্রন্থে যে সমস্ত রহস্য বিবৃত হইয়াছে তাহা সাধনরাজ্যের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহা বিচিত্র রত্নরাজির একত্র অপূর্ব্ব সমাবেশ, ইহা সাধনশিল্পীর নিপুণতার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে এই রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয় না, শাস্ত্রজ্ঞানে এবং সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ সাধনে পরিপক্বতার ফলেই এই দুর্ল্লভ তত্ত্বরহস্য উদ্ঘাটিত হয়। পরমার্থেচ্ছু সুধীজন অনুসন্ধান করিলে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। দার্শনিক তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভাষার জটিলতা নিবন্ধন স্থানে স্থানে আলোচিত বিষয় দুরধিগম্য হইলেও সাধারণ পাঠকও অনায়াসেই মূলতত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ গ্রন্থকার তাঁহার অতি প্রিয় শুদ্ধভক্তি সাধনের কথা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির লক্ষণ, ভক্তির জাতি, ভক্তির ফল প্রভৃতির বিষয় যে প্রকার শাস্ত্রানুগত দার্শনিক যুক্তি সহকারে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে তাহা অতি অভিনব বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। এই প্রকার

ভাগবতী ভক্তি তত্ত্বের দার্শনিক বিবৃতি সমূহের একত্র সমাবেশ কোনও বাঙ্গলা গ্রন্থে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুধীজনের কেহও যদি এই গ্রন্থপাঠে শুদ্ধভক্তির মহিমা অবগত হইয়া সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ে সেই সাধনের পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই গ্রন্থপ্রকাশে পূজনীয়া বিখ্যাত লেখিকা বিদুষী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, পরম পূজনীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীল হরিদাস গোস্বামী মহোদয়ের বিদুষী কন্যা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সুশীলা সুন্দরী দেবী এবং ঢাকা বালিয়াটির জমিদার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা হেমনলিনী চৌধুরাণী মহাশয়াগণ বিশেষ অর্থসাহায্য করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এতাদৃশ প্রচুর সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। মাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানহীন সর্ব্বথা অসমর্থ জনের উপর এই গ্রন্থ প্রকাশের গুরুভার অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার করুণা এবং স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদৃশ জনের স্বভাবসুলভ ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। আশা করি পাঠকপাঠিকাগণ করুণা করিয়া যথাযোগ্য সংশোধন করিয়া লইবেন। নিবেদন ইতি—সন ১৩৪৩ সালের ৩১শে ভাদ্র।

শ্রীগুরুশ্রীবৈষ্ণবচরণকৃপাপ্রার্থী

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ
১। সাধন	১
২। সৎসঙ্গ	৩৫
৩। মালাধারণ	৫১
৪। তিলকধারণ	৫৮
৫। একাদশী ব্রত রহস্য	৬৬
৬। সদ্‌গুরু	৬৯
৭। জপরহস্য	৮৫
৮। বৈধী রাগানুগা ভক্তি	৯৭
৯। যোগমায়া	১১৪
১০। প্রারব্ধখণ্ডন	১২৮
১১। সম্প্রদায় ভেদ	১৪৯
১২। সাধনে 'সাবধান' শতক	১৭২

———

ওঁ ভাগবতপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য -

শ্রীল শ্রীরাধিকানন্দরাধিকানাথবিষ্ণুপাদ জয়ন্তি

সমর্পণ

যাঁহার শ্রীশ্রীপাদপদ্মগলিত কৃপামকরন্দ সুগন্ধ অনাদি বিষয়বাসনাপূতি-গন্ধপূর্ণ মাদৃশ অধম জীবনকেও সুগন্ধময় করিয়া শ্রীমদনগোপাল পাদপদ্মে সমর্পণের যোগ্য করিতে সক্ষম, সেই শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদ রাধিকানাথের করুণ সন্ন্যাসবিগ্রহের প্রীত্যুদ্দেশে তাঁহারই কৃপাকল্পলতিকা প্রসূত আমার বাণী রূপে প্রস্ফুটিত সাধনোপদেশাবলী কুসুমাঞ্জলির ন্যায় তাঁহার অর্চ্চনের যোগ্য হউক।

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সাধনকুসুমাঞ্জলি

সাধন
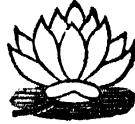
সাধন বলিতে সাধ্যতে হনেন ইতি সাধনম্ অর্থাৎ যাহা দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া ফলটি সাধিত হয় তাহাকেই সাধন বলা যায়। অখণ্ড জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অভাবময় বিমুখতা নিবন্ধন জীব অনাদি কাল হইতে মায়া বৃত্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া নিজের স্বরূপ জ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছে এবং মায়ায় রচিত দেহাদি জড় বস্তুতে আত্মভাব পোষণ করিয়া মায়ার বৃত্তি কাল কর্ম্ম গুণাদির অধীন হইয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ সংসার তাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। জীবের এই দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তি রূপ পরম ফল সাধিত হয় যাহার দ্বারা তাহাই জগতে প্রকৃত সাধন। তাদৃশ সাধনের কথাই যৎকিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন ভাবে বলা যাইতেছে। বস্তুতঃ জীব যাহা কিছু সাধন করে তাহা একমাত্র দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির লালসায়ই করে। কিন্তু অবিদ্যা-গ্রস্ত ভ্রান্ত জীব দুঃখনিবৃত্তির এবং সুখপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা না পাইয়া

মরুবিচরণশীল বারিপিপাসাতুর মৃগের ন্যায় এই সংসার মরীচিকায় ছুটাছুটি করিতেছে। হায়, জীব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ছুটাছুটি করিয়াও কোথাও তাহার অভীষ্ট শান্তি পাইতেছে না। এই মায়ারচিত সংসার তাপের নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরমানন্দ রূপ পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যে কারণ নিবন্ধন এই দুঃখ সেই কারণের নাশ করা চাই। পরতত্ত্বের বৈমুখ্যই যখন দুঃখ সমূহের নিদান তখন বৈমুখ্য বিরোধী পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য হইলেই জীবের সংসার তাপ নিবৃত্তি হইতে পারে। পরতত্ত্বের উপাসনাই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য। পরতত্ত্বের উপাসনা হইতেই পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। আর পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলেই অজ্ঞান জনিত যাবতীয় দুঃখ নিবৃত্তি স্বয়ংই হইয়া যায়। সাধু শাস্ত্র গুরু কৃপায় প্রথমতঃ সামান্য ভাবে পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে উপাসনার দ্বারায় অন্তর্বহিঃ সাক্ষাৎকার রূপ পরতত্ত্বের অনুভবই ইহার ফল হয়। সেই সাক্ষাৎকারের স্বতঃ আনুষঙ্গিক ফল সমগ্র দুঃখের নিবৃত্তি আপনিই হইয়া যায়। আর এই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। জীবের স্বরূপজ্ঞান বিস্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখের কারণ একমাত্র পরতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞানই। এই অজ্ঞানটি স্বপ্রকাশস্বরূপ পরতত্ত্বের অভিব্যক্তিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই পরমার্থ শাস্ত্রে এই পরতত্ত্ব বিষয়ে সাম্মুখ্য রূপ উপাসনাই **সাধন** বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরতত্ত্বের সাধনকে প্রথমতঃ সামান্য ভাবে দুই প্রকারে বিভাগ করা যায়। একটির নাম নির্ব্বিশেষ সাম্মুখ্য, অপরটি সবিশেষ সাম্মুখ্য, অর্থাৎ, জ্ঞানরূপ সাধন আর ভক্তিরূপ সাধন। পরতত্ত্বের ব্রহ্মাখ্য নির্ব্বিশেষাবির্ভাবের উপাসনাকে জ্ঞানসাধন বলা যায়, ঐ একই পরতত্ত্বের ভগবদাখ্য সবিশেষাবির্ভাবের উপাসনাটি ভক্তিসাধন নামে অভিহিত হয়। মোটামুটি ভাবে ইহাকে নির্ব্বিশেষ উপাসনা আর সবিশেষ উপাসনা এই দুই প্রকার বলা যায়। ইহা ভিন্ন কর্ম্ম নামক আর একটি সাধন আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ কর্ম্ম নামক উপাসনাটি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানোপাসনা এবং সবিশেষ ভক্তি-উপাসনার দ্বার মাত্রই হইয়া থাকে, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মসাধন ব্রহ্মার্পিত হইলে ক্রমশঃ চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় যোগ্যতা আনয়ন করে, এই হেতু ঐ কর্ম্মসাধনটিকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার দ্বার বলা যায়,

আবার ঐ প্রকার ভগবৎসন্তোষণার্থে কর্ম্মটি সমর্পিত হইলে ক্রমশঃ চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক সবিশেষ ভগবদ্‌ভক্তিসাধনে যোগ্যতা আনয়ন করে বলিয়া ভক্তিসাধনেরও দ্বার হইতে পারে। সুতরাং কর্ম্মসাধনটিকেও পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য রূপে পরিগণিত করা যায়। তাই জীবের অধিকার ভেদে এই তিন প্রকার সাধনই শাস্ত্রে কর্ত্তব্য রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যে কর্ম্মটি ব্রহ্মে বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত না হয় তাহা সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক উহা সংসার তাপ নিবৃত্তির উপায়ীভূত সাধন হইতে পারে না। তাদৃশ কর্ম্ম নিরন্তর অভদ্র অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুই প্রদান করে।

সংক্ষেপে জ্ঞানকর্ম্মভক্তি সাধনের অধিকারী নির্ণয় করা যাইতেছে, যথা, যাঁহারা ঐহিক পারলৌকিক বিষয় প্রতিষ্ঠা সুখ সমূহে বিরক্ত চিত্ত বশতঃ ঐহিক পারত্রিক বিষয় সুখের সাধন স্বরূপ লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম সমূহকে ত্যাগ পূর্ব্বক **কেবলমাত্র** সংসার মুক্তি কামনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই শাস্ত্রে জ্ঞানসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর যাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সুখ সমূহে অনুরক্ত চিত্ত হেতু সেই সেই সুখের সাধন স্বরূপ লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম সমূহকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধেই কর্ম্মযোগ সাধনের বিধান করা হইয়াছে। আর যাঁহারা পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ এবং কৃপা জনিত কোনও অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলময় ভাগ্যে শ্রীভগবৎ কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারাই ভক্তিসাধন মার্গে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এই—জ্ঞানসাধন অধিকারে বিষয়-বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষুত্ব, কর্ম্মাধিকারে বিষয়ানুরক্তি এবং কর্ম্মাসক্তি, আর ভক্তিসাধন অধিকারে কেবল ভগবৎ কথাদিতে শ্রদ্ধাই হেতু।

জ্ঞানসাধন

জ্ঞানসাধন বলিতে পরতত্ত্বের সহিত নিজের অভেদজ্ঞানে যে উপাসনা তাহাকেই বুঝায়। **জ্ঞানমৈকাত্ম্যদর্শনম্।** অভেদোপাসনং জ্ঞানম্ ইতি। এই অভেদ উপাসনাকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা বলা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে এই প্রকার অভেদোপাসনাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা বলা যায় কেন? ইহার উত্তরে একটি গূঢ় রহস্য আছে—যথা, জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত অভেদ

জ্ঞানে মননাদির দ্বারা যে উপাসনা তাহা সবিশেষ ব্রহ্ম ভাবে হইতেই পারে না, কারণ সবিশেষ বলিতে বিশেষণ বিশিষ্টকেই বুঝায়। ব্রহ্ম বিশেষণ বিশিষ্ট এই প্রকার জ্ঞান হইলে ব্রহ্মে যে সকল সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বসৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তৃত্ব, মায়াতীতত্বাদি বিশেষণ এবং জীবগত যে অল্পজ্ঞত্বাদি বিশেষণ সমূহ ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন এই প্রকার জ্ঞানই হইয়া উঠিবে। সুতরাং তত্তদ্-বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয়ের আত্যন্তিক অভিন্নতা বোধ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। তাই ব্রহ্মের বিশেষণগুলি এবং জীবের বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের শুদ্ধ চিদংশ মাত্রই উপাসনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া যে মনন নিদিধ্যাসনাদি করা যায় তাহাতে অভেদ উপাসনা সিদ্ধ হয়। এই জন্যই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনাই অভেদ উপাসনা বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রথমতঃ "জীবব্রহ্মৈক্য" জ্ঞানের অনুকূল শাস্ত্র শ্রবণ করিবে, তাদৃশ অধ্যাত্ম জ্ঞানশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয় তাহাই আবার মনন দ্বারা বিচার করিয়া বিজ্ঞানে অর্থাৎ অনুভবের স্তরে দাঁড় করাইবে; ঐ শ্রোতব্য আত্মবিষয় জ্ঞানটিকে এমন ভাবে মনন দ্বারা বিচার করিবে যাহাতে জড়াতিরিক্ত একমাত্র চিদ্‌বস্তুর উপলব্ধি হয়; তাহার পর বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত চিন্মাত্র আত্মবিষয়ক মননটিকে নিদিধ্যাসনে পরিণত করিবে; অর্থাৎ স্থির সুখময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণসমূহকে একত্র নিরুদ্ধ করিবে, সেই নিরুদ্ধ প্রাণবর্গকে মনস্তত্ত্বে নিলয় করিয়া মনের বৃত্তি সমূহকে বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে আবার বুদ্ধির দ্রষ্টা জীবে লয় করিয়া শেষে শুদ্ধ জীবাত্মাতে বুদ্ধিসহ বুদ্ধিদ্রষ্টাকে নিলয় করিবে। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে যখন স্থূল সূক্ষ্ম দেহের সম্বন্ধাবেশ রহিত হইয়া চিত্তের বিষয়াকারতা শূন্য হয় (ইহাই জ্ঞানমার্গে চিত্তশুদ্ধি), তখন তাদৃশ শুদ্ধচিত্তে ত্বম্ পদার্থ অর্থাৎ শুদ্ধ জীবতত্ত্ব প্রকাশ পায়। তদনন্তর চিদাকারতাভেদরূপে শুদ্ধ সূক্ষ্ম জীবতত্ত্বে তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া ব্রহ্ম স্বয়ংই আবির্ভূত হয়েন, ইহাই ব্রহ্মৈক্য সাধন। তখন সেই সাধক চিদাকারত্বাভেদরূপে তাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মভূত স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন, ইহাকে **স্বরূপাবস্থান** বলে। ইহাকে নির্ব্বিশেষ সমাধিও বলা যায়। জ্ঞানমার্গ সাধনে ইহাই শেষ সাধন। জ্ঞানীর এই প্রকার নির্ব্বিশেস জ্ঞানের অধিক আর কোন সাধন নাই এবং আর কোন

অনুভবও নাই। এই অবস্থাকেই অনন্যবোধ্যাত্মতা বা ব্রহ্মৈক্য বা জীবন্মুক্ত জ্ঞান অথবা অভেদজ্ঞান ইত্যাদি বলা যায়। তাদৃশ অবস্থাপন্ন জ্ঞানী আর কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কেবলমাত্র অখণ্ডনীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম * অনভিনিবেশে ভোগ পূর্ব্বক দেহান্তে শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে মোক্ষাবস্থা লাভ করেন। ইহাকেই শাস্ত্রে কৈবল্যমুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয় ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপটি সশক্তিক অদ্বয় জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্বের একটি আবির্ভাব বিশেষ। অদ্বয় জ্ঞানানন্দ পরতত্ত্ব সেই জ্ঞানানন্দেরই স্বরূপভূতা শক্তির বৈচিত্রী নিবন্ধন বিবিধ বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়াও বিষয়বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু জ্ঞানী ব্যক্তির যে আত্মানাত্ম বিবেকময় জ্ঞান সাধন সেই সাধনে স্বরূপ শক্তির বিশেষ আবির্ভাব না থাকায় পরতত্ত্বে স্থিত স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী-গ্রহণে অসমর্থ এবং কেবল আত্মানাত্ম বিবেক পরিপক্ক ফলে শুদ্ধতা লাভ করায় কেবলমাত্র শুদ্ধ জীবচৈতন্যের প্রকাশযোগ্য চিত্তে শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বরূপ শক্তির বিলাসবৈচিত্র্যকে আবিষ্কার না করিয়া সামান্যতঃ চিন্মাত্র সত্তা রূপে যে প্রকাশিত হয়েন তাহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়, ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আবির্ভাব। ইহা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বরূপ মাত্র। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে ধর্ম্ম ধর্ম্মী এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান হয় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবির্ভাবেও ধর্ম্ম শক্তি শক্তির বৈচিত্রীসমূহ এবং ধর্ম্মী শক্তিমান্ এই প্রকার বিবিক্ত জ্ঞান হয় না। দার্শনিক ন্যায়ে বস্তুতঃ সবিশেষ বস্তুর জ্ঞানটি নির্ব্বিকল্প রূপেই হইয়া থাকে। এখানে এতটুকুই বিশেষ বিবেচ্য যে অদ্বয় জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্বটি স্বরূপশক্তির বিচিত্র বিলাস বিকল্প বিশেষে বিশিষ্ট বস্তু হইলেও ক্বচিৎ শাস্ত্রে অথবা ক্বচিৎ উপাসকচিত্তে বৈশিষ্ট্য বিনা সামান্যতঃ উপলভ্যমান পরতত্ত্বই ব্রহ্ম। ইহা সেই পরতত্ত্বের শুদ্ধ বিশেষ্য রূপে আবির্ভাব। পরতত্ত্বের শুদ্ধ বিশেষ্য রূপে যে আবির্ভাব তাহা কেবল চিন্মাত্র রূপেই অনুভূত হয়। তাহাতে স্বগত নানা বিশেষ থাকিলেও সাধনাধিকার যোগ্য শক্তি দ্বারা তত্তৎ বিশেষ সকল গ্রহণ হয় না বলিয়াই নির্ব্বিশেষ বলা যায়। কিন্তু সবিশেষ

---

*তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানেও জ্ঞানীর প্রারব্ধখণ্ডন হয় না, প্রারব্ধেতর কর্ম্ম সমূহ খণ্ডন হয়, ইহার কারণ এই গ্রন্থের "প্রারব্ধখণ্ডন" প্রবন্ধে বলা হইবে।

সাম্মুখ্য ভক্তিসাধন দ্বারা তত্তৎ বিচিত্র স্বরূপ শক্তি বিলাস বৈভব যুক্ত পরতত্ত্বের বিশেষ আবির্ভাবের উপলব্ধি হয়। ইহা পরে বলা যাইবে।

প্রশ্ন—যদি সাধনবশে সাধকচিত্তের ভাবানুযায়ী নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ উভয় রূপেই পরতত্ত্বের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য আবির্ভাব? কেননা এক বস্তু দুই প্রকার হইলেই ত সন্দেহ হইয়া উঠে।

উত্তর—দুই আবির্ভাবই সত্য; এখানে কোনও সন্দেহ নাই, কেননা একই বস্তুর সামান্যোপলব্ধি এবং বিশেষোপলব্ধি এই দুই প্রকারে ভেদ, বস্তু একই। সাধকের নিজ নিজ দর্শন যোগ্যতার ভেদে দুই প্রকার অধিকারী কর্ত্তৃক দুই প্রকারই দৃষ্ট হয়, এবং দুই প্রকারে উপাসিত হয়। আবার এক বস্তুই যদি কোনপ্রকার শক্তির দ্বারা বিকৃত হয় তাহা হইলে ঐ বিকৃত অংশ সকলকে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার ভেদ একই বস্তুতে হইতে পারে এরূপ আশঙ্কাও এখানে করা যায় না। কারণ অখণ্ড জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব বস্তু সর্ব্বথা নির্ব্বিকার, ইহাতে যাবতীয় বিকার নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং উহা বিকারময় আবির্ভাব নহে, ঐ দুইই সত্য আবির্ভাব।

প্রশ্ন—নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব এবং সবিশেষ আবির্ভাব ইহা ত সাধকচিত্তের যোগ্যতা অনুসারেই হয়। সাধকচিত্তের যোগ্যতাও তাহাদের নিজের নিজের সাধনানুযায়ী হয়। তাহা হইলে মূল পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ আবির্ভাব এই দুইএর কোনটিই সত্য নহে। সাধকের সাধনা ত কল্পনা মাত্র এবং উক্ত দুই প্রকার আবির্ভাবও সাধকের কল্পনারূপ সাধনের ফল কাল্পনিক অনুভব মাত্র!

উত্তর—আপনার প্রশ্ন ত পাশ্চাত্য চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। সাধনটিকে আপনি কল্পনা বলিতেছেন কেন? কল্পনা শব্দের অর্থ কি? যাক্, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—এই যে সাধন যাহাকে আপনি কল্পনা কল্পনা বলিতেছেন, বলুন দেখি যে বিষয়ে কল্পনা করা যায় সেই কল্পনা এবং বিষয় উভয়ের মধ্যে কল্পনাটির অস্তিত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী, তারপর বিষয়ের অস্তিত্ব, না, বিষয়টির অস্তিত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী, তারপর কল্পনার অস্তিত্ব? বরং আমাদের

দৃষ্টিতে বিষয় ভিন্ন কল্পনার সম্ভবই নাই। আপনি কি শুনিয়াছেন যে কেহ বসিয়া বসিয়া আকাশকুসুমের ধ্যান করিতেছে বা আপনার মতে কল্পনা করিতেছে, অথবা তাহার সৌরভ লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে ?

আমাদের আর্য্য হিন্দু মতে এই পরতত্ত্বের সাধন এবং পরতত্ত্বের আবির্ভাব এই উভয়ই নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, অর্থাৎ পরত্ত্বের আবির্ভাব অনুসারেই সাধন এবং সাধন অনুসারেই পরতত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সুতরাং সাধনটি একটি মিথ্যা বস্তুর কল্পনা মাত্র নহে, এবং পরত্ত্বের আবির্ভাবও কোন খামখেয়ালী মনের একটি মিথ্যা কল্পনাও নহে; সাধনটি সত্য বস্তু গ্রহণের যোগ্যতা লাভের সত্য উপায় স্বরূপই, আর আবির্ভাবটিও সেই সত্য গ্রহণ যোগ্যতার সত্য উপায়ের সত্য ফল; সুতরাং সাধন যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য হেতু একই পরতত্ত্বের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য হয়। একই অখণ্ড জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্বেরই একটি বিশেষণে অবিশিষ্ট আবির্ভাব (ব্রহ্ম), আর একটি বিশেষণ বিশিষ্ট আবির্ভাব (ভগবান্)। বস্তু একই, কেবল আবির্ভাবের ভেদে ব্রহ্ম আর ভগবান্।

এখানে আর একটি কথা বলি যে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধনটি ভক্তিশূন্য শুদ্ধ জ্ঞানসাধন নহে। তাদৃশ জ্ঞান সাধনে ব্রহ্মানুভব হয় না, ইহাই শ্রীভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রানুগত বৈষ্ণবদিগের মত। ভক্তিশূন্য যে জ্ঞান তাহা "ক্লেশল এব শিষ্যতে" অর্থাৎ ক্লেশমাত্রই সার, সুতরাং জ্ঞান-সাধনেও ভক্তির সংযোগ থাকা চাই। তবে যে তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে তাদৃশ জ্ঞানসাধনের কালে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কিঞ্চিৎ ভক্তিসাধন থাকিলেও তাহা জ্ঞানসাধনের ফল ব্রহ্মৈক্য সিদ্ধ হইবার উপযোগী যোগ্যতা সম্পাদনের জন্যই যতটুকু ভক্তির সাহায্যের প্রয়োজন ততটুকু পর্য্যন্তই ভক্তি শক্তির আবিষ্কার। তাহাও আবার ব্রহ্মৈক্যজ্ঞান কালেও থাকে না, এই নিমিত্ত উহাকে জ্ঞানই বলা যায়।

প্রশ্ন—যদি জ্ঞানসাধন কালে সাধনভক্তির সাহায্য থাকে তাহা হইলে সেই ভক্তির সাহায্যে সবিশেষ পরতত্ত্বের অনুভব না হইয়া শুদ্ধ চিন্মাত্র

নির্ব্বিশেষ পরতত্ত্বের অনুভবই মাত্র কেন হয়? আপনি ত বলিতেছেন ভক্তিসাধন দ্বারাই স্বরূপ শক্তি বিলাস বিশিষ্ট পরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

উত্তর—জ্ঞানসাধনে যাহা কিঞ্চিৎ ভক্তিসাধন আনুষঙ্গিক রূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহার যৎকিঞ্চিৎ শক্তির প্রভাব জ্ঞানসাধনকে পূর্ণ করে মাত্র। তাদৃশ অভেদ উপাসনারূপ জ্ঞানসাধনে ভক্তির আবির্ভাবটি মুখ্যরূপে না হইয়া জ্ঞানের অঙ্গ রূপে গৌণীভূত হইয়াই থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞানসাধনে যৎকিঞ্চিদ্ ভক্তির সাধন থাকিলেও ভক্তিশক্তির প্রবল আবির্ভাব হয় না। অথচ ভক্তিশক্তি বিনা পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যলাভও হইতে পারে না। **পরতত্ত্বের সর্ব্ববিধ সাম্মুখ্যলাভে সর্ব্বত্রই একমাত্র ভক্তিরই উপজীব্যতা,** "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদি শ্রীগীতা ভাগবত বচন। যেমন রাজোপজীবী ভৃত্যের বিবাহাদি কর্ম্মে অন্যান্য ভৃত্যের সহিত মিলিত হইয়া তদনুগত ভৃত্য ভাবে রাজা স্বয়ং কর্ম্মাদি করিয়া ভৃত্যের কর্ম্মের সৌষ্ঠবাদি সম্পাদন করেন, সেখানে যেমন রাজোচিত স্বাধীন শক্তির প্রকটন করেন না, সেইরূপ ভক্তিও নিজের স্বাধীন শক্তি প্রকটন না করিয়া স্বেচ্ছায় গৌণরূপে থাকিয়াই জ্ঞানের সাধনকেই মাত্র পুষ্ট করেন, এবং তাদৃশ জ্ঞানসাধনের ফল-স্বরূপ "ব্রহ্মৈক্য" জ্ঞান দান করেন। ইহা ভক্তিসহায় জ্ঞানসাধনেরই ফল। কিন্তু যে অভেদোপাসনা জ্ঞানসাধনে কোনও অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভক্তিসাধন মুখ্যরূপে বিরাজ করেন সেখানে তাদৃশ জ্ঞানের ফলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবের পরেও ভক্তি সংস্কার বলে জ্ঞানী ভগবৎ প্রেম লাভ পূর্ব্বক সবিশেষ ব্রহ্মানুভবও করেন, ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে মাত্র জ্ঞানসাধনের অঙ্গ স্বরূপ আত্মানাত্ম বিবেক বৈরাগ্য যোগ নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মাদির ন্যায় ভক্তির অঙ্গ ও গৌণ-রূপে অনুষ্ঠিত হয় সে স্থলে আর সবিশেষ পরতত্ত্বের অনুভব হয় না, কেবল আত্মানাত্ম জ্ঞান মাত্রই পরিপুষ্ট হইয়া ব্রহ্মানুভব মাত্রই লাভ হয়।

জ্ঞানমার্গের সাধনকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ভক্তি-রহিত কেবল জ্ঞানসাধন আর একটি ভক্তিসহিত জ্ঞানসাধন। ভক্তিরহিত

কেবল জ্ঞানীর জ্ঞানানুশীলন তুষাবঘাতনের ন্যায় বিফল। ভক্তিসহিত জ্ঞানসাধনকে ও আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার ভক্তি-সহিত জ্ঞানসাধন যাহাতে ভক্তির অঙ্গ ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি থাকিলেও ভগবদ্‌বিগ্রহ ভগবদ্ধাম লীলা পরিকরাদিতে মায়িক বুদ্ধি থাকায় ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যান, অতিকষ্টে ত্বং পদার্থ জ্ঞানলাভ কথঞ্চিৎ হইলেও তৎপদার্থানুভব হয় না। এতাদৃশ জ্ঞানসাধক জীবন্মুক্তির সন্নিহিত পদে আরূঢ় হইয়াও ভগবদপরাধ বশতঃ পতিত হইয়া থাকেন। আর এক প্রকার ভক্তিসহিত জ্ঞানসাধনে ভক্তি প্রধানা হইয়াই সাধককে পরম পদে আরূঢ় করান।

ভক্তিসাধন

এখন **ভক্তিসাধন** সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি। ভক্তি শব্দের অর্থ ভজন। ভজ্‌ ধাতুর অর্থ সেবা। ভগবদ্‌বিষয়িণী সেবনাত্মিকা কায়বাঙ্‌মনোবৃত্তিই ভক্তি। জ্ঞানসাধনে যে প্রকার বলা হইয়াছে যে "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌" ব্রহ্ম মনের মননাদির বিষয় হইতে পারে না, এখানেও সেই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। কেননা অদ্বয় জ্ঞানানন্দ লক্ষণ পরতত্ত্বের আবির্ভাব নির্ব্বিশেষ স্বরূপেই হউক বা সবিশেষ স্বরূপেই হউক সর্ব্বথা উহা প্রাকৃত শরীর ইন্দ্রিয় মনের বিষয় নহে এবং জীবের কোনও প্রকার কৃতিসাধ্যের অন্তর্ভূতও নহে। সবিশেষ পরতত্ত্ব নানাবিধ বিকল্প বিশেষ বিশিষ্ট হইলেও ঐ বিকল্প সমূহ চিদানন্দরূপিনী স্বরূপশক্তির কার্য্য চিদ্‌বিলাসই, মায়াশক্তির কার্য্য জড় বিলাস নহে। চিদ্‌বস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সুতরাং ভগবান্‌কে বিষয় করিয়া শরীর ইন্দ্রিয় মন আদির বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অতএব ভক্তির স্বরূপই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার **উত্তরে** বলা যায় যে ভক্তির স্বরূপটি বস্তুতঃ প্রাকৃত দেহ মন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (ব্যাপার) নহে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের স্বপরানন্দদায়িনী আহ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত স্বপরপ্রকাশিনী সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তির সারাংশই

ভক্তির স্বরূপ। এইরূপ একটি শক্তি এবং তাহার বৃত্তি ভগবত্তত্ত্বে সর্ব্বদাই আছে। (সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে স্বরূপ শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য বিলাসাস্পদ রূপে অদ্বয় জ্ঞানানন্দের যে অনুভব তাহাই ভগবান্)। সুতরাং একপ্রকার **ভাগবতী শক্তির নামই ভক্তি। শক্তি বলিতে কার্য্য ক্ষমতাকেই বুঝায়,** অর্থাৎ কোনও একটি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে যে যোগ্যতার বলে সেই কার্য্যে সেই **যোগ্যতাটির নামই শক্তি।** যে পদার্থে যে জাতীয় কার্য্যকরী যোগ্যতা আছে সেই পদার্থে স্থিত সেই যোগ্যতার বলেই তদুচিত কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয়। তিলের মধ্যে এমন একটি কার্য্যকরী ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে যে পেষণাদি সাধনের সাহায্যে ঐ তিল হইতে "তৈল" কার্য্যটি সম্পন্ন হয়। যে পদার্থে যে কার্য্যের যোগ্যতা বা ক্ষমতা নাই তাহা হইতে সেই কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হয় না। যেমন বালুকাতে তৈল কার্য্যের যোগ্যতা নাই। বালুকার উপর পেষণ ঘর্ষণাদি সহস্র সাধন করিলেও বালুকা হইতে তৈল কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং সমস্ত কার্য্যের মূলে পদার্থ মাত্রেই কার্য্যের যোগ্যতা আছে। **এই যোগ্যতার নামই শক্তি।** ভক্তি ও একপ্রকার যোগ্যতা। ভক্তি লাভ করার অর্থ একপ্রকার যোগ্যতা বা ক্ষমতা লাভ করা। ভক্তির সাধন করার অর্থ সেই যোগ্যতালাভের উপযোগী কায়িক বাচিক মানসিক বৃত্তির পরিচালনা।

প্রশ্ন—ভক্তি যদি একপ্রকার কার্য্যের যোগ্যতা মাত্রই হয় তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের যোগ্যতাকে ভক্তি বলা যায়?

উত্তর—পরমার্থ বিষয়ক যাবতীয় কার্য্যের যোগ্যতাই ভক্তি, অর্থাৎ ভক্তি যোগ্যতাটিকে লাভ করিতে পারিলে পরমার্থ বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তথাপি বিশেষ ভাবে বলিতে হইলে ইহাই বলা যায় যে **"পরতত্ত্বের প্রকাশ কার্য্যের যোগ্যতাই ভক্তি।"** তার মধ্যে আবার পরতত্ত্বের ভগবদাখ্য আবির্ভাব বিশেষটির প্রকাশ হয় যে যোগ্যতার বলে তাহার নামই ভক্তি। তাহা হইলে তাৎপর্য্যার্থ এই হইল যে **ভগবত্তত্ত্বের প্রকাশকারিণী এক প্রকার শক্তির নামই ভক্তি।** সাধকের নিকট ভগবত্তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় যে শক্তির বলে সেই শক্তি বা যোগ্যতা লাভের উপযোগী সাধন করাকেও ভক্তি বলে। তাই শাস্ত্রে ভক্তিকে দুই প্রকার

বলা হইয়াছে, একটি সাধ্য ভক্তি, অপরটি সাধন ভক্তি। সাধ্য ভক্তিটি তাদৃশ যোগ্যতাই, ইহাকে ভাবভক্তি বলা যায়। এই ভাবভক্তিরূপ যোগ্যতা লাভের উপায়ীভূত কায়েন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপা ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়। এই কায়েন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপা সাধনভক্তির দ্বারা ভগবৎ প্রকাশনের যোগ্যতা সাধ্যরূপা ভাবভক্তি শক্তিটি লাভ করিতে পারিলেই ভগবদ্দর্শন কার্য্যটি সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন—আপনি বলিতেছেন, সাধনটিও ভক্তি, সাধ্যটিও ভক্তি, ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ, সাধ্য সাধন পরস্পর ভিন্ন; বস্তু অংশে সাধ্য সাধন এক হইতে পারে না, অর্থাৎ যে বস্তুটি সাধন (যেমন কর্ম্মাঙ্গে কুশ তণ্ডুল ঘৃত ইত্যাদি সহযোগে যে যজ্ঞাদি সাধন) তাহা সাধনের ফলস্বরূপ সাধ্য স্বর্গসুখাদি হইতে পৃথক; আবার শব্দ প্রয়োগেও এক হইতে পারে না; "সাধ্যতে ঽনেন" অর্থাৎ ইহার দ্বারায় ক্রিয়ার ফলটি সাধিত হয় তাই ইহাকে সাধন বলা যায়; আর "সাধ্যতেঽসৌ" অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয় যে ফলটি সেই ফলটিই সাধ্য; এই দুই এক হইতে পারে না। আপনার কথিত সাধনটি ভক্তি, সাধ্যটিও ভক্তি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

উত্তর—ভক্তি শব্দটি দুই প্রকারে সাধিত হয়, ভজ্ ধাতু ক্তি প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে সাধিত হইয়া সাধ্যরূপা ভাবভক্তিকেই বুঝায়, আবার করণ বাচ্যে ক্তি প্রত্যয় সাধিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপা সাধনভক্তিকেই বুঝায়, যেমন বেদান্তে "বিজ্ঞান" শব্দের ব্যবহার আছে তদ্বৎ। বস্তুতঃ ভগবানের চিদানন্দ শক্তির বৃত্তি ভক্তি একই, কেবল নিজের আবির্ভাব ভেদে সাধন সাধ্য রূপ প্রাপ্ত হয়েন। একই "ভক্তি" নাম্নী ভগবানের চিদানন্দ শক্তির প্রথম আবির্ভাবটির নাম সাধন, আবার ফলরূপে দ্বিতীয় আবির্ভাবের নাম সাধ্য। ক্রিয়াভেদে অবচ্ছেদকতার ভেদ স্বীকার করিয়া একই বস্তুর এই প্রকার ভেদ স্বীকার সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্‌গণের অনুমোদিতই।

প্রশ্ন—ভক্তির স্বরূপ জাতি সম্বন্ধে কিছু বলুন এবং স্থিতি গতির অবস্থাও বলুন।

উত্তর—ভক্তির জাতি আকৃতি স্বরূপাদির পরিচয় আমার পূর্ব্ব কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতেছি—যথা, ভক্তিটি শক্তিজাতীয়

পদার্থ। এই শক্তিটি আবার চিজ্জাতীয় শক্তি, জড় জাতীয় শক্তি নহে। ভক্তিটি চিজ্জাতীয় শক্তি হইলেও ইহা চিদনু তটস্থ জাতীয় নহে। ইহা বিভু চিৎ, ভগবৎস্বরূপজাতীয় শক্তি। ইহাই হইল ভক্তির ব্যাপক জাতির পরিচয়, এই ব্যাপক জাতির মধ্যে ভক্তির স্বরূপ ভেদে অবান্তর ব্যাপ্য জাতিও আছে।

এখন ভক্তির আকৃতির পরিচয় কিছু বলি, যথা—শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে আনুকূল্যময়ী একাদশেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিই ভক্তির স্বরূপ, যে প্রবৃত্তির মূলে শ্রীভগবৎপ্রীণনাভিলাষ ভিন্ন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পর্য্যন্ত অন্য কোনও অভিলাষ থাকে না; কেবল মাত্র ভগবৎপ্রীণনাভিলাষময়ী প্রবৃত্তিই ভক্তি, এবং সাক্ষাৎ ভগবদনুকূলতাময়ী প্রবৃত্তিরূপা ভক্তির বিঘাতক কোনও প্রকার নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা অহংগ্রহোপাসনা বা বৈদিক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম বা তাদৃশ লৌকিক কর্ম্ম অথবা অষ্টাঙ্গ যোগাদি বা আত্মানাত্ম বিবেক রূপ বৈরাগ্যাদি দ্বারা আবৃত না হয় এমন যে ভগবদ্‌বিষয়িণী প্রবৃত্তি তাহাই হইল ভক্তির স্বরূপ বা আকৃতি। আর সাক্ষাৎ ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন প্রভৃতিই ভক্তির অঙ্গ, এবং সেই শ্রবন কীর্ত্তনাদির অনুকূল চেষ্টাদি উপাঙ্গ। এই সকলের সমবেত মূর্ত্তিই শ্রীভাগবতী ভক্তি। ইঁহার কার্য্য নিরন্তর স্বীয় বিষয় এবং আশ্রয়কে আনন্দ দান করা।

এখন ভক্তির স্থিতি এবং গতির বিষয় কিছু সংক্ষেপে বলিতেছি। স্বীয় অনন্ত বৈভবযুক্ত চিৎশক্তিবর্গ, অনন্ত বৈভবযুক্ত তটস্থাখ্য জীবশক্তি-বর্গ এবং অনন্ত বৈভবযুক্ত বহিরঙ্গাখ্য মায়াশক্তিবর্গের একমাত্র মূল পরাশ্রয় শ্রীভগবান্ স্বপর আনন্দদায়িনী ভক্তি নাম্নী নিজ শক্তিকে অনাদি কাল হইতেই নিজ নিত্য পরিকরবৃন্দে নিক্ষেপ করিয়া ভক্তাশ্রয়া করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিটি শ্রীভগবানের শক্তি হইলেও অনাদিকাল হইতেই ভগবন্নিত্যপরিকরেই নিত্য অবস্থিতি লাভ করিতেছেন। ভক্তি ভগবন্নিত্যপরিকরে স্থিতি লাভ করিয়া সততই নানাবিধ নর্ত্তন চাতুরীপূর্ণ চঞ্চল চরণে শ্রীভগবদভিসারিণী হইয়াই আছেন, ইহাই ভক্তির স্থিতি গতি।

এই ভক্তিটি ভগবন্নিত্যপরিকরনিষ্ঠ হইয়া সেই সেই নিত্য

পরিকরভাবে ভাবিত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট সাধক ভক্ত পরম্পরায় মন্দাকিনী ধারার ন্যায় এই জগতে চিরকাল হইতে অবতরণ করিয়া থাকেন। এই ভক্তি মন্দাকিনীর মর্ত্তভুবনে আগমনের একমাত্র পথ ভক্তিসাধক ভগবদ্ভক্ত পরম্পরাই। সংসারমরুতপ্ত ক্লান্ত জীব আমরা এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীভাগবতী ভক্তি মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ ধারায় স্নপিত হইয়া সুশীতল হইতে পারি। ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের করুণাই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্তিকে আহ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত জ্ঞানশক্তির সার এই প্রকার বলার সার্থকতা কিছু আছে কি? থাকিলে একটু প্রকাশ করুন।

উত্তর—সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। ভক্তিতে আহ্লাদিনী শক্তির সার স্বীকার করায় আনন্দই একমাত্র পুরুষার্থ, আনন্দের জন্যই যাবতীয় চেষ্টা প্রবৃত্তি এবং এই আনন্দের অংশকণাকে উপজীব্য করিয়া জীবের সত্তা। যদি আনন্দ না থাকিত তাহা হইলে জীবের সত্তার উপলব্ধিই হইত না। মায়াবৃত নিরানন্দ জীব সেই নির্ম্মল আনন্দ পাইলেই আনন্দী হইয়া পূর্ণ কৃতার্থ হইতে পারে। তাই ভক্তিতে ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তির সার থাকায় পরম পুরুষার্থই সূচিত হয়। আর একটি গূঢ় কথা আছে, আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই জীবের যাবতীয় তৃষ্ণা, জীবের বলিয়া কেন, এমন কি সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ শ্রীভগবানেরও সৃষ্ট্যাদি যাবতীয় বাসনা একমাত্র আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই হয়। সুতরাং আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলাতে ভক্তিতে একটি তৃষ্ণাময়ী বৃত্তি আছে ইহাও বলা হইল। যে বিষয়ে যাহার তৃষ্ণা থাকে সে বিষয়ে তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই মনের একটি অনুকূল ভাবও জাগিয়া উঠে, এই অনুকূলভাবময়ী তৃষ্ণাই ভক্তির জীবন। ভক্তি নিজের আশ্রয়স্থল ভক্তের হৃদয়কে অতুলনীয় ভগবদানন্দের মাধুর্য্যধারায় নিরন্তর স্নপিত করাইয়াও ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদনে উত্তরোত্তর নবনবভাবে তৃষ্ণায় তৃষিত করিয়া তুলেন, আবার যাহাকে বিষয় করিয়া ভক্তি প্রবর্ত্তিত হন সেই নিজের বিষয় ভগবান্‌কে পর্য্যন্তও ভক্তের ভক্তিরসাস্বাদনে তৃষিত করিয়া তুলেন। প্রকাশ বস্তু সূর্য্যাদি যেমন নিজকে প্রকাশ করে, ঘটপটাদি জাগতিক অপর পদার্থকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি

ভগবান্‌কেও আহ্লাদ দান করেন, অপরকেও আহ্লাদ দান করেন। ভক্তিতে সেই আহ্লাদিনীর সার বলায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে ভগবৎপ্রীতির চরমাবস্থা মহাভাব পর্য্যন্ত ইঁহার চরম প্রকাশ। ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে সামান্যতঃ আনন্দ থাকিলেও আনন্দের বৃত্তি এবং তাহার সার প্রকাশ পায় না। আর ভক্তিতে সম্বিৎ শক্তির সার আছে বলায় "জ্ঞানজ্ঞাপনবৃত্তিরূপা প্রকাশিকা শক্তির" নামই সম্বিৎ শক্তি যে শক্তির দ্বারায় শ্রীভগবান্ নিজে জানেন এবং অপরকে জানান (তাৎপর্য্য এই যে ভক্তিজনিত আনন্দকে অনুভব করেন এবং ভক্তকেও ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ অনুভব করান), যে শক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ নিজের স্বরূপ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যকে প্রকাশ করিয়া উপাস্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েন এবং উপাসকগণের উপাসনাজ্ঞানে নিজের স্বরূপ জ্ঞাপন করান ইহাই বলা হইল। এই জ্ঞানজ্ঞাপনবৃত্তিদ্বয়ান্বিতা সম্বিৎ শক্তিই আত্মবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়েন। সম্বিৎ শক্তির সার এই কথাটি বলায় পরতত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম ভক্তিতে আছে বুঝা যায়। বিশেষতঃ সম্বিতের উৎকর্ষটি আনন্দের সারে মিলিত হওয়ায় ভক্তিতে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্‌বিষয়িণী আনুকূল্যভাবময়ী তৃষ্ণাবৃত্তিরূপেই দাঁড়ায়, তখনই আমরা তাহাকে ভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি। ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানে এই আত্মবিদ্যার সার না থাকায়, কেবলমাত্র সামান্যতঃ আত্মবিদ্যার প্রকাশ থাকায়, ভগবদৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি জ্ঞানজ্ঞাপনবৃত্তি সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় না, অতএব নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব মাত্রই হয়।

ভক্তিকে প্রথমতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, গুণীভূতা ভক্তি, প্রধানীভূতা ভক্তি, আর কেবলা ভক্তি। যে স্থলে "আত্মানাত্মবিবেকানু-শীলনাদি" জ্ঞান অথবা "নিত্যনৈমিত্তিকাদি" কর্ম্ম কিম্বা "যমনিয়মাসন-প্রাণায়ামাদি" যোগ প্রভৃতি সাধনগুলি মুখ্য হইয়া ভক্তি গৌণরূপে অবস্থান করেন, সে স্থলে ভক্তি নিজের মুখ্য তাৎপর্য্য শুদ্ধ ভগবৎপ্রীতিবৃত্তি প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র ঐ জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি সাধনের ফলদানে সাহায্য করিয়া তটস্থ রূপেই অবস্থান করেন। এই প্রকার জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদির সাধন মিশ্রিত ভক্তির গৌণরূপে অবস্থানকে গৌণীভূতা ভক্তি

বলা যায়। আর যে স্থলে আত্মানাত্মবিবেকাদি জ্ঞান নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বধর্ম্মকর্ম্ম বা যমনিয়মাদি যোগ প্রভৃতি সাধনসমূহ ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়াও গৌণ থাকে, ভক্তিই প্রবল হইয়া উঠেন, তাহাই প্রধানীভূতা ভক্তি। ইহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, যোগমিশ্রা ভক্তি ইত্যাদি মিশ্রাভক্তিরূপে কথিত হয়। কেবলা ভক্তিতে কোনও জ্ঞানের সাধন বা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অথবা যোগের কোন অঙ্গ মিশ্রিত থাকে না, শুদ্ধা ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চনাদিময়ী ভক্তিকেই কেবলা ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি বলা যায়। ইহাকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও বলা যায়।

এই ভক্তি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী ভেদে তিন প্রকার এবং উহার আবার "অধম তামসী মধ্যম তামসী উত্তম তামসী", এই প্রকার "অধম রাজসী মধ্যম রাজসী উত্তম রাজসী", সেই প্রকার "অধম সাত্ত্বিকী মধ্যম সাত্ত্বিকী উত্তম সাত্ত্বিকী" এই প্রকার ভেদ হয়। বস্তুতঃ ভক্তিশক্তিটি চিদানন্দরূপিণী, সুতরাং প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমঃ গুণের অতীত হইয়াও উপাসকদিগের ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণের সঙ্কল্পানুসারী তামস রাজস সাত্ত্বিকাদি গুণ সকল প্রকটিত হইলে সেই গুণসকলের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া উপাসকের দেহেন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূতা হয়েন, শুদ্ধ নির্ম্মলভাবে উদয় হন না। উপাসকের তামসাদিভাব সকল ভক্তিতে উপচরিত হয় বলিয়াই তামসী ভক্তি রাজসী ভক্তি ইত্যাদি বলা যায়। **হিংসা দম্ভ মাৎসর্য্যাদি অভিসন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধী হইয়া ভেদদর্শী (অর্থাৎ পরের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ মনে করেন না এইরূপ) হইয়া যাঁহারা ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ যজন করেন তাঁহাদের সেই ভক্তি তামসী। কাপট্য পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য মিথ্যা ব্যবহারাদি পূর্ব্বক যে ভক্তি আচরণ করা যায় তাহা তামসী। বিষয় যশঃ ধনৈশ্বর্য্যাদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে অর্চ্চনাদি ভক্তি যজন করা যায় তাহা রাজসী ভক্তি। কর্ম্মক্ষয় অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম লাভ করিয়া মাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষফলাকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানে বর্ণাশ্রমধর্ম্মার্পণপ্রচুর যে শ্রবণাদি ভক্তি তাহা সাত্ত্বিকী।** অন্যান্য স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মতুল্য বোধে মোক্ষকামনায় যে শ্রবণাদি ভক্তি তাহাও সাত্ত্বিকী ভক্তিই। এই সাত্ত্বিকী ভক্তি

কাহারও সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইয়া স্বয়ং গুণীভূতা হইয়া সাযুজ্য মুক্তিফল দান করেন। আবার কোথায়ও জ্ঞান জন্মাইয়া জ্ঞানকে গৌণ করিয়া ভক্তি প্রধানীভূতা হইয়া উঠেন। সেই স্থলে ধীরে ধীরে ভক্তির পরাবস্থা প্রকাশ পাইয়া ভগবানে শান্ত প্রীতির উদয় হয়। তখন সেই নির্গুণা ভক্তির ফলে সালোক্যাদি মুক্তি লাভ হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে সকাম যৎকিঞ্চিৎ বৈদিক হিংসাযুক্ত অশ্বমেধাদি কর্ম্মও ফলের সহিত শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে নিষ্কামরূপই হয়, সুতরাং সেই অশ্বমেধাদি সফলকর্ম্মার্পণবতী ভক্তির ফলে সুখৈশ্বর্য্যময় সালোক্য মোক্ষ লাভ হয়, প্রীতিসুখময় সালোক্য নহে। নিষ্কাম কর্ম্মার্পণবতী ভক্তি কিন্তু শান্তপ্রীতিসুখময়ী সালোক্যাদি মুক্তিই প্রদান করেন। রাজসী তামসী ভক্তির ফল প্রাপ্ত হইলেই ভক্তির অভাব হইয়া পড়ে, পরে আর ভক্তির অনুবৃত্তি না থাকায় তাদৃশ তুচ্ছ ফলই মাত্র তাদৃশী ভক্তির ফল হয়। যদি কোন প্রকারে কোন সৎ মহাপুরুষের যৎকিঞ্চিৎ কৃপায় রাজসী তামসী ভক্তির ফলপ্রাপ্তির পরেও ভক্তিসত্তা থাকে তাহা হইলে সেই মহৎ কৃপার বলে ধীরে ধীরে কালে ভক্তিটি নির্গুণা হইয়া উদয় হয়েন।

শ্রীভাগবতী ভক্তি শক্তির মহিমা অচিন্ত্য। ইঁহার আভাস মাত্রেও অর্থাৎ ভক্ত্যাভাসেও জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।

প্রশ্ন—ভক্ত্যাভাস কাহাকে বলে ?

উত্তর—মহা সৌভাগ্যে ভাগবতী ভক্তি জীবে দুই প্রকারে আবির্ভূতা হয়েন। একটীর নাম অসম্যগাবির্ভাব, আর একটির নাম সম্যগাবির্ভাব। প্রথমটি অর্থাৎ ভক্তির অসম্যক্ আবির্ভাবটি দুই প্রকার, একটি ভক্তির আভাসরূপে উদয়, আর একটি ভক্তির ঈষৎ উদ্গম। এই দুই প্রকারে অর্থাৎ আভাসরূপে ভক্তির উদয়টিও ভক্তির অসম্যগাবির্ভাব এবং ভক্তির যে ঈষৎ উদ্গম তাহাও ভক্তির অসম্যগাবির্ভাব। "আভাস্যতে প্রতীয়তেঽসৌ" ইতি আভাসঃ নতু বস্তুতো ভবতি, ভক্তির মত প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ ভক্তি নহে, তাহাকেই ভক্ত্যাভাস বলা যায়, তাৎপর্য্যার্থ এই যে "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং" নিরুপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপ। আর ভক্তিটি উপাধিযুক্ত হইলেই আভাস প্রাপ্ত হয়েন। গৌণবৃত্তিদ্বারা ভক্তির

প্রবর্ত্তমানতাই আভাসতা। যেখানে ভক্তির মুখ্য ফল শুদ্ধ ভগবৎপ্রীতিটি তাৎপর্য্য না হইয়া জ্ঞানযোগকর্ম্মাদিতে ভক্তি আবির্ভূতা হইয়া উক্ত জ্ঞানযোগকর্ম্মাদির নিজ নিজ মোক্ষ কাম অর্থ ধর্ম্মাদির সাধন করিয়া অন্তর্হিতা হয়েন সেই স্থলে যে ভক্তির উদয় তাহা আভাস মাত্র। সে স্থলে উপাসকের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি স্বার্থপরতাই উপাধি। এই ধর্ম্মাদি কামনা রূপ উপাধি দ্বারা উপরক্তা হইলেই ভক্তি আভাসতা প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধির তারতম্যানুসারে ভক্তির আভাসের ও তারতম্য হয়, অর্থাৎ ঐ সকল ভোগ মোক্ষাদির কামনার আধিক্যে উপাসকের চিত্তে অসরসতা অর্থাৎ কর্কশতা কৌটিল্য দাম্ভিকতা স্বার্থপরতাদি যত বেশী প্রকাশ পাইতে থাকে ভক্তিও তত আভাসতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অনেকে পরের প্রতি উপদেশে খুব শ্লোক শাস্ত্র আওড়াইয়া ভক্তির মহিমা নামের মহিমা ইত্যাদি বর্ণন করিতেছেন, অপরকে 'তৃণাদপির' উপদেশ দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দাম্ভিকতায় বিভোর হইয়া অর্থ লাভ যশ আদির কিঞ্চিৎ প্রতিঘাতে কর্কশ ব্যবহারে ভক্তিধর্ম্মের গুরুতর ব্যভিচার করিতেছেন, আবার ঐ শ্লোক শাস্ত্র আওড়াইয়া উহা ভক্তিরই মর্য্যাদা বা ভক্তিধর্ম্ম রক্ষার জন্য সৎসাহসের পরিচয় ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে নির্ল্লজ্জভাবে ঘোষণা করিতেছেন, ইহা গুরুতর জ্ঞানবলদুর্ব্বিদগ্ধতা, গুরুতর কাপট্য এবং দাম্ভিকতা। এইপ্রকার চিত্তে যে ভক্তির আভাস তাহা **অপরাধময় ভক্ত্যাভাস**। এই প্রকার অপরাধময় ভক্ত্যাভাস জীবকে কৃতার্থ করে না। বহুকাল পরে অপরাধ ভোগের অন্তে সাধু মহাপুরুষের অচিন্ত্য করুণা প্রভাবে অপরাধ ক্ষীণ হইলে ঐ ভক্ত্যাভাসটি ধীরে ধীরে প্রকাশোন্মুখ হইয়া শুদ্ধভক্তিরূপে উদয় হইতে চেষ্টা করে। আর যাহাদের তাদৃশ প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন গুরুতর অপরাধ নাই তাহাদেরই যথাকথঞ্চিৎ ভক্ত্যাভাসমাত্রেই সর্ব্ববিধ পাপধ্বংসপূর্ব্বক সংসারবন্ধন নিবৃত্তি হয়। কোথাও কোথাও নিরপরাধ ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ভক্ত্যাভাসের দ্বারা ভগবানে শুদ্ধ প্রীতির উদয় হয় যাহা হইতে তাদৃশ ভক্তিরও সম্যক্ উদয় সম্পন্ন হয়। মোট কথা এই যে **শুদ্ধ ভগবৎ সন্তোষণ তাৎপর্য্যেই ভক্তি শুদ্ধা হন**। শুদ্ধ

ভগবৎ প্রীতি তাৎপর্য্য ভিন্ন তাৎপর্য্যান্তর উপস্থিত হইলেই ভক্তিটি আভাসিত হইয়া পড়েন।

এই ভক্ত্যাভাসটি দুই প্রকার, একটি প্রতিবিম্ব আভাস আর একটি ছায়া আভাস। প্রতিবিম্ব আভাসটি ভোগমোক্ষসুখাভিব্যঞ্জক। আর ছায়া আভাসটি কৌতুকময় অস্থায়ী; শ্রীভগবদ্ উৎসবাদিতে কখন মিলিত হইয়া ভগবদ্ ভক্ত সঙ্গে সাধারণ জনের যে নাম কীর্ত্তনাদি শ্রবণাদি হয় তাহা ভক্তির ছায়াভাস। ছায়া বলিতে কান্তি বুঝায় (ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ ইত্যমরকোষঃ)। এই প্রকার ছায়াভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ ঈষদ্ উদ্গমরূপ অসম্যগ্ আবির্ভাবে পর্য্যবসিত হয়।

কর্ম্মসাধন

এখন কর্ম্মের কথা কিছু বলি। কর্ম্ম বলিতে কায়িক বাচিক মানসিক বৈদিক লৌকিক যাবতীয় কর্ম্মই বুঝায়; তাই বলিয়া কায়িক বাচিক মানসিক ভক্তির সাধন যে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি কর্ম্ম, তাহা কিন্তু কর্ম্ম নহে। সাক্ষাৎ ভক্তি শ্রীভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার সমূহ কর্ম্মের ন্যায় জড়ীয় ব্যাপার নহে, ইহা চিদ্ব্যাপার। পরমার্থ মার্গে শাস্ত্রে যে কর্ম্মকে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যজ্ঞান বা ভক্তির দ্বার স্বরূপ সাধন বলা হইয়াছে তাহা বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনা শ্রাদ্ধ দান হোমাদি কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। এই নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ত্রিবিধ, সকাম নিষ্কাম এবং ভক্তিকাম, অর্থাৎ এই কর্ম্ম আচরণটি তিন প্রকার নিমিত্তকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগ কামনায় নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহাদের সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়। আর যাঁহারা ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমাত্র কামনা করিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি আচরণ করেন তাঁহাদের তাদৃশ কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়। বস্তুতঃ কিন্তু প্রকৃত নিষ্কামত্ব সম্ভব হয় না, "যদ্ যদ্ হি কুরুতে জন্তু স্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।" আর যাঁহারা মহাভাগবত ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ গুণে

কেবল ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহাদের সেই কর্ম্মকে ভক্তিকাম কর্ম্ম বলা যায়।

এই সকাম নিষ্কাম বা ভক্তিকাম কর্ম্মের মধ্যে যে কোনও কর্ম্ম হউক না কেন কর্ম্মমাত্রই ভগবানে অর্পিত হওয়া চাই, ভগবানে অর্পিত কর্ম্মই কর্ম্ম। ভগবানে অর্পিত হয় না এমন বেদবিহিত সকাম নিষ্কাম যে কোন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম হউক না কেন, বস্তুতঃ তাহা কর্ম্ম না হইয়া অকর্ম্মই হইয়া পড়ে।*

শাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মিব্যক্তির বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থা ত আছেই, এমন কি লৌকিক কর্ম্ম, স্বভাববশতঃ অনুষ্ঠিত পাপ কর্ম্মাদি পর্য্যন্তও ভগবানে অর্পণ করার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে শরীর দ্বারা যাহা করিবে, বাক্য দ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা অথবা বুদ্ধির দ্বারা অহঙ্কার দ্বারা অনুসৃত যে স্বভাব সেই স্বভাব বশতঃ যে যে বৈদিক এবং লৌকিক কর্ম্ম করিবে তৎ সমস্তই নারায়ণে সমর্পণ করিবে। শ্রীগীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর যাহা কিছু ভোজন কর যাহা কিছু হোমাদি কর যাহা কিছু কৃচ্ছ্র তপস্যাদি কর তাহা সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" এই কর্ম্ম সমূহ সমর্পণের একটি মন্ত্র আছে, যথা "**ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা।**" ইহার অর্থ এই—"ইহার পূর্ব্বে প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মে অধিকারবশতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা সমূহে মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা এবং কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ কায়িক বৃত্তি হস্ত পদ উদর উপস্থাদির দ্বারা যাহা কিছু স্মরণ করিয়াছি বাক্য বলিয়াছি এবং যাহা কিছু করিয়াছি তৎসমস্তই ব্রহ্মে সমর্পিত হউক।" তাহা হইলে বুঝুন যখন দুরন্ত স্বভাববশতঃ লৌকিক পাপকর্ম্ম পর্য্যন্তও ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে তখন আর বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদির কথা কি?

---

* নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ —শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রশ্ন—সকাম কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভক্তিকাম কর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মার্পণের **ফল** কি একই প্রকার অথবা ফলের তারতম্য আছে? পাপকর্ম্মার্পণের ব্যবস্থা বৈদিক কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থা কি একই না পৃথক্ পৃথক্? একটু বিস্তার করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

উত্তর—শাস্ত্রে কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থা দুই প্রকারে বিহিত হইয়াছে। একটি ভগবৎপ্রীণনরূপ কর্ম্মার্পণ, আর একটি ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপ কর্ম্মার্পণ। তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করেন এবং যাঁহারা জ্ঞানকামী হইয়া চিত্তশুদ্ধির উপায়ীভূত ত্রৈবর্গিক ফল কামনা রহিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করেন তাঁহাদের কর্ম্মার্পণটি ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপই হয়। ইহাতে ভগবৎপ্রীণনটি আভাস মাত্র, কেননা ঐ সকাম এবং নিষ্কাম এই উভয়বিধ কর্ম্মেই স্বার্থপরতা আছে। যে কর্ম্মে স্বার্থপরতার প্রাবল্য যত বেশী সে কর্ম্মে ভগবৎপরিতোষণ ততই আভাসিত হইতে থাকে। আর যাঁহারা ভক্তিমাত্র কামনা করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের ভগবানে কর্ম্মসমর্পণটি ভগবৎসন্তোষকরই হয়, কেননা **ভগবৎপরিতোষণই ভক্তির জীবন**। এই ভগবৎপরিতোষণটি যেখানে যত শুদ্ধতা লাভ করিয়া থাকে সেখানেই তত শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে। ভগবৎপরিতোষণটির শুদ্ধতা বলার তাৎপর্য্য এই যে ঐহিক পারলৌকিক সুখাদির কামনাপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভগবন্নামাদি কীর্ত্তন শ্রবণাদি ভক্তি অঙ্গ আশ্রয় করিয়া সাধন করিলেও ভগবৎপরিতোষণটি তাৎকালিক শুদ্ধ হয় না। অবশ্য ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে সাক্ষাৎ ভক্তিসাধনের গুণে কালান্তরে শুদ্ধ হয়।

এই কর্ম্মার্পণ প্রসঙ্গে লৌকিক কর্ম্মের অর্পণটিও জীবের মঙ্গলকর হইয়া থাকে। তার মধ্যে স্বভাবজাত দুষ্কর্ম্মের অর্পণটির ব্যবস্থা অর্পণকারীদিগের ভাব ভেদে ত্রিবিধই হইয়া থাকে। সকাম কর্ম্মিগণের সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্ব দুষ্কর্ম্মেরই অর্পণ হয়। আর জ্ঞানেচ্ছু নিষ্কাম কর্ম্মীদিগের দুষ্কর্ম্মার্পণটি "শুভ অশুভ সর্ব্ববিধ কর্ম্মই অন্তর্যামীর প্রেরণায় অবিশেষরূপেই সম্পন্ন হয়" এই জ্ঞানে ব্রহ্মার্পণ হয়। আর ভক্তিকামী কর্ম্মীদিগের দুষ্কর্ম্মার্পণটি "আমার এই দুষ্কর্ম্ম দর্শন করিয়া করুণাময়

ভগবান্ আমাকে করুণা করুন” এই ভাব পোষণ করিয়া “মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন” ইত্যাদি দৈন্যভাবে শ্রীভগবানে নিবেদনমাত্রই করা হয়।

ভগবানে কর্ম্মার্পণে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির তারতম্যানুসারে ইহার ফলেরও তারতম্য হয়। কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও সেই কর্ম্মের ফল বস্তুতঃ ভগবদধীন, সুতরাং ভগবদাশ্রয়ই কর্ম্মের ফল। কিন্তু কামোপহতচিত্ত ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ নিজ কর্তৃত্বাদি অভিমানে অন্ধ হইয়া আত্মসাৎ করে বলিয়াই অতি তুচ্ছ ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিরন্তর নানাপ্রকার দুঃখ যাতনাময় সংসারবন্ধন গ্রস্তই হয়। তাহাদের এই সকাম বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি এবং অনুস্মৃত স্বভাবজাত লৌকিক কর্ম্মাদি যদি পরমেশ্বরে সমর্পিত হয় তাহা হইলে ঐ কামবিহিত কর্ম্মও তাহাদের সংসার বন্ধনকে বিধ্বংসন করিয়া মোক্ষফল দান করে। তাৎপর্য্য এই যে কামনাপূর্ব্বক বৈদিক লৌকিক কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পিত হইলে সেই সেই কামের আবশ্যকী প্রাপ্তি হয়। প্রত্যুত ঐ কর্ম্মটি শ্রীভগবানে সমর্পিত হওয়ায় ভাগবত ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া মোক্ষসাধন ভক্তিমিশ্র জ্ঞানকে জন্মায়। **ভগবদর্পিত কর্ম্মই সত্ত্বশোধক।** এই প্রকার ভগবদর্পিত সকাম কর্ম্মকে ভক্তিমিশ্র কর্ম্ম বলা যায়। কর্ম্মে ভক্তির মিশ্রণ না থাকিলে সেই কর্ম্মটি সতত দুঃখপ্রদ হইয়া কেবল সংসার বন্ধনই আনয়ন করে। যদি এই স্থলে কোনও সৎ মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভাবে তাদৃশ সকাম কর্ম্মীর মনে ভগবানে কর্ম্মের অর্পণ ভাবটি প্রবলাকার ধারণ করিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন মহিমাদি শ্রবণ তদীয় অর্চ্চনাদি সাক্ষাৎ ভক্তির অঙ্গগুলি কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হয় অথচ কামনাবিশিষ্ট কর্ম্মও আচরিত হয় তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। ভক্তিমিশ্র কর্ম্ম আর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির এই ভেদ যে ভক্তিমিশ্র কর্ম্মে ভক্তিভাবটি গৌণ রূপে থাকিয়া কেবলমাত্র কর্ম্মের সুষ্ঠু ফল সম্পাদন পূর্ব্বক চরমকালে কর্ম্ম বন্ধন বিধ্বংসন করে মাত্র, কিন্তু শ্রীভগবদ্‌ভক্তির স্বতন্ত্র কোন ফল প্রকাশ পায় না। আর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে ভগবদর্পণে ভগবৎপ্রীতিকামটি এবং ভগবদ ভজনাঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তন

অর্চ্চনাদি ভক্তিভাবটি প্রধানীভূত রূপে থাকিয়া কর্ম্মের সুষ্ঠু ফল প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাধুর্য্যও কিছু কিছু প্রদান করে, তাহার ফলে ক্রমশঃ কর্ম্মফলাসক্তি রহিত হইয়া তাদৃশ কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ ব্যক্তি চরমাবস্থায় শান্তরতি পর্য্যন্ত ভক্তির ফল লাভ করেন এবং ভক্তির তারতম্যানুসারে ভগবৎ সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

আর যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় নিষ্কাম কর্ম্মটিকে ভগবৎস্বরূপ বা আত্মান্তর্যামিস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ যে কোনও স্বরূপে নির্ব্বিশেষভাবে অর্পণ করেন তাঁহাদের সেই অর্পিত কর্ম্মটি আশু চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া আত্মজ্ঞান দান পূর্ব্বক সাযুজ্য মুক্তি ফলই দান করে। ইঁহাদিগকেই শ্রীগীতাশাস্ত্রে কর্ম্মযোগী বলা হইয়াছে। আর যদি ভাগবত মহাপুরুষ সঙ্গ প্রভাবে ভগবৎস্বরূপে বিশেষভাবে অর্পিত হয় তাহা হইলে ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি প্রবলা হইয়া কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই হয়। তাহার ফলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ হয়। পরিণামে তাদৃশ কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিমান্ সাধক শান্তিরতি লাভ করেন এবং সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হন।

আর যাঁহারা শুদ্ধ শ্রীভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া নিত্তনৈমিত্তিকাদি এবং লৌকিক কর্ম্ম সমূহ শ্রীভগবানে সমর্পণ করেন তাঁহারা অতি অচিরেই শুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক হইয়া সর্ব্ববিধ পরমপুরুষার্থলাভে কৃতকৃতার্থ হন। ইঁহাদিগকেও কর্ম্মযোগী বলা যায়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী দুই প্রকার, নিষ্কাম কর্ম্মের সমর্পণের ভাবভেদে কর্ম্মযোগীও দুই প্রকার। কৈবল্য মোক্ষ কামনায় আত্মৈক্যজ্ঞানে অধিকার লাভের জন্য যাবতীয় কর্ম্মকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানে অবিশেষভাবে সমর্পণ করেন যাঁহারা তাঁহারাও কর্ম্মযোগী। আবার ভগবদ্ভক্তি কামনায় যাবতীয় কর্ম্মফলে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবৎ পরিতোষণার্থে শ্রীভগবৎ স্বরূপেই যাঁহারা কর্ম্ম সমর্পণ করেন তাঁহারাও কর্ম্মযোগী। উভয়ের ফলেরও পার্থক্য আছে, একের ফল ব্রহ্মকৈবল্য মোক্ষ, অপরের ফল শান্তরতিমৎপার্ষদত্বরূপ মোক্ষ, ক্বচিৎ শুদ্ধভক্তির উদয়ে শুদ্ধভগবৎপ্রীতির উচ্চস্তরও লাভ হয়।

সাধক ব্যক্তি এই সকাম নিষ্কাম ভক্তিকাম কর্ম্মসমূহের তত্তৎ ফলসমূহ একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে পারে, তথাপি সাধারণ মনুষ্যের

তত্তৎ কর্ম্ম বাসনা অনুসারে কর্ম্মমার্গে রুচি জাত হয়, তাই শাস্ত্রেও সেই সেই রুচি অনুসারী অধিকারীর ভেদে এই কর্ম্মমার্গের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

মায়াশক্তির কুক্ষিতে কবলিত বিষয়াসক্ত জীবের কর্ম্মে অধিকার জাতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেহধারণ এবং কর্ম্ম এই দুইটি বীজাঙ্কুরের ন্যায়, দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, আবার তাহা হইতে অঙ্কুর দেহ লাভ। কোন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ গুণে যাবৎ জ্ঞানাধিকার বা শুদ্ধ ভক্তিতে অধিকার লাভ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত জীবের এই স্বাভাবিক কর্ম্মাধিকারটি থাকিবেই থাকিবে। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" এস্থলে ইহা সতত স্মরণ রাখা উচিত যে **জ্ঞানাধিকার সর্ব্বতোভাবে ঐহিক পারলৌকিক বিষয়ভোগে প্রবল বীতস্পৃহা হইতেই হয়।** নতুবা ফল হয় এই যে কেবলমাত্র দুই চারিখানি বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" ইত্যাদি কথার চটকে লোক মোহিত করিয়া শীঘ্রই জ্ঞানাধিকারী হইয়াছি মনে করিয়া বৈদিক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, অথচ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখ ত দূরের কথা, ঐহিক দেহেন্দ্রিয় তর্পণলালসায় চিত্ত সতত উৎকণ্ঠিত হইতে থাকিল, ফলতঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ গুরুতর শঠতা মিথ্যা কুটিলতা নির্দ্দয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়ের তর্পণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম; এদিকে তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানও আমার যথেচ্ছ ভোগসুখেরই অনুকূল কখন প্রতিকূল হইয়া নানাপ্রকারে আমাকে কদর্থিত করিয়া জীবনটিকে ছারখার করিতে লাগিল। শুদ্ধভক্তিমার্গে অধিকার সম্বন্ধেও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—**শ্রীভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হইলেই ভক্তিমার্গে অধিকার লাভ হয়;** "ভক্ত্যা সর্ব্বং ভবিষ্যতি" এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই মায়াবদ্ধ জীবের শ্রীভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ হয়। নচেৎ এই হয় যে কেবলমাত্র সাময়িক শ্রদ্ধার আভাসমাত্র লাভ করিয়া নিজকে দৃঢ় শ্রদ্ধালু মনে করিলাম, আর তৎক্ষণাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি বেদবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্ত সাজিলাম, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়ের ভোগ মিটাইবার লালসায়

ছলনা বঞ্চনা মিথ্যা কুটিলতা দাম্ভিকতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিগুলি আমার মালার ঝুলিকে বা শ্রীভাগবতকে আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতেই থাকিল। তখন "শ্রদ্ধা" শব্দের অর্থ বিশ্বাস তাহা কেবল আমার শুদ্ধ ভক্ত সাজার পদটিকে রক্ষা করিবার জন্য মুখেই শব্দাকারে থাকিবে। আর শ্রদ্ধা শব্দের প্রকৃত অর্থ থাকিবে আমার স্ত্রী পুত্রাদিতে, চাকুরী ব্যবসা-বাণিজ্যাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে, লাভ যশঃ প্রভৃতি লাভের জন্য বা নিজ জীবিকা সাধনের জন্য মিথ্যা বঞ্চনা কৌটিল্যাদিতে। যদি কেহ আমার তাদৃশ আচারে আমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দান করিতে, উপদেশ দিতে যান, তাহা হইলে "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী" বলিয়া আমার মুখেই মাত্র শ্রদ্ধার আসন দৃঢ় করিয়া সভা জয় করিতে দণ্ডায়মান হইব। হায়, ক্ষণকালের জন্য হৃদয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিব না যে তুমি শ্রীভগবদ্ভক্তিতে সত্য বিশ্বাসী কি না। এই প্রকার শ্রদ্ধার ভানে শীঘ্রই যাঁহারা শুদ্ধভক্তি রাগভক্তি ইত্যাদি বড় বড় কথার আড়ালে থাকিয়া অন্তরে কেবল কদর্য্য-বৃত্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ নানা গুরুতর অপরাধে পতিত হইতে হয় এবং নানাবিধ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়, প্রকৃত ভক্তিমার্গও তাঁহাদের পক্ষে জটিল হইয়া উঠে। সাময়িক শ্রদ্ধাভাসে শীঘ্র শীঘ্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধভক্ত সাজিয়া পড়াই ভক্তি নহে। স্মরণ করা উচিত, **"মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধিকারতা।"** শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদই বলিতেছেন,—ভক্তিমার্গে মৃদুশ্রদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে **ভক্তির অবিরোধে স্বল্প কর্ম্মাধিকার** বলা হইয়াছে। ইহাকেই ভক্তিকাম কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন—কর্ম্মাধিকার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে এই কর্ম্মের প্রসঙ্গের প্রথম ভাগেই আপনি বলিয়াছেন, "ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিময়ী ভক্তিটি কর্ম্মের ন্যায় জড়ীয় ব্যাপার নহে, উহা চিদ্ব্যাপার ;" এই স্থলেই সন্দেহ ; নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মও দেহেন্দ্রিয়ের স্পন্দনাত্মক ব্যাপার, সুতরাং ক্রিয়াবিশেষ, আর ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিও দেহেন্দ্রিয়ের স্পন্দনাত্মক ব্যাপার, সুতরাং ক্রিয়াবিশেষ ; তবে একটি জড়ীয় ব্যাপার, আর একটি চিদ্ব্যাপার হয় কিরূপে ?

উত্তর—কর্ম্ম এবং ভক্তিসাধন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকে সামান্যতঃ ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনাত্মক ব্যাপারের সদৃশ দেখাইলেও বস্তুতঃ ভক্তিটি কর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নহে। কর্ম্মটি জড় কেন তাহার উত্তর দিতেছি। কর্ম্মের প্রবৃত্তিটি মায়া শক্তির বৃত্তি অবিদ্যাদোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। মায়াশক্তির কার্য্য জড়, আবার সেই প্রবৃত্তির চেষ্টা যাহা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার রূপে প্রকাশ পায় সেই ইন্দ্রিয়াদিও মায়াশক্তির বৃত্তি জড় প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, সুতরাং জড়েন্দ্রিয়ের যাহা ব্যাপার তাহা জড়ই। আবার ঐ কর্ম্মসমূহের উদ্দেশ্য বিষয় যাহা তাহাও জড়, অর্থাৎ যে ফলের উদ্দেশ্যে এবং যে যে বিষয়ে ঐ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় সেই উদ্দেশ্য বিষয়গুলি প্রকৃতিজাত জাগতিক জড় পদার্থ। সুতরাং কর্ম্মের উৎপত্তি, প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য, ফল, বিষয় সকলই জড়ীয় পদার্থ। আর ভাগবতী ভক্তি তাহার বিপরীত। ভক্তি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দ শক্তির সাররূপা পরতত্ত্ব-প্রকাশিকা শক্তি। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জীবের ভক্তিসাধনের প্রবৃত্তিটিও ভক্তিপরায়ণ ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তিসম্বন্ধিনী কৃপার প্রভাবেই হয়। সুতরাং চিদানন্দময়ী মহৎকৃপা হইতেই জীবের ভক্তিবিষয়িণী প্রবৃত্তি জাত হয়। আবার ভক্তির সাধন কালে সেই ভক্তি শক্তিটি জীবের দেহেন্দ্রিয়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান করেন, তখন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনরূপ যে ব্যাপার হয় তাহাও জড় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে, চিদানন্দশক্তি তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়েরই ব্যাপার, সুতরাং তাহাও চিদ্‌ব্যাপার। আবার যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বিষয়ে ঐ ভক্তির ব্যাপারটি প্রবর্ত্তিত হয় তাহাও চিৎফলসার ভগবৎপ্রেম এবং শ্রীভগবান্, সুতরাং ভগবৎ কীর্ত্তন শ্রবণাদি ব্যাপাররূপা ভক্তির উৎপত্তি (আবির্ভাব), প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য, ফল, বিষয় প্রভৃতি সমস্তই ভগবচ্চিদানন্দময়ী শক্তিরই বিলাসবৈচিত্রী। তাই ভক্তিসাধনটি জড়ীয় কর্ম্ম নহে, উহা চিদ্‌ব্যাপারই।

যোগসাধন

শাস্ত্রে যোগসাধন বলিয়া যে সাধন বিহিত হইয়াছে তাহাও কর্ম্মের ন্যায় সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব সাম্মুখ্যকর সাধন নহে। যোগ বলিতে সাধারণতঃ চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধকেই বুঝায়। চিত্তের বৃত্তি বলিতে সামান্যতঃ একাদশ বৃত্তিকে বুঝায়; পাঁচটি গ্রহণ বৃত্তি, পাঁচটি বিসর্গ বৃত্তি, আর একটি মনন অর্থাৎ অভিমান বৃত্তি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা এই পাঁচটির সাহায্যে রূপ শব্দ ঘ্রাণ স্পর্শ রস এই পঞ্চ বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তি, তাহা গ্রহণবৃত্তি; এই প্রকার বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ দ্বারা যে তৎ তৎ কার্য্য তাহা চিত্তের বিসর্গ বৃত্তি, এবং "আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি"—ইত্যাদিতে যে আমি আমি এই অহঙ্কারাত্মক মননই চিত্তের অভিমান বৃত্তি। ইহাই জীবের উপাধি। এই উপাধিগ্রস্ত জীব সাংসারিক নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছে। চিত্তের এই একাদশ বৃত্তির নিরোধ হইলে জীব উপাধিরহিত হইতে পারে; তাহা হইলেই জীবের দুঃখ সমূহের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ সুখ লাভ হয়। ইহাই হইল সাধারণ যোগসাধন প্রবর্ত্তনের মূল রহস্য। কিন্তু এই প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ ফলটি নিষ্কাম কর্ম্মীর ভগবানে সমর্পিত কর্ম্ম দ্বারাও সম্পাদিত হয় বলিয়া তাদৃশ কর্ম্মকেও কর্ম্মযোগ বলা যায়। আবার আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান-সাধনেও উহা সম্পন্ন হয় বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানসাধনকেও জ্ঞানযোগ বলা যায়। আবার ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেও তাদৃশ চিত্তবৃত্তির তাদৃশ নিরোধফল সম্পন্ন হয় বলিয়া ভক্তিধর্ম্মকেও ভক্তিযোগ বলা যায়।

তদ্ভিন্ন পাতঞ্জল দর্শনাদির অনুগত এই চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ যোগসাধনটি একটি স্বতন্ত্র সাধন রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'অষ্টাঙ্গযোগ' সাধন বলা যায়। এই প্রকার যোগ সাধনের আটটি অঙ্গ,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। সাধারণ ব্যক্তিরা ইহাকেই যোগসাধন বলিয়া জানে। এই যোগসাধনও শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তবে ইহার প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। নতুবা ইহার ফল অতি তুচ্ছ সিদ্ধি আদি জীবের সংসার দুঃখকে নিবর্ত্তিত করিতে পারে না। ভগবদ্‌বহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের সকাম নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহ যে প্রকার সাংসারিক কতকগুলি আশু

সুখকর ফল দান করে মাত্র, পরমেশ্বরে অসমর্পিত এবং পরমেশ্বরের ধ্যানাদি ভক্তি বর্জ্জিত তাদৃশ অষ্টাঙ্গযোগ সাধনটিও সেই প্রকার কতকগুলি সিদ্ধি ফল দান করিয়া আশু সাংসারিক তুচ্ছ সুখফল দান করে এবং পরিণামে সংসার দুঃখেই নিমজ্জিত করে।

এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধনটি দুই প্রকার,—কেবল যোগ, আর ভক্তিসহিত যোগ। ভগবদ্‌ভক্তিশূন্য কেবল যোগসাধক যোগী ব্যক্তি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই অষ্ট অঙ্গ সাধন করিয়া অতিকষ্টে প্রায় মনোলয় অবস্থা পর্য্যন্ত আরূঢ় হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের যোগ সাধনে ভগবদাশ্রয়ের অভাব বশতঃ প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হয় না। সুতরাং শুদ্ধ জীবাত্মার অববোধ পর্য্যন্তও তাঁহাদের হয় না। এই প্রকার যোগী প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদির সাধন বলে প্রাকৃতিক অণিমা লঘিমা কামিতা বশিতা ইত্যাদি সামান্য সিদ্ধিবর্গের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিলেও পরিণামে সংসারগতিই লাভ করিয়া থাকেন; বরং কোনও কোনও স্থলে ভগবদ্‌ভক্তি সম্বন্ধে গুরুতর অপরাধী হইয়া উক্ত যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধি আদি এবং কথঞ্চিৎ মনের লয়াবস্থা হইতেও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। **সাধনের মধ্যে ভক্তি শক্তি না থাকিলে সর্ব্বপ্রকার সাধনেই এই প্রকার পতনাশঙ্কা অনিবার্য্য।**

প্রশ্ন—কেবল অষ্টাঙ্গ যোগে যে ধারণা ধ্যানের ব্যবস্থা আছে তাহা ভগবৎ সম্বন্ধ ছাড়া কি প্রকারে সম্ভব হয়? আর যদি ভগবদ্ধারণা ধ্যানাদিই হয় তবে আর ভক্তিরহিত কেবল যোগ হয় কি প্রকারে?

উত্তর—প্রশ্ন ঠিকই হইয়াছে। ভক্তিরহিত কেবল যোগ মার্গে ভগবদ্ধারণাদি নাই। তাদৃশ যোগী কেবল হঠযোগ মার্গই বেশীর ভাগ আশ্রয় করেন। আর অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে যাহা ধারণা করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা অধিকাংশ তাদৃশ যোগীর পক্ষে "ত্রাটক" নামক একপ্রকার ধারণা শিক্ষাই হয়। কেহ কেহ বা দেহের মধ্যে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা চক্র এই ষট্‌চক্রভেদে যত্নবান্ হইয়া তত্তৎ স্থানে মনের সহিত প্রাণবায়ু ধারণার কৌশল শিক্ষা করাকেই ধারণা বলিয়া মনে করেন এবং সেই প্রকার ধারণা নামক যোগ সাধন করেন, আর ঐ

মূলাধারাদি ষট্স্থানে তৎতৎ চক্রে চতুর্দ্দল ষড়্দল দশদল দ্বাদশদল ষোড়শ-দল দ্বিদলাদির ধ্যান এবং সেই সেই স্থলে প্রাণের স্থৈর্য্য করাই তাঁহাদের ধ্যান, মনকে নিরালম্বন করাই সমাধি।

প্রশ্ন—ভক্তিসহিত যোগ কি প্রকারে সম্পন্ন হয় বলুন ?

উত্তর—ভক্তিসহিত যোগ প্রথমতঃ দুই প্রকার ; ভগবদ্ধারণা ধ্যানাদিকে যোগ সাধনের অঙ্গ জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক যে ভগবদ্রূপ ধারণা এবং ধ্যান করা হয়, পরে ঐ ভগবদ্রূপ ধ্যানাদির বলে মনের চাঞ্চল্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইলে যোগী ব্যক্তি সেই ভগবদ্ধ্যানাদি পরিত্যাগ করিয়া মনকে নিরালম্ব অবস্থায় আনিয়া সমাধি লাভ করেন ; তাদৃশ যোগী ব্যক্তির যোগসাধনের ফল কেবল একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মাত্রই লাভ হয়, ব্রহ্মসাযুজ্য বা পরমাত্মসাযুজ্য লাভ হয় না। শুদ্ধ'ত্বম্' পদার্থ মাত্র অনুভবে তাদৃশ ব্রহ্মকৈবল্য লাভ হয় না। 'তৎ' পদার্থ তাদাত্ম্যাপন্ন 'ত্বম্' পদার্থানুভবই ব্রহ্মকৈবল্য লাভের উপায়, তাহা না থাকায় ব্রহ্ম বা পরমাত্ম সাযুজ্য লাভ হয় না। তথাপি ধারণাধ্যান কালে গৌণীভূতা ভক্তির কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকায় সেই ভক্তির গুণেই চিত্ত শোধিত হইয়া শুদ্ধ 'ত্বম্' পদার্থের প্রকাশে মনের লয় হওয়ায় দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই লাভ হয়। যেমন অর্চ্চি দীপ কলিকা তৈল বর্ত্তিকা শূন্য হইলে নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ উক্ত যোগমার্গে যোগীর মনের বৃত্তি লয়ে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ হইয়া যায়। লিঙ্গ শরীর ভঙ্গে আর ব্যবধান না থাকায় প্রত্যগাত্মানুভব রূপ মোক্ষ লাভ হয়। এখানে ধারণা এবং ধ্যান বিষয়ে একটু বক্তব্য আছে,—কেহ কেহ বিরাট্ পুরুষের ধারণাও করেন, তার পর বিরাড়ন্তর্যামী নারায়ণের ধ্যান করেন, কেহ কেহ ধারণা এবং ধ্যান এই উভয় সাধনেই নারায়ণের ধ্যান করেন, বিরাট্ পুরুষের ধ্যানাদি করেন না।

আর একপ্রকার ভক্তিসহিত যোগমার্গ সাধন আছে, তাহাতে ধারণা ধ্যানাদিতে যে ভগবদ্ রূপাদির ধ্যান ধারণা করা যায়, সমাধি অবস্থায় সেই ভগবানের নির্ব্বিশেষ চিৎসত্তার সহিত নিজের প্রত্যগাত্মার লয় চিন্তনই সমাধি। এই প্রকার যোগে ভক্তি শক্তির সাহায্যে ভগবানের

নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অনুভব থাকায় 'তৎ' পদার্থের অনুভূতি হয় এবং ব্রহ্মকৈবল্য লাভ হয়। এই যোগমার্গে ভগবদ্‌ধ্যানাদি ভক্তির সম্বন্ধ থাকিলেও জীব পরমাত্মার নির্ব্বিশেষ ঐক্য জ্ঞান রূপ সমাধি অবস্থায় ভক্তির বিকাশ না থাকায় কেবল ব্রহ্মানুভব মোক্ষই লাভ হয়। এতাদৃশ যোগীদিগের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা নিজের হৃদয়ে শুদ্ধ জীবসাক্ষী রূপেই নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার চিন্তন করেন।

প্রশ্ন—এখানে একটু সন্দেহ আছে, আপনি বলিতেছেন 'ভক্তি শক্তির সাহায্যে' ভগবানের নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অনুভূতি হয়, অথচ বলিতেছেন সমাধি অবস্থায় ভক্তির বিকাশ থাকে না, ইহার রহস্য কি ?

উত্তর—রহস্য এই যে তাদৃশ যোগীর ধ্যানাদি সাধনে ভগবদ্‌রূপাদির নিত্যতা বোধ এবং ভগবদ্ভক্তির কার্য্যসাধকতা জ্ঞান থাকিলেও 'আত্মৈক্য' জ্ঞানই শুদ্ধ ভক্তির বা প্রধানীভূত ভক্তির বাধক। সমাধি অবস্থায় সেই আত্মৈক্য জ্ঞানের প্রাবল্য থাকায়, ধারণা ধ্যানাদি কালে অনুষ্ঠিত ভক্তিটি শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভব মাত্র করাইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েন বা অন্তর্হিতা হয়েন। আবার কোনও কোন ও যোগী যোগসাধনে ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যানের দ্বারা মনকে লয় করিয়া সমাধি অবস্থায় ঐ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিতেই নিজের 'অহংগ্রহ' ভাব পোষণ করেন, সেখানেও ভক্তি ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় পরিণামে পরমাত্মার সাকার বিগ্রহ ঈশ্বর সাযুজ্য ফল লাভ করেন।

আর যে সকল যোগী ধারণাকালে ভগবানের বিরাট্ পুরুষের চিন্তনাদি করিয়া ক্রমশঃ বিরাট্ চিন্তন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরাড়ন্তর্যামী ভগবানের সবিশেষ পরমাত্মার রূপ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষের' উপাসনা অথবা নিজ হৃদয়ে ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই ভক্তিসাধন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না, বরং প্রধানীভূত হওয়ায় ভক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহারা শান্তরতি লাভ পূর্ব্বক ভগবৎ সালোক্যাদি মুক্তি ফলই লাভ করেন। এই যোগমার্গই 'বৈষ্ণব যোগ' অথবা হৈরণ্যগর্ভোপাসনা বলিয়া কথিত হয়। ইহাই যোগমিশ্রা ভক্তি। কোনও কোনও নিষ্কামকর্ম্মযোগীও নিজান্তর্যামী পরমাত্মাকে নারায়ণ রূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন।

প্রশ্ন—যোগীদিগের 'বিরাট্' ধারণাটি কি প্রকার?

উত্তর—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের যে ধারণাটি বলা হইয়াছে সেই ধারণার স্থলে, যাঁহাদের মন অতিশয় চঞ্চলতা বশতঃ সূক্ষ্মভাবে শ্রীভগবদ্ ধারণা ধ্যানাধিকারে অক্ষম, সেই রাগ দ্বেষাদিতে বিক্ষিপ্তমনা যোগীদিগের শ্রীভগবদ্ধারণার উপযোগী প্রথমতঃ বিরাট্ পুরুষের ধারণা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বিরাট্ রূপ বলিতে বিশ্বরূপকেই বুঝায়। ভগবানের এই বিশ্বরূপটি মায়িক অর্থাৎ মায়াকল্পিত, শ্রীভগবানে ইহা সত্য নহে। এই বিশ্বটিকেই ভগবানের একটি রূপ কল্পনা করিয়া তাহার কোন অঙ্গে মনোবৃত্তি স্থাপন করাই বিরাট্ ধারণা। তাৎপর্য্যার্থ এই যে অশুদ্ধচিত্ত যোগী ব্যক্তির অতি চঞ্চল মনটি যখন যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার পর্য্যন্ত সাধনে ও স্থৈর্য্যলাভ না করে, জাগতিক পদার্থে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায় এবং বিষয়ভোগে রাগ দ্বেষ স্পর্দ্ধা অসূয়াদির পরবশ হইয়া উঠে, জাগতিক জড়ীয় পদার্থে সঞ্চরণশীল তাদৃশ চঞ্চল মনটি জগতের মধ্যে যেখানে যেখানে যে যে বস্তুতে ভ্রমণ করুক না কেন যদি সেই সেই স্থলে সেই সেই বস্তুতে ভগবানের কোন অঙ্গ বা কোন গুণ বা কোনও ক্রিয়াদির সম্বন্ধ আরোপ করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক পদার্থে বিচরণশীল মনও ভগবৎ সম্বন্ধগুণে ক্রমশঃ শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইবে। তাই 'পাতাল ভগবানের পাদমূল, রসাতল পদের অগ্রভাগ, মহাতল গুল্ফদেশ, তলাতল তাঁহার জঙ্ঘা' ইত্যাদি, 'মহীতল তাঁহার জঘন, অন্তরীক্ষ তাঁহার নাভি, স্বর্গ তাঁহার বক্ষঃস্থল, ইন্দ্র তাঁহার বাহু, দিক্‌সকল তাঁহার কর্ণকুহর' ইত্যাদি, 'পুত্রাদিস্নেহ তাঁহার দন্ত, মায়া তাঁহার হাস্য, জগৎ সৃষ্টিই তাঁহার কটাক্ষ মোক্ষণ' ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপ কল্পনায় জাগতিক পদার্থ সমূহে ভগবদঙ্গজ্ঞানের সম্বন্ধ থাকায়, জগতের সমস্ত পদার্থই যখন ভগবানের কোন না কোনও অঙ্গ, তখন আর কাহার উপর মনের রাগ দ্বেষ অসূয়া স্পর্দ্ধাদির উদয় হইবে? সুতরাং চঞ্চল মনের সমস্ত বিষয়ই ভগবৎসম্বন্ধময় হইয়া উঠিবে। এই প্রকারে জাগতিক বস্তুর চিন্তাও ভগবৎচিন্তনেই পর্য্যবসিত হয়, তখন আর মনে জাগতিক কোন পদার্থকে

বিষয় করিয়া স্পর্দ্ধাদির উদয় হইতে পারে না। মন তখন শুদ্ধ হইয়া সাক্ষাদ্ ভগবদ্রূপ ধারণার এবং ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করে। তখন এই যোগী ব্যক্তি বিরাট্ ধারণা ত্যাগ করিয়া বিরাড়ন্তর্যামী ভগবানের পরমাত্মস্বরূপ "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি অথবা "প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুর্জম্" ইত্যাদি ব্যষ্টি অন্তর্যামী পুরুষকে ধ্যান করেন। আর যাঁহারা ঐ ভগবানের মায়াকল্পিত বিরাট্ মূর্ত্তিতে আসক্ত হইয়া ঐ মূর্ত্তিই পরম সত্য বলিয়া ধারণা ধ্যানে আসক্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা কিন্তু সংসারগতিই লাভ করেন।

যোগমার্গে চারিপ্রকার ধারণা দেখা যায়। প্রথম প্রকার,—কেহ কেহ কোনও প্রকার ভগবদ্রূপকে আশ্রয় না করিয়া নিজদেহাভ্যন্তরে মূলাধারাদি ষট্স্থানে মনের সহিত প্রাণের ধারণা করেন। এইটি ভক্তিশূন্য শুষ্ক যোগমার্গ। ইহা প্রথমে বলিয়াছি, ইহার চরম ফল এই সংসারই। দ্বিতীয় প্রকার,—প্রথমতঃ বিরাট্ ধারণা করিয়া শেষে শুদ্ধ ভগবদ্রূপের ধ্যান ধারণা করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ "ত্বম্" পদার্থানুভব পর্য্যন্তই লাভ করেন। তৃতীয় প্রকার,—প্রথমতঃ বিরাট্ ধারণার অন্তে ভগবৎ স্বরূপ ধ্যান করিয়াও নির্ব্বিশেষ পরমাত্মৈক্যজ্ঞানে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। চতুর্থ প্রকার,—কেহ কেহ বিরাট্ ধারণার অন্তে অথবা বিরাট্ ধারণা না করিয়াই পরমাত্মার সাকার বিগ্রহ গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা নারায়ণ অথবা ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী চতুর্ভুর্জ পরমাত্মার উপাসনা করেন, ফলে সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করেন।

অহংগ্রহোপাসনা

প্রশ্ন—আপনি এই যোগমার্গের কথা বলিতে একস্থানে "অহংগ্রহ" ভাব পোষণ করিয়া ঈশ্বর সাযুজ্য লাভের কথা বলিয়াছেন। এই অহংগ্রহটি কি? একটু বিস্তার করিয়া বলুন।

উত্তর—পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যজ্ঞান দুই প্রকার, একটি নির্ব্বিশেষ সাম্মুখ্য, আর একটি সবিশেষ সাম্মুখ্য। নির্ব্বিশেষ সাম্মুখ্যের বিষয় পূর্ব্বে 'জ্ঞানসাধনে'

বলিয়াছি। সবিশেষ সাম্মুখ্য প্রথমতঃ দ্বিবিধ, একটি ভক্তি উপাসনা রূপ সবিশেষ সাম্মুখ্য আর একটি অহংগ্রহোপাসনারূপ সবিশেষ সাম্মুখ্য। ভক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন অহংগ্রহ উপাসনার কথা কিছু বলিতেছি। যে উপাসনায় উপাস্যতে "অহং" এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নামই অহংগ্রহ উপাসনা। স্মার্ত্ত মতে কোন কোন তন্ত্রপুরাণাদির মতে এই অহংগ্রহ উপাসনার বিধি দেখা যায়। এই উপাসনায় যে যে দেবতাকেই উপাসনা করা যাক্ না কেন সেই সেই দেবতার সহিত উপাসক ব্যক্তি নিজকে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। মনে করুন, যদি কেহ শিবোপাসনা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ নিজ শরীরের পঞ্চভূতাকারত্বের বিশোধন করিতে হইবে, ইহার নামই ভূতশুদ্ধি। এই ভূতশুদ্ধিতে "সোঽহম্" এই প্রকার বলিয়া সেই উপাস্য দেবমূর্ত্তি শিব আমিই এই ভাবে নিজকে দেবতার সহিত অভিন্ন মনে করিতে হইবে। ধূমবীজ অগ্নিবীজ অমৃতবীজাদি কতকগুলি বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজের দৈহিক পাঞ্চভৌতিক অংশ এবং নিজের পাপময় দেহের শোষণ দহন চিন্তা করিয়া অমৃতময় দেব শরীর উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে। পরে মাতৃকাবর্ণ বীজসমূহ অঙ্গে ন্যাস করিয়া উপাস্য ঐ শিব দেবতার আকার চিন্তা করিয়া নিজকেও সেই আকারে আকারিত চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রকার ব্যবস্থা স্মার্ত্তমতে এবং কোন কোন তান্ত্রিকদিগের উপাসনায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই প্রকার অহংগ্রহ উপাসনার ফল কোথাও ব্রহ্মসাযুজ্য, কোথাও ঈশ্বর সাযুজ্য, কোথাও বা সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যাদি মুক্তি। শুদ্ধভক্তিপ্রিয় ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তি উপাসনায় এই অহংগ্রহ উপাসনাটি ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় না, বরং ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হয়।

প্রশ্ন—একই অহংগ্রহ উপাসনায় ফলকালে ব্রহ্মসাযুজ্য ঈশ্বরসাযুজ্য ইত্যাদি ভেদ কেন ?

উত্তর—একই অহংগ্রহ উপাসনায় উপাসকের উপাসনার ভাবের ভেদে এই প্রকার ফলেরও ভেদ হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের একটি সাধন বিশেষ মনে করিয়া, অর্থাৎ তত্ত্বতঃ মূলতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই মনে

করেন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে সাক্ষাৎ কোন সাধন ভজন হইতে পারে না, এইজন্য জগতের হিতার্থে সাধকের সাধনাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের মায়াকল্পিত বিগ্রহ মনে করিয়া কালী দুর্গাদি শক্তি বিগ্রহ বা শিব সূর্য্য বিষ্ণু আদি স্বরূপ বিগ্রহের অর্চ্চনাদি করেন, ঐ বিগ্রহ এবং তত্তৎ রূপ গুণ লীলাদি সমস্তই মহাপ্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইয়া এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই থাকে এই জ্ঞানে ঐ ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনাদিকালেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব পোষণ করিয়াই নিজের অভেদ জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই সাধনের এবং ভাবের উচিত ফল ব্রহ্মসাযুজ্যই লাভ হয়। আর যাঁহারা বিষ্ণু ভিন্ন দেবমূর্ত্তির অহংগ্রহোপাসনা করেন অথচ মোক্ষ ভিন্ন নানাপ্রকার সুখৈশ্বর্য্যাদি কামনা করেন তাঁহারা তত্তৎ দেবতার সমান আকৃতি ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া সেই সেই দেবাধিকার লোকে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বাস করেন, মহাপ্রলয়ান্তে ব্রহ্মসাযুজ্যই প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা বিষ্ণু স্বরূপ বিগ্রহের উপাসনায় অহংগ্রহোপাসনা করেন, তাঁহারা সেই বিষ্ণু স্বরূপ বিগ্রহেই সাযুজ্য প্রাপ্ত হন; আর যাঁহারা "তৎ শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরোঽহং" ইত্যাকাররূপে বিষ্ণু স্বরূপের অহংগ্রহোপাসনা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকে সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্যাদি ঐশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি লাভ করেন। ভক্তিমার্গে উপাসনা করিয়া যে সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য সালোক্য মুক্তি লাভ হয় তাহা অহংগ্রহোপাসনার ফল সারূপ্যাদি হইতে পৃথক্। সালোক্যাদি মুক্তি দুই প্রকার, একটী ঐশ্বর্য্যোত্তরা আর একটী সেবোত্তরা। অহংগ্রহোপাসনায় যে সালোক্য সারূপ্যাদি মুক্তি তাহাতে ভগবৎ প্রেমসেবানন্দ নাই, কেবলমাত্র ঐশ্বরিক চতুর্ভুজাদিরূপ এবং তাদৃশ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি বিভূতি প্রভৃতি এবং তদুচিত ঐশ্বরিক আনন্দমাত্র আছে। আর যাহা ভক্তিসাধনার ফলস্বরূপ সারূপ্যাদি তাহাতে ভগবৎ সেবা জনিত অপূর্ব্ব আনন্দ বৈচিত্র্য মুখ্যরূপে আছে। শুদ্ধভক্তি সাধনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ন্যায় অহংগ্রহোপাসনারও স্থান নাই।

রাধিকানাথদেবস্য সন্ন্যাসবিগ্রহং ভজে।
মম সাধনসর্ব্বস্বং যস্য পাদাম্বুজাশ্রয়ঃ॥

সৎসঙ্গ

প্রশ্ন—যদি জীব অনাদি কাল হইতেই স্বভাবতঃ পরতত্ত্ব বিমুখ হইয়া থাকে তবে ঐ জীবের পরতত্ত্ব সাম্মুখ্য লাভের উপায় কি ?

উত্তর—অনাদি কাল হইতে পরতত্ত্ব বিমুখতা হেতু মায়িক সংসারের দুরন্ত অনন্ত সন্তাপে সন্তপ্ত জীবের পরতত্ত্ব সাম্মুখ্য লাভের একমাত্র উপায় সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ এবং তাঁহাদের কৃপা, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। দুস্তর মায়া গ্রস্ত জীবের নিস্তারের উপায় শ্রীভগবানের **নির্হেতু পরম করুণাই**। কিন্তু ভগবানের এই করুণাই জীবের হিতার্থে সাধু মহাপুরুষ রূপে এই প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক জগতে **সাধুমহাপুরুষগণই ভগবৎ কারুণ্য ঘনমূর্ত্তি**। সুতরাং সৎসঙ্গ লাভ করার অর্থ সাক্ষাৎ ভগবৎ করুণাই লাভ করা। তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দর্শন মাত্রেই মনুষ্য সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, "দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতু র্যথা" (১০ স্কঃ, ১০ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত)—দর্শন মাত্রেই তাঁহারা জীবের তত্ত্বজ্ঞানোন্মেষণ করাইয়া সংসার অন্ধকার দূরীভূত করেন।

প্রশ্ন—এই সৎ মহাপুরুষ বলিতে কি বুঝায় ?

উত্তর—হাঁ, একটু জানা চাই ; এ স্থলে সাধু মহাপুরুষ বলিতে যাঁহারা সাধারণ বর্ণ বা আশ্রম উচিত বেদবিহিত কর্ম্ম করেন বা সাধারণ ভাবে মাত্র সত্য দয়া ক্ষমাদি গুণ বিশিষ্ট পুণ্যবান্ তাঁহারা নহেন। ভগবজ্‌জ্ঞান তৎপর ভগবৎ সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষগণেরই সঙ্গ এবং কৃপা প্রভাবে জীব ভগবত্তত্ত্বোন্মুখ হইতে পারে।

প্রশ্ন—এই প্রকার সৎসঙ্গ লাভের উপায় কি? মায়ামুগ্ধ সংসারাসক্ত আমরা কি প্রকারে সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি?

উত্তর—সৎ মহাপুরুষদিগের স্বৈর কৃপাই তাঁহাদিগের সঙ্গলাভের একমাত্র হেতু। তাঁহাদের স্বৈরচারিতাই তাঁহাদের সঙ্গলাভের কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা কৃপা না করিলে কেবলমাত্র আমাদিগের ধন জন আদির বিনিময়ে তাঁহাদের সঙ্গ আমরা ক্রয় করিতে পারি না। **"অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য"** (৩ স্কঃ, ৫ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত)। মঙ্গলময় ভগবজ্জনসকল ভগবদ্‌বিমুখ জনদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমরা এখন তাঁহাদের কৃপাকে সাদরে গ্রহণ করিলেই পরম কৃতার্থের পথে উন্নীত হইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সতত উৎকণ্ঠিত হইয়াই নানা ছলে আমাদের নিকটে আইসেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞানে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করি, পারমার্থিক জ্ঞানে গ্রহণ করি না বলিয়াই তাদৃশ সৎ মহাপুরুষের দর্শন স্পর্শনাদি লাভ করিয়াও আমাদের ভগবদুন্মুখতা আইসে না। মনে করুন, কোন মহাপুরুষ তাঁহার নিজের কোন অভাব জানাইয়া আমার নিকট আগমন করিলেন, বা যদৃচ্ছাক্রমে আসিলেন; আমার নিকট আরও দশজন যেমন উপকৃত হইতে আসে তাঁহাকেও আমি সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপাদি করিলাম, হয়ত তাঁহাকে উপযুক্ত পুণ্যবান্ সৎপাত্র মাত্রই মনে করিয়া তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলাম, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত মাত্র কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়াই নানাপ্রকার দেশ বিদেশের কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম,—সাধুর বাড়ী কোথায়, কতদিন হইল তিনি ঘর সংসার ছাড়িয়াছেন, তাঁর স্ত্রী পুত্র আছে কিনা ইত্যাদি আলাপ করিয়া ভাবিলাম তাঁহার সন্তোষই উৎপাদন করিয়াছি, কিন্তু হায়, আমার মনে একবারও উদয় হইল না যে দীন গৃহমেধী সংসার কারাগারে নিরন্তর আবদ্ধ আমাদের তীর্থাদি স্থলে যাইয়া তাদৃশ মহাপুরুষদিগের দর্শন ও সঙ্গলাভ নিতান্ত অসম্ভব, তাই এই মহাপুরুষ মদ্‌বিধ জনের পরম মঙ্গল বিধানের জন্যই যদৃচ্ছাক্রমে আমার গৃহে

নিজের উপকার প্রার্থনার ছলে আগমন করিয়াছেন, **"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং নিঃশ্রেয়সায়"** (১০ স্কঃ, ৮ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত)। এইরূপ ভাব উদয় হওয়া ত দূরে থাকুক, প্রকৃত সৎ মহাপুরুষোচিত আদর সম্মানও তাঁহারা আমাদের নিকট পান না। অনেক সময় যে তাঁহাদিগকে আমরা প্রণামাদি দ্বারা ভক্তি ব্যবহার করি তাহাও পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে, বিষয়ভোগেচ্ছু মনঃপ্রাণের ভোগপ্রবণতার দিক্ দিয়াই করি। উপরে উপরে ভাবি আমি ভক্তিই করিতেছি, বস্তুতঃ বিষয়ভোগ-প্রবণতাময় চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম গতি অনেক সময় বুঝিতে পারি না; কি জানি ইঁহারা রুষ্ট হইয়া অভিশাপাদি দিলে আমাদের বিষয় সুখের ব্যাঘাত হইবে, ইঁহারা তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে আমাদের বিষয় ভোগ বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি ভাব আমাদের মনে সংস্কাররূপে আবদ্ধ আছে, তাই আমরা ভয়ে বা বিষয়লোভে ভক্তির ভান মাত্রই করিয়া থাকি। আবার কোন কোন সময়ে যখন দুর্ভাগ্যের চরম শিখরে আমরা আরোহণ করি তখন এতটুকু সৌজন্যও প্রকাশ করি না, প্রত্যুত ধন জন মান যশ কুল প্রভৃতির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতি নানা প্রকার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হাসি বিদ্রূপ ভাব দেখাইয়া নিজদিগের পাশবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকি।

প্রশ্ন—আপনি যে বলিলেন সৎ মহাপুরুষের দর্শন মাত্র পরতত্ত্বের জ্ঞানোন্মেষ হইয়া মনুষ্যের সংসার অন্ধকার দূরীভূত হয়, আমরা শ্রদ্ধা পূর্ব্বকই তাঁহাদিগকে দর্শন করি আর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকই করি, তাঁহাদের দর্শনের ফল ত অবশ্যই হইবে?

উত্তর—হাঁ সত্য; যাঁহাদের প্রাক্তন বা আধুনিক গুরুতর অপরাধ বর্ত্তমান থাকে তাঁহারা মহাপুরুষদিগকে অনাদর করেন বা পুণ্যবান্ জন মনে করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আদর মাত্র করেন; কিন্তু ঐ প্রকার গুরুতর অপরাধ দোষ নিবৃত্তির জন্য মহাপুরুষদিগের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য দর্শন বা আদর প্রচুর নহে; সেখানে মহাপুরুষগণের বিশেষ কৃপার অপেক্ষা থাকে, সেখানে যৎকিঞ্চিৎ সাধু দর্শন মাত্রেই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য লাভ হয় না। আর যাঁহাদের তাদৃশ কোন গুরুতর অপরাধ নাই, কেবলমাত্র বিষয়বার্ত্তাদিময়

ভগবদ্‌বিমুখতা, সেই স্থলেই মহাপুরুষের দর্শন স্পর্শনাদি যে কোনও সম্বন্ধ ঘটিলেই পরম তত্ত্বের সাম্মুখ্যলাভ সঙ্ঘটিত হয়।

প্রশ্ন—আপনার কথিত সৎ মহাপুরুষের এই করুণা লাভ করা যায় কি প্রকারে?

উত্তর—"সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা।" কৃপা বলিতে পরের দুঃখ প্রহাণের ইচ্ছাকে বুঝায়, ইহা এক প্রকার চিত্তের বিকার বিশেষ। তাৎপর্য্য এই যে পরের দুঃখটি নিজের চিত্তকে স্পর্শ করিলে চিত্তে একটি বিকার উপস্থিত হয়, তখন পরের দুঃখের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া চিত্তের উপর একপ্রকার দ্রবভাব অর্থাৎ কোমলতা আনয়ন করে। ঐ কোমলতা-ময় চিত্ত তখন সেই পরের দুঃখনাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাদৃশ চিত্তের অবস্থাকে কৃপা বলা যায়। তাহা হইলে বুঝুন, আমাদের দুঃখ নাশের জন্য সৎ মহাপুরুষদিগের চিত্তে যাহাতে ঐ প্রকার কোমলতাময় একটি বিকার উপস্থিত হয় এমন কিছু অবস্থা লইয়া আমরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি তবেই আমরা তাঁহাদের কৃপা পাইতে পারি, জীবের দুরবস্থা দর্শনমাত্রেই তাঁহাদের কৃপার উদয় হয়। আমাদের দুরবস্থা দেখান ঝুলিটি স্কন্ধে করিয়া তাঁহাদের কৃপার ভিখারী হইতে পারিলে আমরা তাঁহাদের কৃপার দান ভাগবতী সম্পত্তি লাভ করিয়া পরম কৃতকৃতার্থ হইতে পারি।

প্রশ্ন—আমরা ত ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর বিষয়তাপে স্বতঃই দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছি, ইহা ত সৎ মহাপুরুষেরা দেখিতেছেন, তবে আবার দুর্দ্দশা দেখান কাহাকে বলে?

উত্তর—ঠিক কথা, আমরা অবিদ্যাগ্রস্ততানিবন্ধন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াই আছি। অনেক সময় গুরুতর অবিদ্যারোগে অতি উৎকট বিকার গ্রস্ত হইয়া তাদৃশ নিজ দুর্দ্দশার উপর গাঢ় আবরণ দিয়া আমার দুর্দ্দশা যে বিন্দুমাত্র নাই তাহাই ব্যক্ত করিতে থাকি। তখন কিন্তু চিকিৎসকের সামান্য দর্শনে রোগের উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন অসম্ভব হইয়া উঠে। চিকিৎসকের তখন বিশেষভাবে দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

প্রশ্ন—কথাটি একটু প্রহেলিকার মত হইল, একটু বুঝাইয়া বলুন।

উত্তর—কেবলমাত্র বিষয়াসক্ত ভগবদ্‌বহির্মুখ জীবের দুর্দ্দশা দর্শন সৎ মহাপুরুষের দৃষ্টিতে স্বতঃই হয়। আর সেখানে তাঁহাদের যথাকথঞ্চিৎ সঙ্গমাত্রেই জীব ভগবদুন্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এমনই হতভাগ্য মায়াবিড়ম্বিত জীব আছে, যাহাদের ভগবদ্‌বহির্মুখতাময় বিষয়াসক্তি ত আছেই, প্রত্যুত ভগবদ্‌ভক্তি ভক্ত এবং ভগবান্‌কে যাহারা ধনৈশ্বর্য্যকুলমানাদি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে, নিরন্তর অপরাধময় চেষ্টাসমূহ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে, দম্ভ মাৎসর্য্যের গাঢ় আবরণে নিজের দুর্দ্দশাকে আবৃত করিয়া থাকে; সেখানে সেই হতভাগ্যদের দুর্দ্দশাটি সৎ মহাপুরুষদিগের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। তাহাদের সেই গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া দুর্দ্দশা দর্শন করিতে হইলে সাধুমহাপুরুষগণের **বিশেষ দৃষ্টি** চাই। ইহাই তাঁহাদের কৃপা।* যেমন নলকূবর মণিগ্রীবের প্রতি অভিশাপাদি দ্বারা তাহাদের ধনৈশ্বর্য্যবলাদি গর্ব্ব নাশ করিয়া যমলার্জ্জুনবৃক্ষরূপ স্থাবরতা প্রাপ্ত করাইয়া পরিশেষে ভগবৎপ্রাপ্তি করানই শ্রীনারদের বিশেষ কৃপা।

প্রশ্ন—সাধুমহাপুরুষগণ যে ক্রোধাদিবশতঃ অভিশাপাদি দান করেন তাহাও কি তাঁহাদের কৃপা?

উত্তর—হাঁ, ঘৃণ্যবিষয়ভোগপ্রবণচিত্তে বিষয়ের প্রতিঘাতক অভিশাপাদিকে আমরা কৃপা বলিয়া মনে করিতে কষ্টই বোধ করি বটে, কিন্তু মহাপুরুষদিগের ঐ প্রকার ক্রোধের পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে উহা কৃপা। তবে ভগবত্তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণই যে ক্রোধ করেন বা অভিশাপাদি দান করেন তাহাতে দুরন্ত ধনৈশ্বর্য্যকুলমানাদিমদান্ধজনের চক্ষুরুন্মীলনই হয়। সেটি তাহাদের উপকারই। কেবলমাত্র স্বধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মতপস্বী সাধুপুরুষদিগের ক্রোধ

তান্ বৈ হ্যসদ্‌বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথ ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥

৩ স্কঃ, ৫ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ হে উরুগায়, হে পরেশ, যাহারা অসদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ সাপরাধ চেষ্টাময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তোমা হইতে পরাবৃত্তমনা সেই অসজ্জনসমূহের প্রতি তোমার পাদপদ্মবিলাসলক্ষ্মীভাজন যাঁহারা তাঁহারা নিশ্চয়ই দৃষ্টিপাত করেন না।

বা শাপাদি তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। তাহাতে আপাততঃ ধনৈশ্বর্য্যকুলমানাদি জনিত গর্ব্বাদি কিছু খর্ব্ব হয় বটে, কিন্তু পরমার্থের দিক্ দিয়া কিছুই হয় না। ঐ প্রকার ক্রোধ অভিশাপাদি রজোগুণেরই বৃত্তি বিশেষ। সাধুমহাপুরুষের কৃপা দুই প্রকারে হয়; কোথাও প্রাকৃত ধনাদি নাশ পূর্ব্বকই তাঁহারা কৃপা করেন, কোথাও প্রাকৃত ধনাদি রক্ষা করিয়াও তাঁহারা কৃপা করেন। মনে করুন, কোনও নিদ্রিত ব্যক্তিকে গায়ে হাত বুলাইয়া জাগান যায়, আর কোনও গভীর নিদ্রাতুর ব্যক্তিকে সময়বিশেষে চপেটাঘাত দ্বারাই জাগাইতে হয়, জাগান কিন্তু উভয়কেই সমান, যাহার ঘুম যেমন তাহাকে তেমন ভাবেই জাগাইতে হয়। সেই প্রকার **মহাপুরুষদিগের কৃপার ফল পরতত্ত্বোন্মুখতা।** সূক্ষ্মদৃষ্টি কৃপালু মহাপুরুষগণ যাহার যেমন যোগ্যতা তাহার প্রতি সেইরূপ নিজ কৃপার আকার ধারণ করান।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ভগবান্ ত সর্ব্বত্র কৃপাময়, তাঁহার কৃপায় ত জীবের সংসার মুক্তি হইতে পারে? সৎ মহাপুরুষদিগের সঙ্গ বা তাঁহাদের করুণা না হইলে কি হয় না?

উত্তর—না, তাহা হইতে পারে না। জাগতিক জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা দুই প্রকারে হয়। একটি সাধারণী মায়াময়ী কৃপা, আর একটি স্বরূপশক্তিময়ী কৃপা। মায়াশক্তির দ্বার দিয়া যে করুণা প্রকাশ পায় তাহাকে মায়াময়ী কৃপা বলা যায়। জীবের দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদির তত্তৎ প্রবৃত্তি চেষ্টাদির মূলে শ্রীভগবানের করুণাই একমাত্র কারণ। জীবের কর্ম্মপ্রেরক ফলদাতা একমাত্র শ্রীভগবানই, অধিক কথা কি, স্বরূপতঃ জীব শ্রীভগবদধীন; কিন্তু এই কৃপাটি মায়াময়ী সাধারণী; যেমন মনে করুন, আমি ভগবদ্‌বহির্মুখ জীব, ভগবানের কোনও সাধন ভজন করি না, ভগবান্ বলিয়া কিছু বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি না, তথাপি তিনি আমার দেহ মনঃপ্রাণের প্রবৃত্তির মূল পরিচালনা ত্যাগ করেন না, আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি, তাঁহার বিশাল উদারতাময় আকাশ বায়ু আলোক জল ইত্যাদিকে যোগাইতে কার্পণ্য করেন না, তিনি শত্রুতা করিয়া আমার স্বীয় কর্ম্মোচিত ফলদানে বৈষম্য করেন না। ইহা তাঁহার করুণা নয় কি?

করুণা হইলেও এই প্রকার সাধারণ মায়িক করুণায় জীবের দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। আর ভগবানের যে করুণায় দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহাই তাঁহার **স্বরূপশক্তিময়ী করুণা** যে করুণার ফলে আমরা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার যাতনার নিবৃত্তি করিতে পারি। ভগবদুন্মুখকারিণী ভগবৎকরুণাই ত সাধুমহাপুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার পৃথক্ করুণা কি? এই সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি সাধুমহাপুরুষদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভগবানের পরোক্ষ করুণার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে বস্তুতঃ ভগবৎ করুণা পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ ভগবৎ করুণা লাভ করিতে হইলে সৎ মহাপুরুষের করুণার অর্চ্চনা করিতেই হইবে। ভগবদুন্মুখকারিণী ভগবানের যে করুণা তাহাত ভগবানেতেই নাই, **তিনি তাঁহার নিজকরুণা ভক্তের ভক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া স্বয়ং ভক্তাধীন হইয়া পড়িয়াই আছেন।** নিজের চরণোন্মুখ বিষয়ে যে নিজের করুণা সেই করুণাসর্ব্বস্ব ভক্তকে দান করিয়া ভগবান্ নিজেই নিঃস্ব। আমাকে করুণা কোথা হইতে করিবেন? **ভগবৎকরুণা সৎসঙ্গবাহনা অথবা সৎকৃপাবাহনা হইয়াই জীবে সংক্রামিত হয়।** সাধু মহাপুরুষদিগের করুণা না হইলে ভগবৎকরুণা হয় না।

প্রশ্ন—অনেক স্থলে এমন দেখা যায় কোন ব্যক্তি সৎসঙ্গ কিছুই করে নাই, অথচ সেই ব্যক্তি আশৈশব ভগবদুন্মুখ, ইহার কারণ কি?

উত্তর—আধুনিক সৎসঙ্গ দেখা না গেলেও উক্ত ব্যক্তির প্রাক্তন সৎসঙ্গ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কোথাও কোথাও সাক্ষাৎ সৎসঙ্গ না থাকিলেও পারম্পরিক সৎসঙ্গের প্রভাবে জীব ভগবদুন্মুখ হয়। আধুনিক বা প্রাক্তন বা পারম্পরিক যে কোন প্রকার সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা ভিন্ন পরতত্ত্বসাম্মুখ্য জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

ভগবদ্ভক্তজনের জীবনযোনিসংস্কার

সৎ মহাপুরুষের করুণা তাহাকে বলা যায় যে করুণায় জীবনী শক্তি আছে। জীবনীশক্তি বলিতে ভগবদুন্মুখতাই বুঝায়। জীবনযোনিসংস্কার

যেখানে যত স্ফুরিত হয় জীবনী শক্তির পরিচয় সেখানে ততই পাওয়া যায়। এই জীবনযোনিসংস্কার যতই বহুকালের পূর্ব্বের সংস্কার হউক না কেন এবং অন্যান্য সংস্কার ইহাকে যতই ব্যবহিত করিয়া রাখুক না কেন, কিন্তু জীব যখন যে দেহ ধারণ করে সেই দেহস্থ জীবের জীবন রক্ষণের ঠিক উপযোগী সময়ে সেই দেহোচিত জীবনযোনিসংস্কারটি অন্যান্য যাবতীয় সংস্কারকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবন রক্ষার উপযোগী চেষ্টার প্রতি ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিবেই। এই সংস্কার না থাকিলে জীবনই রক্ষা পায় না। এই জন্যই ইহাকে জীবনযোনিসংস্কার বলা যায়। মনে করুন, সদ্যঃপ্রসূত শিশু বা গোবৎসাদির স্তন্যপানের প্রবৃত্তি এবং স্তন্যপানের চেষ্টা প্রভৃতি তাহাকে কে শিখাইল? তাহাকে এ জ্ঞান কে দিল,—"মাতৃস্তন্য তুমি পান কর"? তাদৃশ শিশু বৎসাদির তাদৃশ জ্ঞান তখনও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই যে অপরের শিক্ষায় তাদৃশ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তথাপি উহাদের এই জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? জ্ঞান বিনা ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি হইতে পারে না। একমাত্র সেই জীবনযোনিসংস্কারের বলেই শিশু বৎসাদির জীবন রক্ষার উপায়ীভূত স্তন্যপান বিষয়ক জ্ঞান এবং তদ্‌বিষয়ক ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে। ঐ শিশুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুষ্য দেহের জীবনযোনিসংস্কার, গোবৎসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গো দেহের জীবনযোনিসংস্কার, এই প্রকার পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকল দেহেরই জীবনযোনিসংস্কার আত্মাতে আহিত থাকে। ঐ বালক পূর্ব্বে যে কোন সময় মনুষ্যদেহকে নিশ্চয়ই ধারণ করিয়াছিল, সেই মনুষ্যজনোচিত জীবনরক্ষার উপায়ীভূত স্তন্যপানের সংস্কার তাহার আত্মাতে চিত্তসহযোগে আহিত আছে। মধ্যে হয়ত পশু পক্ষী স্থাবরাদি মনুষ্য ভিন্ন সহস্র সহস্র জন্ম লাভ করিয়া তৎ তৎ নানাবিধ সংস্কার বিশিষ্ট হইলেও কর্ম্মচক্রে আবার যখন মনুষ্যদেহ লাভ তাহার ঘটিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যদেহস্থিত জীবনের রক্ষার উপায়ীভূত স্তন্যপান সংস্কারটি অন্যান্য সংস্কারের ব্যবধানকে অপসারণ পূর্ব্বক উদয় হইয়া তাহাকে স্তন্যপানে প্রবর্ত্তিত করিল। এই প্রকার গোবৎসাদি সকল যোনিতেই এই জীবনযোনিসংস্কার উপস্থিত হয়। অনাদি কর্ম্মপথে অনাদি কাল হইতেই বিচরণশীল জীবে মনুষ্যাদি স্থাবর জঙ্গম সকল দেহেরই সংস্কার আছে। ঠিক এই প্রকার **ভগবদুন্মুখতা রূপ জীবনের**

মহৎ করুণাই একমাত্র জীবনযোনিসংস্কার। যে ভাগ্যবান্ জীবে মহাপুরুষের করুণা পতিত হইয়া কারুণ্য শক্তির কার্য্য যত বেশী করে সেই জীবে ভগবদুন্মুখতা ততই প্রবল হইষা উঠে। জীবনযোনিসংস্কারটি জীবনের পাশে পাশেই সতত ঘুরিতে থাকে, যখনই জীবননাশের কোন প্রকার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় বা জীবনীশক্তির কোন প্রকার অপচয়ের সম্ভাবনা হয়, তখনই ঐ সংস্কারগুলি জাগ্রত হইয়া যোগ্যতা অনুসারে জীবনরক্ষার উপায়ীভূত প্রবৃত্তি জন্মায়। যেমন মনে করুন, আপনি কোন উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ নিম্নে পড়িয়া যাইতেছেন, সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যাহাতে না পড়েন তাহার জন্য যোগ্যতা অনুসারে পতনবিরোধী জ্ঞান ইচ্ছা প্রবৃত্তি অতিক্রুততার সহিত আপনার স্থূল বুদ্ধি বিবেচনার অলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদির এমন একটি চেষ্টা হইতে থাকিবে যাহাতে আপনি পতিত না হন, কিছু আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। বস্তুতঃ আপনি কোন বস্তু আশ্রয় পান বা না পান, একেবারে পড়িয়া যান বা পতন হইতে রক্ষাই পান তাহা আপনার অন্য কোন অদৃষ্টই বিধান করিবে। কিন্তু জীবনযোনিসংস্কার থাকিলে সে নিশ্চয়ই আপনার জীবনরক্ষার উপায় স্বরূপ হস্তপদাদির কোনও কিছু ধরা চেষ্টার প্রবৃত্তি জাগাইবেই জাগাইবে। ঠিক এই প্রকার জীবের প্রতি মহাপুরুষের প্রকৃত করুণাটি সেই জীবের ভগবদুন্মুখতার চারি পাশে সর্ব্বদাই ঘুরিতে থাকে এবং সর্ব্বদাই ঐ ভগবদুন্মুখতারূপ জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। যদি ভগবদুন্মুখতা কমিয়া যায়, অর্থাৎ সাধনভজনে শিথিলতা আসিতে থাকে এবং ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যবক বস্ত্বন্তরে অর্থাৎ যে বস্তু ভগবন্নিষ্ঠাকে বিচ্যুত করে তাহাতে ক্রমশঃ আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মহৎকৃপার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। **তাই ভগবদুন্মুখতার পরম সংস্কারই একমাত্র মহাপুরুষের করুণা।**

প্রশ্ন—অনেকে মনে করেন বা বলেন যে একবার কোন মহাপুরুষের কৃপা প্রাপ্ত হইলে সাধনভজন না করিলেও বা সাধনভজন শিথিল হইয়া গেলেও ঐ কৃপা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। এমন কি তাঁহাদের সাধনভজনের কোনও প্রয়োজনই নাই। ইহা কি সত্য নহে?

উত্তর—ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্ত মহাপুরুষের তাদৃশ কৃপাটি কখনই বৃথা যায় না ইহা সত্য। কিন্তু কতকগুলি বিচার আছে। আপনি যে মহাপুরুষের কৃপা বলিতেছেন সে কৃপাটি কি? কেমন কৃপা, কতটুকু কৃপা? বিশেষভাবে ইহা বুঝা প্রয়োজন।

প্রশ্ন—কোন সাধু মহাপুরুষের নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ বা কোন সাধু মহাপুরুষের স্নেহাদি আকর্ষণ প্রভৃতি তাঁহাদের কৃপা।

উত্তর—দীক্ষাদানাদি এবং মহাপুরুষের স্নেহাদি সম্বন্ধে পরে বিশেষ বলিব, আপাততঃ কয়েকটি কথা বলি, শুনুন। আমরা শাস্ত্রে এবং সাধনভজন-পরায়ণ মহাত্মাদিগের অনুভবে এই জানি যে যাঁর প্রতি মহাপুরুষের যত কৃপা ভগবদ্‌ভজনে তাঁর ততই নির্ম্মল অনুরাগ বাড়ে। যদি ভগবদ্‌ভজনে অনুরাগ না দেখা যায় তাহা হইলে আমরা মহাপুরুষদিগের শুদ্ধ কৃপার কি মূল্য আছে তাহা বুঝিতে পারি না। ভগবদুন্মুখতা নাই, বিষয়কর্ম্ম, বিষয়বার্ত্তা, নিরন্তর বিষয়াবিষ্টতা প্রচুর আছে, দৈবাৎ যদি কোন সৎ মহাপুরুষাদি কিছু ভগবদ্‌ভজনাদি উপদেশ করিতে যান তখন সেই বিষয়ী ব্যক্তিরা, "আজ্ঞে, আপনাদের কৃপা ভিন্ন ত হইবার উপায় নাই," "আজ্ঞে, অমুক মহাপুরুষ আমাকে কৃপা করেন," "অমুক বাবার কৃপা যখন একবার পাইয়াছি, তখন একদিন না একদিন পার হইবই হইব," ইত্যাদি মনকে চোখ ঠারার মত কতকগুলি বাক্য আওড়াইয়া পুনরায় বিষয়ভোগে বিষয়কর্ম্মে দ্বিগুণ অভিনিবেশে মন দেন; আমার মনে হয় তাঁহারা যেন ভাবেন, "মহাপুরুষ যখন একবার কৃপা করিয়াছেন তখন ত একদিন টানিয়া লইয়াই যাইবেন, মহাপুরুষের কৃপায় টান দিলে আর ত স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার আহার বিহার যশ অর্থ এসব থাকিবে না, আঃ এখন একবার প্রাণ ভরিয়া তাহার পূর্ব্বেই স্ত্রী পুত্রদিগকে ভালবাসিয়া লই, বিষয়বার্ত্তা বিষয়কর্ম্মাদি একটু ভাল করিয়া করিয়া লই।" এই ভাবেই তাঁহারা মহাপুরুষের কৃপাকে সার্থক করিতে চান। যাঁহারা এই প্রকার কৃপার দোহাই দিয়া বিষয়াবেশেই নিরন্তর আবিষ্ট থাকেন তাঁহাদের কথিত মহাপুরুষের কৃপা আমার বুঝা দুষ্কর।

হাঁ, তবে কোথাও কোথাও মহাপুরুষের সত্য কৃপা পতিত হইয়া ঐ

কৃপারই কোন অনির্ব্বচনীয় স্বীয় মহিমা প্রকাশের জন্যই সাধন ভজনে শিথিলতা আনয়ন করেন যাহার ফলে ঐ কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরন্তর এক মহাপুরুষের কৃপাতেই "হা কৃপা, হা কৃপা" করিয়া তন্ময় হইয়া থাকেন। ইহার রহস্য প্রকারান্তরে "বৈষ্ণবমতে প্রারব্ধখণ্ডন" প্রবন্ধে বলা হইবে। তাদৃশ কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকতর দৈন্য উচ্ছলিত করিয়া ঐ কৃপাই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তিরসসুধাধারায় অভিষিক্ত করিয়া রাখেন, অত্যুৎকট নারকীয় গন্ধপূর্ণ বিষয়গর্ত্তে তাঁহাকে পতিত করিয়া রাখেন না।

সৎ মহাপুরুষের নিকট হইতে কোন প্রকারে দীক্ষাদি গ্রহণ বা তাঁহাদিগের বাহিরের স্নেহাভাস আকর্ষণ করিলেই যে পরতত্ত্বোন্মুখকারিণী কৃপাই পাইলাম এই প্রকার মনে করা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি। আমার বিবেচনায় পূর্ব্বকথিত প্রবল অপরাধময় চেষ্টাগুলিকে ভিতরে ভিতরে পোষণ করিয়া লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদির লালসায় ঐ প্রকার দীক্ষাদি যাহা গ্রহণ করা যায় বা তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ বাহিরের স্নেহ যাহা আকর্ষণ করা যায়, তাহা বস্তুতঃ মহপুরুষের তাদৃশী কৃপা নহে।

প্রশ্ন—বলেন কি ? নিরপেক্ষ মহাপুরুষগণ দীক্ষাদি দান করিয়াও প্রকৃত কৃপা করেন না বা স্নেহের ব্যবহার করিয়াও সেটা বাহিরের স্নেহাভাস মাত্র দেখান এই প্রকার বঞ্চনা স্বভাব কি তাঁহাদের সম্ভব হয় ?

উত্তর—আপনার বুদ্ধিতে বঞ্চনা হইলেও তাঁহারা ঠিক বঞ্চনাবুদ্ধিতে ঐ প্রকার করেন না। উহা প্রকৃত বঞ্চনা নহে, আর খুব একটা বেশী কৃপাও নহে, সাময়িক একটি সাধারণ কার্য্য।

প্রশ্ন—তাহা হইলে তাঁহারা দীক্ষাদি দান করেন কেন ?

উত্তর—বলিয়াছি ত উহা সাময়িক আনুষঙ্গিক কার্য্য। বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝেন নাই, শুনুন। মনে করুন, আপনার বাটিতে কোন বিবাহাদি উৎসব কার্য্য আরম্ভ করিলেন, আপনার সেই বিবাহ কার্য্যের সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য আপনার যোগ্যতানুসারে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া যত্ন সহকারে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়াদি নানাপ্রকার ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, কিন্তু উৎসবের গৃহস্থানে অনাহূত অনিমন্ত্রিত ভাবেও অনেক লোক আইসে, আপনার উৎসবের সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য তাহাদিগকেও

কিছু কিছু ভোজন করাইতে হয়, তাহারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়াদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় কি? এমন কি অনেক কুক্কুর কাকাদিও উচ্ছিষ্টগর্ত্তের যথাসম্ভব উচ্ছিষ্টাদি কিছু কিছু পাইয়া থাকে, ইহারা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে যাহা পায় তাহাতে যদি তাহারা নিজেরাই মনে করে যে "আমরা পরিতৃপ্ত", তাহা মনে করুক; দাতা আপনি কি তাহাদের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছেন? কখনই নহে। ঠিক এই প্রকার অন্তরে অন্তরে তাদৃশ অপরাধময় চেষ্টাদি পোষণ পূর্ব্বক যাঁহারা সাধু মহাত্মাদিগের নিকট হইতে লৌকিক দীক্ষাদি যৎকিঞ্চিৎ কৃপাভাসের ন্যায় প্রাপ্ত হন তাঁহারা মনে করুন, "আমরা খুব পাইয়াছি," বস্তুতঃ কিন্তু মহাপুরুষদিগের ভগবত্তত্ত্বোন্মুখকারিণী কৃপা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করেন নাই, ইহা নিশ্চয়ই। কোথাও কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যোৎসবে মহাপুরুষ তাঁহাকেই ভাগ্যের ফল কৃপা করিতেছেন, কৃপাদীক্ষা উপদেশাদি দান করিতেছেন, আর সব অধিকাংশই অনিমন্ত্রিত লোকের ন্যায়, এমন কি কাক কুক্কুরাদির ন্যায়ও, ঐ প্রকার দীক্ষাদিতে বঞ্চিত হয় না, কিন্তু **কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষাদি খুব দুর্ল্লভ**। সৎ মহাপুরুষের প্রকৃত কৃপা সামান্যা নহে, যে কৃপা লাভ করিলে ভগবৎকৃপার নিমিত্ত আর চিন্তা থাকে না। এই কৃপা লাভ করিতে হইলে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া **চিত্তের সেবোন্মুখী বৃত্তি লইয়াই কৃপার ভিখারী হইতে হয়।**

সাধুগুরুসেবায় সাবধানতা

সাধুগুরুসেবায় শ্রীভগবৎপ্রসন্নতালাভ যত শীঘ্র হয় এমন আর অন্য কোন সাধনে হয় না, কিন্তু এই সেবাকার্য্যে পবিত্রতা রক্ষা করা চাই। মনে করুন আপনি কোন সাধুমহাপুরুষের সেবা করিবেন, তাঁহাকে ব্যজন বা তাঁহার পাদসংবাহনাদি করিবেন, কিন্তু আপনার শরীর যদি মলমূত্রাদি দ্বারা অপবিত্র হয় এবং দুর্গন্ধময় হয় তাহা হইলে সেই সেবায় সাধুব্যক্তির সন্তোষ উৎপন্ন হইবে কি? আবার আপনি বাহ্য শৌচ দ্বারা সাধুগুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সেবা করিতে করিতে আন্তরিক দুষ্টমনোবৃত্তির দুর্গন্ধ যদি ছড়াইতে থাকেন তাহা হইলেও তাদৃশ বাহ্যিক সেবায় সৎ মহাপুরুষ সন্তোষ লাভ করিতে

পারেন না। আপনি যদি কোন সাধুমহাপুরুষের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সেবা করিতে করিতে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সৎ সন্তোষকর ভগবদালোচনা ভিন্ন সংসারিক বাজে কথায় আকৃষ্ট হন তাহা হইলে বস্তুতঃ সাধুব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হইবে না, আপনার প্রকৃত সেবার ফলও লাভ হইবে না। তাদৃশ অপবিত্র মনোবৃত্তি লইয়া যে সেবা করা যায় তাহা আশু ফলপ্রসূ হয় না, বরং যাঁহারা জ্ঞান সামর্থ্য সত্বেও ভক্ত সাজিয়া সাধুমহাপুরুষের সেবায় নিযুক্ত হন, অথচ অন্যাভিনিবেশে ইতর চর্চ্চার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের প্রকারান্তরে মহদবজ্ঞারূপ মহা অপরাধই সঞ্চিত হইতে থাকে। মহৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া মহৎ ব্যক্তির সম্মুখে ঐ প্রকার নানাবিধ ইতর চর্চ্চার, ইতর ব্যবহারের বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্রমশঃ মহন্মর্য্যাদা জ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ক্রমশঃ নানাপ্রকার অঙ্গচালন, অঙ্গভঙ্গি, উদ্দাম হাস্য, যথেচ্ছ বাগ্‌বাচালতা প্রভৃতি উদ্দাম কায়িক বাচিক মানসিক ইতর বৃত্তিগুলি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে স্বীয় অসংযমতাই প্রকটন করিতে থাকে, যাহাকে অন্যভাষায় "বেয়াদবী" বলে। সাধু মহাপুরুষদিগের নিকট তাদৃশ ব্যবহার মহদবজ্ঞারূপ গুরুতর অপরাধই।

অনেকে সাধুমহাপুরুষদর্শনে বা তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত সদালাপ শ্রবণ উপলক্ষে যান বটে, কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু প্রায়শঃ আগত রমণীবৃন্দের সৌন্দর্য্যানুসন্ধানেই নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকে, সেই সৎ মহাপুরুষের সাক্ষাতেই বিলজ্জ হইয়া অথবা নিজের বাহ্যিক ভদ্রতা রক্ষা করিবার জন্য তত্রত্য সাধু-সজ্জনদিগের দৃষ্টিপথ এড়াইয়া গোপনে চঞ্চলচক্ষুর অঞ্চলে তাদৃশ রূপসুধাপানে ব্যস্তই থাকেন ; এই প্রকার কদর্য্য মনোবৃত্তি পরিচালনা করিয়া যাঁহারা সাধু-মহাপুরুষের নিকট সৎকথাশ্রবণ সাধুদর্শন ভানে অবস্থান করেন, বুঝুন তাঁহারা সৎ মহাপুরুষের অবমাননা কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইয়া থাকেন। হায় দুর্ভাগ্য, তীর্থাদি স্থলে শ্রীদেবমন্দিরাদি স্থানেও তাদৃশ ব্যক্তিদিগের ঐরূপ কদর্য্য মনোবৃত্তির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়। সুতরাং সৎ মহাপুরুষের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাকার্য্যে অবহিত হওয়া চাই। বাহ্যান্তর পবিত্র রাখিয়া সাধুগুরু সেবা করিতে পারিলে অতি অচিরে পরম কৃতকৃতার্থ হইতে পারা যায়। **সৎ মহাপুরুষের সঙ্গ করায় বা সেবাদি করায় সাবধান থাকা চাই।***

---

* শ্রীপাদ গ্রন্থকার কৃত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থে "গুরুসেবা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—একটু সন্দেহ আছে। সৎ মহাপুরুষের সঙ্গ বা কৃপা—ইহাকে আপনি জীবনযোনিসংস্কারের ন্যায় বলিয়াছেন। সংস্কার পদার্থটি ত কোন কর্ম্মজনিতই হয়? এমন কি কর্ম্ম আছে যাহা করিলে সৎসঙ্গরূপ সংস্কার লাভ হয়?

উত্তর—না, ইহা নহে। জীবনযোনিসংস্কারটি দৃষ্টান্ত স্থানীয় মাত্র। **সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা—ইহাই পরম সংস্কার।** এই সংস্কারের মূলে আর অন্য কোন সংস্কার নাই। আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করুন, সৎ মহাপুরুষের স্বেচ্ছা-চারিতাই একমাত্র ইহার কারণ।

প্রশ্ন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন কি প্রকারে সৎসঙ্গ করিলে আমরা সৎ মহাপুরুষের প্রকৃত কৃপার পাত্র হইতে পারি।

উত্তর—দেখুন, যাঁহারা প্রকৃত আত্মার মঙ্গলকামী তাঁহাদের সতত লক্ষ রাখা উচিত যাহাতে নিজের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি সতত একটা স্নিগ্ধ মধুর ধারায় প্লাবিত হয়, ইহার মূল কারণ **বিনয় প্রশ্রয়াবনত ভাব অবলম্বন করা।** এই মধুর স্বভাবটির প্রতি সতত লক্ষ রাখিয়া যাহাতে উঠায় বসায় ভাষণে ব্যবহারে কোন প্রকারে মহতের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ না পায় তাহার প্রতি অবহিত হওয়া উচিত। ইহাই হইল মহৎ কৃপা ধারণে অন্তঃকরণের প্রাথমিক যোগ্যতা। দুঃখের বিষয় অনেকেই সৎ মহাপুরুষের নিকটে যান, কিন্তু তাঁহাদের প্রাথমিক উঠা বসা ভাষণাদি ব্যবহারে এমন ঔদ্ধত্য অভদ্রতা প্রকাশ পায় যাহা তাঁহাদের সৎকৃপালাভের অন্তরায়। সৎসঙ্গ সৎকৃপা লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হওয়া চাই। আমা অপেক্ষা সৎ মহাপুরুষ সর্ব্বতোভাবে উচ্চে আছেন এই বোধটুকু থাকা চাই, ইহা সাময়িক মৌখিক উক্তি নয়, তাঁহাদের নিকট বসা উঠা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যাপারে 'আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরুজন' এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইলে কৃপা পাওয়া যায়। **সদনুবর্ত্তী হইয়া সৎ মহাপুরুষের সেবা এবং তাঁহাদের সঙ্গলাভ করা চাই।**

সাধুমহাপুরুষের পরিচয়

প্রশ্ন—সাধুমহাপুরুষ চিনিব কি প্রকারে ?

উত্তর—ঐ ত আপনাদের এক বুলি। এই বুলি প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রবণ করা যায়। দুঃখের বিষয় আপনারা চাকুরীস্থলে সাহেব মুনিব, তাহার মেজাজ, তাহার চোখের কট্‌মট্‌ চাহনি ইহা ভাল করিয়াই বুঝেন, জমিদারের কর্ম্মস্থলে জমিদারের রুক্ষ কর্কশ বা স্নিগ্ধ ব্যবহার বুঝেন, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন ভৃত্যাদির মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম সহজেই বুঝেন, কিন্তু সাধু চিনিবার সময় মৌখিক জিজ্ঞাসা করেন, চিনিবার চেষ্টাও করেন না। সাহেব, জমিদার প্রভৃতি চিনার কারণ নিজ স্বার্থসংসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের সঙ্গ ; এই প্রকার পরমার্থ স্বার্থসংসিদ্ধি প্রবণ চিত্ত লইয়া সাধুবেশধারীদিগের সঙ্গ করিলেই ক্রমশঃ সাধু চিনা যায়। **যাঁহারা ভগবদ্‌বার্ত্তা বহন করিয়া আমাদের মধ্যে আগমন করেন তাঁহারাই সাধুমহাপুরুষ। যাঁহারা অস্মদ্দৃশ মায়াশৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়গর্ত্তে নিপতিত জীবের প্রতি অনুকম্পী হইয়া ভগবৎকথামৃতধারায় সুশীতল করিয়া ভগবত্তত্ত্বোপদেশে মায়ার শৃঙ্খলকে শিথিল করিয়া ভগবদ্ভক্তিরজ্জুর সাহায্য দান করিয়া উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া উঠেন সেই নির্হেতু পরম কৃপাবান্ ব্যক্তিরাই প্রকৃত সাধুমহাপুরুষ।**

প্রশ্ন—অনেক সময় ত আমরা সাধুবেশধারী অনেক বঞ্চকের বঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হইতে পারি ?

উত্তর—অনেক সময় নহে, তবে ক্বচিৎ কোন সময়ে সামান্য কিঞ্চিৎ বঞ্চিত হওয়ার সম্ভব বটে। আমাদের এই ন্যাড়ামাথা, ভিখ্‌মাগা, গাছতলায় পড়িয়া থাকা দু এক জন সাধু সন্ন্যাসীর বেলায় অত সাধবান কেন ? ইঁহারা কত আপনাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন ? আপনি জীবনে যত সঙ্গ করিয়াছেন এবং যাহাদিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের নিকট হইতে আপনি কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন এবং কি পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহার হিসাব কোনও দিন করিয়াছেন ? হিসাব করিলে দেখিতেন জীবনটি প্রায়

বঞ্চনায় বঞ্চনায় অতিবাহিত হইয়াছে। হায়, যাহাদের নিকট সতত বঞ্চিত হইতেছেন তাহাদের বেলায় একটুও সাবধান হন না, সাধু মহাত্মার বেলায়ও এক আধ জায়গায় একটু বঞ্চিত হউন না কেন? সাধু মহাত্মাদিগের নিকটে বঞ্চিত হওয়াও একটি পরম লাভ। সাধুমার্গে অনির্ব্বচনায় একটি ভাবধারা আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের সহায়ক। যদি দৈবাৎ কোনও সাধুর ভ্রমপ্রমাদ বা অন্য কোনও স্বভাব বশতঃ সাধূচিত কার্য্যের ত্রুটি হেতু কোনও ব্যক্তি বঞ্চিত হন তখন সাধুভাবধারার উপরই আঘাত পড়ে। ঐ ভাবধারায় গ্রথিত অন্যান্য সাধুমাত্রই তাহা শ্রবণমাত্রই কম্পিত হন; তখন তাঁহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইয়া উঠে। তাঁহারা ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির ক্ষতিকে শতদানে পূর্ণ করিয়া তুলেন। সাধু কাহাকে বলে? **ভূতানুকম্পী জনই সাধু, পরোপকারিত্বই সাধুতা।** যদি কোন সদ্‌বেশধারী বঞ্চকের বঞ্চনায় কেহ দৈবাৎ বঞ্চিত হন তাহা হইলে অন্যান্য পরমোপকারী সাধুমহাপুরুষদিগের দ্বারা শত সহস্র প্রকারে অধিকতর উপকৃত হইতে পারেন, ইহাই সাধুদিগের ভাবধারা। কিন্তু হায়, সংসারে আমরা নিরন্তর বঞ্চিত হইতেছি, কিন্তু কোথাও কাহারও নিকট কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও পাইতেছি না, প্রকৃত ক্ষতিপূরণ ত আমাদের দূরের কথা। সুতরাং সাধুমহাত্মার নিকটে বঞ্চিত হওয়াও শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন—আপনি 'সদনুবর্ত্তী' একটি কথা বলিয়াছেন, সেটি কি প্রকার?

উত্তর—মৎকৃত 'কৃপাকুসুমাঞ্জলি'র মধ্যে 'সদনুবর্ত্তী' বিষয়ে কিছু বলিয়াছি, তবুও এখানে সামান্য কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সতের অনুবর্ত্তী অর্থাৎ অনুগত হওয়া। এই আনুগত্যটি 'অমায়য়া' অর্থাৎ নিষ্কপটে হওয়া চাই। বিত্তশাঠ্য, জ্ঞানশাঠ্য, শক্তিশাঠ্য, কর্ম্মশাঠ্য এই সকল পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সদনুবর্ত্তী হইয়া সৎকৃপার ভিখারী হইলে তাঁহাদের প্রকৃত কৃপা পাওয়া যায়। যেমন মনে করুন, শরীরের দ্বারা আপনি কোনও সৎ পুরুষের সেবা করেন, স্তব স্তুতি দ্বারা সৎ মহিমাদি কীর্ত্তন করেন, কিন্তু আপনার কৃপণতা স্বভাবে অর্থাদি দ্বারায় আনুকূল্যে বা গুরুতর ভোগবিলাসের দ্রব্যত্যাগে আপনি কুণ্ঠিত, ইহা নিষ্কপট সেবা হইল না। সৎ মহাপুরুষের সম্মানন,

অভিবাদন, যথাযোগ্য কায়িক বাচিক মানসিক সেবন এবং তাঁহাদের সন্তোষকর আনুকূল্যাচরণ করাই **সদনুবর্ত্তিতা**।

প্রশ্ন—সাধুমহাপুরুষদিগের অর্থের ত কোনও প্রয়োজন নাই, তবে বিত্তশাঠ্য কি প্রকারে সম্ভব ?

উত্তর—টাকা কড়ি অর্থের বেলায় ও কথা বলিতেছেন কেন ? বলুন না কেন সাধুমহাপুরুষদিগের কোনও কিছুরই প্রয়োজন নাই ? যেমন তাঁহাদের পদসংবাহন করা, ব্যজন করা, তাঁহাদের স্তবস্তুতিমহিমাদি গান করা ইত্যাদি আপনার নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি শোধন করা, সেটি আপনারই প্রয়োজন, তেমনই নানাপ্রকার শঠতা বঞ্চনা ছলনা পরপীড়ন পূর্ব্বক উপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করা আপনারই প্রয়োজন, সাধুর কোনও প্রয়োজন নাই, ইহা সত্য। এই প্রকার স্বার্থময় চাতুর্য্যপূর্ণ মনোবৃত্তিতে সাধুমহাপুরুষদিগের প্রতি বিচার বুদ্ধি প্রকটন করিতে যাইলে আর সদনুবর্ত্তিতা থাকে না। প্রত্যুত উহাকে অসদনুবর্ত্তিতাই বলা যায়। মোট কথা সৎ মহাপুরুষদিগের নিকট নিষ্কপটভাবে কায়িক বাচিক মানসিক সদ্‌ভাবে অবস্থান করাই **সদনুবর্ত্তিতা**। এই সদনুবর্ত্তিতা মনে পোষণ করিয়া **সাধুবর্ত্মের অনুবর্ত্তন** করিতে এবং সৎ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনকে কৃতকৃতার্থ করিবার বাসনায় যাঁহারা সৎ মহাপুরুষের শ্রীচরণোপান্তে অবস্থান করেন তাঁহারাই সাধুমহাপুরুষদিগের পরম কৃপালাভে চরম কৃতার্থ হইতে পারেন। সর্ব্বশেষে ইহাই আমার বক্তব্য যে যাঁহারা শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তির মাধুর্য্য ধারায় দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাত্মাকে স্নিগ্ধ করাইতে চান তাঁহারা যেন **ভগবদ্ভক্ত সাধুমহাপুরুষের কৃপাই পরম সম্বল** মনে করেন।

মালাধারণ

প্রশ্ন—অদ্য মালাধারণ সম্বন্ধে কিছু বলুন ; মালাধারণের প্রয়োজন কি ?

উত্তর—মালাধারণ সম্বন্ধে আর বেশী কি বলিব ? বিষ্ণুপ্রিয় দ্রব্য তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ বৈষ্ণবের নিত্য বিধি। বৈষ্ণবের বলি কেন, যাঁহারা হিন্দু আর্য্য বলিয়া অভিমান করেন তাঁহাদের জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তুলসী মালা ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। মনে করুন, আমরা হিন্দু, যদি কোন সময়ে নিজ দেহাদিকে অপবিত্র বোধ করি, তাহা হইলে গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছি বলিয়া নিজকে মনে করি। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার মহিমা যেমন হিন্দু মাত্রেরই নিকট অসাধারণ তেমনই বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর মহিমাও হিন্দু মাত্রের নিকট অসাধারণ। যে দেশে গঙ্গা জল পাওয়া যায় না সেখানে তুলসীর পত্র বা কাষ্ঠ বা পুষ্প মিশ্রিত জল গঙ্গা জলের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা শুধু লোক ব্যবহার মাত্র নহে, শাস্ত্রেও তুলসী মিশ্রিত জলকে গঙ্গা তুল্য বলা হইয়াছে—**তুলসীদলমিশ্রিতং তোয়ং গঙ্গাসমং বিদুঃ।**

হিন্দু মাত্রেই মনে করে গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিলে বা মৃত ব্যক্তির অস্থি আদি গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে ঐ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে বা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা যেমন শাক্ত শৈব সৌর বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে হিন্দু মাত্রের জন্যই শাস্ত্রের নিদেশ, ঠিক এই প্রকার তুলসীপত্র বা তুলসীকাষ্ঠাদি সংস্পৃষ্ট হইলে মৃত ব্যক্তি মুক্তি বা সদ্গতি লাভ করে, ইহাও তেমনই শাস্ত্রেরই নিদেশ। আবহমান কাল হইতে হিন্দু আর্য্য সন্তানগণ এই শাস্ত্রের মহামহিম আদেশের উপর প্রবল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই

আসিতেছে এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু আর্য্য সন্তানগণ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তুলসী তলায় আনয়ন করে, এমন কি অন্যত্র ত্যক্তপ্রাণ মৃতদেহও তুলসী তলায় আনয়ন করিয়া বা তুলসী পত্রাদি সংস্পর্শ করাইয়া উক্ত শাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রতিপালন করিয়া থাকে। এখন ভাবুন, মনুষ্য মাত্রেরই ভাবা উচিত কি না যে "কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ", কোথায় গঙ্গাশূন্য দেশে, কোথায় অতীর্থ স্থানে, কোথায় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবরহিত নির্জ্জন প্রান্তরে, কোথায় বা বনাদি মধ্যে সর্পব্যাঘ্রাদি দংশনে বা হঠাৎ বজ্রপাতাদিতে অথবা আকস্মিক উচ্চ হইতে পতনাদি ক্রমে কোথায় কি ভাবে মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হয় ইহার নিশ্চয়তা সাধারণ মনুষ্যের আছে কি? এইরূপ নিঃসহায় নিরুপায় অবস্থায় সদ্‌গতির উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত মুমূর্ষুকৃত্যের অভাবে মনুষ্যের সদ্‌গতির উপায় কি? হায়, কে তাহাকে 'বৈতরণী' করাইবে, কে গোদানাদি পুণ্যকর্ম্ম করাইবে, কে 'রাম নারায়ণ গঙ্গা ব্রহ্ম' শুনাইবে? এরূপ ক্ষেত্রে মনে হয় স্পর্শ মাত্রে সর্ব্বপাপতাপহারিণী জীবমাত্রসদ্‌গতিদায়িনী শাস্ত্রশতোদ্ঘোষিত মহামহিমগুণা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর সংস্পর্শ যদি শরীরে থাকে তাহা হইলে তাহার সদ্‌গতি লাভ অবশ্যম্ভাবী। জীবমাত্রেরই সদ্‌গতি-দানে অন্য সর্ব্বনিরপেক্ষ গতিদায়িনী পতিতপাবনী ভাগীরথীর তুল্যা এক মাত্র তুলসী, কেননা উভয়ই মুক্তিদাতা মুকুন্দের মুক্তিদায়িনী মহীয়সী শক্তিই মূর্ত্তিমতী। এইটুকু জানিলেই বুঝা যায় মনুষ্য মাত্রেরই তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূত মালা ধারণ করা নিত্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় কতকগুলি বৃক্ষ অচিন্ত্য দৈবশক্তি সম্পন্ন দেব বৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অনাদি কাল হইতেই জীব প্রতি পরম করুণ শ্রীভগবানেরই বিধান। এই বৃক্ষসমূহের গুণ মহিমা সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের অগোচর। বিল্ব, রুদ্রাক্ষ, আমলকী, অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষ আকারে থাকিলেও ইহারা সামান্য বৃক্ষ নহে, বৃক্ষরূপে দেবতাই। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষে বিশেষ বিশেষ দেবতার অধিষ্ঠান হয়। তাৎপর্য্য এই যে অতি পবিত্র বহুপরোপকারী নানাবিধ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ অচিন্ত্য দৈবশক্তি সম্পন্ন দ্রব্যাদিতে দেবতার আবির্ভাব

হয়। দেবতাসকলও অতি পবিত্র বহুপরোপকারী, নানাবিধ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট। সমান্ সমান গুণ বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে পরস্পরের একটি অনির্ব্বচনীয় সন্নিকর্ষ ভাব থাকে। ইহ জগতে কোন দয়ালু পরোপকারী ব্যক্তির প্রীতিময় সম্মিলন তৎ সদৃশ পরোপকারী অন্য কোনও দয়ালু ব্যক্তির সহিতই হয়, বিসদৃশ কোনও নির্দ্দয় পরাপকারী ব্যক্তির সহিত প্রীতিময় সম্মিলন হয় না, * এবং সেই সমগুণ বিশিষ্টে বিশিষ্টে যে মিলন তাহা পরস্পরের গুণশ্রীর বর্দ্ধকই হয়, অর্থাৎ একজন দয়ালু পরোপকারী ব্যক্তির সহিত আর একজন দয়ালু পরোপকারী ব্যক্তির তাদৃশ প্রীতিময় সম্মিলনটি পরস্পরের দয়ালুতা পরোপকারিতা গুণের পরিপোষক হইয়া পরস্পরের গুণশ্রী বর্দ্ধনই করে; এই প্রকার মিলনে পরস্পরের মধ্যে এমন একটি আদান প্রদান হয় যাহার ফলে উভয়েই উভয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই জাগতিক দ্রব্যাদির মধ্যে যে জাতীয় পবিত্রতা পরোপকারিতাদি সদ্‌গুণ বিশিষ্ট যে যে দ্রব্য আছে সেই সেই দ্রব্যের সহিত সেই সেই জাতীয় পবিত্রতা পরোপকারিতাদি গুণ বিশিষ্ট দেবতাদিগেরও একটি প্রীতিসম্মিলন আছে এবং এই প্রীতিসম্মিলনটি পরস্পরকে পরিপোষণ করিয়া থাকে, ইহা শ্রীভগবানের সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, ঐ তেজই আবার চক্ষুতে আছে, সূর্য্যের কিরণের সাহায্যেই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি, সূর্য্য কিরণের অভাব অন্ধকারাদি স্থলে চক্ষু থাকিলেও দেখা যায় না; আবার বস্তুতে যে রূপ দর্শন হয় সেই রূপটিও তেজোঘটিত গুণ বিশেষ; আলোকের সাহায্যে চক্ষুর দ্বারাই রূপদর্শন হয়; ইহাই বিশ্বের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সৃষ্টির রহস্য। ইহা যেমন অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠান এবং বিষয় এই তিনেতেই একজাতীয় শক্তির পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের পরিপুষ্টি ঐ প্রকার ঐশী নিয়মে জাগতিক সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যাদির সহিত দেবতাদিগের যে মিলন তাহা পরস্পরের পরিপোষকই হয়। এই অভিপ্রায়ে জাগতিক কোন কোন বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদির দ্বারা কোন কোন বিশেষ বিশেষ দেবতার

* ইহা ভগবানের এক প্রকার জগতের স্থিতিশক্তির কার্য্যকারিতা।

অর্চ্চনার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়। যেমন বিল্বদলে শিবাদ্যর্চ্চনা বিশেষ ব্যবস্থা, তুলসী দলে বিষ্ণুর অর্চ্চনা বিশেষ ব্যবস্থা। এই প্রকার যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অমুক দ্রব্যে অমুক যাগ ইত্যাদির রহস্যও বুঝিতে হইবে। এই প্রকার দ্রব্যগুণ ও দেবগুণের সন্নিকর্ষ রহস্য ঋষিদিগের অভ্রান্ত আর্ষ দৃষ্টির গোচর মাত্র, অস্মদাদির স্থূল জ্ঞানের গোচর নহে। এইরূপ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি জলের এবং তীর্থাদি স্থলের সহিতেও তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবতার অধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতৃ ভাব আছে। যে দ্রব্য যে দেবতার বা দেবশক্তির প্রীতিসম্মিলনময় বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান সেই দ্রব্যে সেই দেবতার বা সেই শক্তির একটি নিত্য আকৃষ্টতা থাকে। এই দৈবী আকৃষ্টতার অচিন্ত স্বভাবই এই যে ঐ দেবতা শক্তি নিজেই অধিষ্ঠানরূপিনী, আর ঐ অধিষ্ঠানরূপী দ্রব্যাদি অধিষ্ঠাতা দেবরূপী, যেমন গঙ্গার অধিষ্ঠান ঐ গঙ্গাই জলরূপিনী, আবার অধিষ্ঠান গঙ্গা জলেরই অধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা মকরবাহিনী গঙ্গামূর্ত্তি, ইহা অচিন্ত্য ঐশী শক্তির অপূর্ব্ব রহস্য। আমরাও দেখিতে পাই যে বস্তু যাহার প্রিয় তাহাতে তাহার আকৃষ্টতা স্বাভাবিক। বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী বৈষ্ণবী শক্তির অধিষ্ঠান, সুতরাং বিষ্ণু শক্তির নিত্য আবির্ভাব তাঁহাতে আছে। অধিষ্ঠাত্রী বৈষ্ণবী শক্তি নিজেই নিজের অধিষ্ঠান তুলসী বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব সকল বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তি তুলসীর দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। তুলসীর অর্চ্চন, তুলসীর পরিক্রমণ, তুলসী প্রণাম, তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালাদি ধারণ, তুলসীপত্র মঞ্জরী আদি ভক্ষণ, তুলসী কাষ্ঠের চন্দনাদি ধারণ, তুলসী মূল মৃত্তিকার তিলকাদি ধারণ প্রভৃতি আচরণ করিয়া তাঁহারা তুলসীপ্রিয় গোবিন্দেরই সেবা করেন। বলুন দেখি বৈষ্ণবের মত এমন পাকা শাক্ত কে? এই বৈষ্ণবী শক্তির অধিষ্ঠানরূপিণী তুলসীর পরিচর্য্যার ফলে মনুষ্য অনায়াসে অতি অচিরেই বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হইতে পারে। শাস্ত্রে তুলসীর মহিমা বলিতেছেন, শ্রবণ করুন—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী।
রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।

প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা।
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

যাঁহাকে দর্শন করিলে নিখিল পাপসমূহ নাশ হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে বন্দনা করিলে রোগ সমূহের নিরসন হয়, যাঁহাকে সিঞ্চন করিলে মরণ ভয় দূরে যায়, যিনি সংরোপিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য বিধান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ন্যস্ত হইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করেন সেই তুলসী দেবীকে নমস্কার।

এই তুলসীসেবা নববিধ, যথা—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥

তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, তুলসীর নাম কীর্ত্তন, প্রণাম, তুলসীর মহিমাদি শ্রবণ, তুলসীবৃক্ষরোপণ, জল সেচন স্থান মার্জ্জনাদি সেবন এবং পুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চন এই নববিধ তুলসীসেবা পরম মঙ্গলদায়িনী।

সাধারণ মনুষ্যের মালাধারণ হইতে বৈষ্ণবের মালাধারণের পার্থক্য আছে। মনুষ্য যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে সদ্‌গুরুর চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়া শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে তখন সেই ভাগবতী দীক্ষার অঙ্গভূতরূপে তুলসীর মালা ধারণ করিতে হয়। এই মালাধারণ কেবল মালা ক্রয় করিয়া নিজে যথেষ্ট গলায় ধারণ করা নহে। শ্রীগুরুদেব ঈশানাদি পাঁচটী বৈদিক মন্ত্র দ্বারা মালাকে শোধন এবং সংস্কার করিবেন এবং মালার উপরে বৈষ্ণবী শক্তির নিত্যাবির্ভাব ধ্যান করিয়া পুষ্প চন্দনাদির দ্বারা মালাকে পূজা করিবেন, পরে যাহাকে ঐ মালা দেওয়া হইবে তাহার ভগবদ্‌ভজনে ভক্তিলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া মালা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন। তারপর দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু জনের কণ্ঠে ভগবৎ প্রসন্নতা মূর্ত্তিমতী মালা ধারণ করাইয়া দিবেন। তখনই মালা মালা নামের সার্থকতা ধারণ করে।

দানে লা ধাতু রুদ্দিষ্টো মাং লাসি হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্য স্তেন মালা নিগদ্যতে॥

'মালা'—ইহাতে দুইটি শব্দ আছে, 'লা' ধাতুর অর্থ দানে, 'মা' শব্দের

অর্থ সম্পত্তি, এই সম্পত্তি বলিতে জাগতিকী সম্পত্তি, মুক্তি সম্পত্তি, ভগবৎ প্রীতি সম্পত্তি, তাহা হইলে অর্থ হইল এই,—হে হরিবল্লভে তুলসি, তুমি সমস্ত ভক্তকে মা দান কর, অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ সম্পত্তি দান কর বলিয়া তুমি মালা নামে কথিত হইতেছ।

ইহাই হইল বৈষ্ণবের মালা ধারণের সার্থকতা। বিধি ব্যবস্থাপিত মালাধারণে অধিকতর ফল লাভ হয়। বিশেষতঃ স্বয়ং গুরু কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং শক্তি নিহিত হওয়ায় মহিমা যে অধিক হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

একদিন মদীয় ৺শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদ সমীপে প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—স্বতঃ মহাপূতা নিত্যাবির্ভূতবৈষ্ণবীশক্তি তুলসী, তাঁহাতে আবার শোধন এবং সংস্কারাদি করা হয় কেন? অশুদ্ধ দ্রব্যাদির শোধন, সমল দ্রব্যাদির মলাপকরণ রূপ সংস্কারাদি সম্ভব হয়। যাঁহার স্পর্শে যাবতীয় বস্তু শুদ্ধ হয় তাঁহার আবার শোধন সংস্কার কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন আদেশ করিয়াছিলেন যে মালাতে শোধন সংস্কার যাহা করা হয় তাহা শুধু অশুদ্ধতা নিবারণের জন্য নহে, বিশেষ বিশেষ গুণাধিক্যের জন্য। সাধকব্যক্তির দূরদৃষ্ট নিবন্ধন নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া সাধনার অন্তরায় ঘটায়। তাহার প্রতিকারার্থে তুলসী মালিকা অধিষ্ঠানে স্বতঃস্থিতা বৈষ্ণবী শক্তিকে সর্ব্বদা জাগ্রত করিয়া রাখাই মালার শোধন সংস্কারাদি ব্যাপারের অভিপ্রায়। এই শোধন সংস্কারাদির গুণে বৈষ্ণবী শক্তি তুলসী সর্ব্বদাই সাধকের হিতবিধায়িনীরূপে জাগ্রত থাকেন।

এখন বিচার করিলে দেখা যায় যে বৈষ্ণবী দীক্ষার অঙ্গীভূত তুলসী মালা ধারণে দীক্ষাটিকেই পূর্ণ করে। আবার দীক্ষাকালে যে মালা ধারণ করা হয় সেই ধৃত মালার উপরেও দীক্ষামন্ত্র শক্তির প্রভাব পতিত হওয়ায় মালা ধারণের সার্থকতা সম্পূর্ণই হয়। এখন বুঝুন, যাঁহারা দীক্ষাকালে সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষার অঙ্গীভূত তুলসীমালা ধারণ করিয়া পশ্চাৎ সেই মালা পরিত্যাগ করেন তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহাকে সামান্য ক্ষতি বলা চলে না, বরং একদিকে মহা অপরাধ বিশেষও বলা যাইতে পারে। কারণ প্রথমতঃ

এইরূপ মালাত্যাগ করাটা শ্রীগুর্ব্ববজ্ঞার প্রবল নিদর্শন, যেহেতু দীক্ষাকালে শ্রীগুরুদেব স্বয়ং পুষ্প চন্দনাদির দ্বারা সমর্চ্চন পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া যে মালাটিকে ভাগবতী ভক্তি শক্তিতে পূর্ণ করিয়া স্বীয় হস্তে আমার কণ্ঠদেশে পরিধাপন করিলেন, হায়, আমি কিন্তু তুচ্ছ জ্ঞানে অনায়াসে তাহা ছিঁড়িয়া অথবা খুলিয়া ফেলিলাম। ইহা সামান্য গুরু-অবজ্ঞা নহে। শ্রীগুরুদেব যেমন পরম যত্নে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র আমার কর্ণকুহরে অর্পণ করিলেন, তাদৃশ পরম যত্নে তুলসীমালাও কণ্ঠে অর্পণ করিলেন, হায়, নির্ব্বুদ্ধিক জন ইহা বুঝে না, মালা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গুরু প্রদত্ত দীক্ষাও যে ত্যাগ হইয়া যাইতেছে। হায়, গুরু প্রদত্ত বস্তুর প্রতি এত তুচ্ছতা জ্ঞান কি কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে? তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—যজ্ঞোপবীতবদ্ ধার্য্যা কণ্ঠে তুলসীমালিকা। ক্ষণমাত্র পরিত্যাগাৎ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥

বড়ই দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ স্মার্ত্ত পুরোহিতগণ জাতমৃতাশৌচাদিতে বৈষ্ণব যজমানকে মালা পরিত্যাগ করাইয়া নিজদিগের শাস্ত্রাভিজ্ঞতা প্রকটন করিতে খুব চেষ্টা করেন, কিন্তু শুনুন তুলসীর মহিমা—

অশৌচে চাপ্যনাচারে কালেঽকালে চ সর্ব্বদা।
তুলসীমালিকাং ধত্তে স যাতি পরমং পদম্॥

অর্থাৎ জনন মরণাদি অশৌচে এবং সময়ে অসময়ে অনাচারে অর্থাৎ মৈথুনাদি ব্যাপারেও সর্ব্বদা যিনি তুলসী মালিকা ধারণ করেন তিনি পরম পদকে লাভ করিয়া থাকেন।

তিলকধারণ

প্রশ্ন—এই যে তিলক চিহ্ন এবং কণ্ঠ্যমালাদি ধারণ, ইহা ত বাহিরের ভূষা মাত্র ? এই সকল বেশ চিহ্ন ধারণ না করিলে কি সাধন ভজন হয় না ?

উত্তর—সাধন ভজন রহস্য যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন এবং যাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা প্রতিপালনে তৎপর তাঁহাদের জ্ঞানে তিলক চিহ্ন মালাদি ধারণ বেশ মাত্র নহে, উহা সাধনের বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই তাঁহারা জানেন। এমন কতকগুলি সাধনের স্তর আছে যাহাতে তিলকাদি ধারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা আছে বলিয়াই শাস্ত্রে বিধি দেওয়া হইয়াছে। যাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা নাই শাস্ত্রে তাহার নিত্য বিধি দেওয়া হয় না। এই বিধি প্রতিপালন না করিলে সাধনের অঙ্গ হানি হয়। সাধনের অঙ্গহানির অর্থই এই যে যে সাধনের দ্বারা যে শক্তি সঞ্জাত হইয়া যে ফল প্রসব করে, অঙ্গহানি হইলে সেই শক্তি সঞ্জাত হয় না। সুতরাং ফলও তাদৃশ হয় না।

প্রশ্ন—তিলক মালায় এমন কি বিশেষ আছে যাহার অভাবে সাধনার অঙ্গহানি হইয়া ফলোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মাইবে ?

উত্তর—শ্রাদ্ধাদিতে যেমন কুশতণ্ডুলাদি দ্রব্যের অভাবে অঙ্গহানি হয়, যথাযথ দ্রব্যাদি মিলিত হইলে যেমন পূর্ণাঙ্গ হয় তেমনই সাধনাঙ্গে যাহার যে অঙ্গ তাহার হানি হইলে ফলোৎপাদনের ব্যাঘাত অবশ্যই হইবে।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবেরা ত তাঁহাদের সাধনকে শ্রাদ্ধাদির মত কর্ম্ম বলেন না, তাঁহারা ত কর্ম্ম হইতে পৃথক্ একটি ভক্তিসাধন বলেন। ভক্তিসাধনে বাহিরের বেশ চিহ্নাদির অভাব হইলে অঙ্গহানি হইবে কেন? আর

যদি অঙ্গহানির জন্য ভক্তিসাধনটি ফলদানে অসমর্থ হয় তাহা হইলে ভক্তিসাধনটি কর্ম্মের মতই হইয়া পড়ে।

উত্তর—বিশেষ বিশেষ ফল লাভের জন্য ভক্তি শাস্ত্রে যে সকল ভক্তিসাধন বিহিত হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য অঙ্গের হানি করিলে সেই সেই সাধনে সেই সেই বিশেষ ফল শীঘ্র লাভ করা যায় না। বহুকালে অঙ্গহীন ভক্তি-সাধনে তাদৃশ বিশেষ ফল লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে অঙ্গহীন কর্ম্ম একেবারে বিফলই হয়, ভক্তিসাধনে অঙ্গহীন ভক্তিসাধন তেমন বিফল হয় না, কিন্তু ফললাভে বিলম্ব ঘটে, ইহাই কর্ম্মের সহিত ভক্তিসাধনের ভেদ।

প্রকৃত সাধনরহস্যজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের তিলক ধারণের মহিমা শুনিলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন, এবং উহা যে মাত্র বাহিরের বেশ বা বৈষ্ণবদিগের চিহ্ন মাত্র এই প্রকার ধারণা নিশ্চয়ই চিরবিলুপ্ত হইবে। সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা এমন কি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে মনে করেন তিলক মালা বৈষ্ণবের চিহ্ন মাত্র। ইহার মধ্যে আবার কেহ কেহ বিজ্ঞ সাজিয়া অবোধ লোকদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে, "এই প্রকার সাধু বেশের একটা মহিমা আছে। যেমন হ্যাট্‌, কোট্‌, প্যাণ্ট্‌, কলার নেক্‌টাই ইত্যাদি বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিলে মনে একটা উষ্মা ভাব প্রকাশ পায় এবং বিলাসের দিকে মন অগ্রসর হয় তেমনই তিলক মালা নামাবলী বস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক কুশাসনাদিতে উপবিষ্ট হইলে মন সাত্ত্বিক ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব মনকে সাত্ত্বিক ভাবের দিকে অগ্রসর করাইতে এই তিলকমালাদি সাধুবেশের একটা উপযোগিতা আছে," ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল বিজ্ঞের বিজ্ঞতা তিলক মালা প্রভৃতিকে বেশ ভূষা চিহ্ন ইত্যাদির কবল হইতে উদ্ধারে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই সকল অজ্ঞ পরম্পরা সিদ্ধান্ত বাচালতা সাধনশাস্ত্রবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গ্রাহ্যই নহে।

প্রশ্ন—আমরা ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড় বড় পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যাতা অনেক গোস্বামী বাবাজী মহাশয়দিগের নিকট তিলক মালার মহিমা বারংবার ঐরূপই শ্রবণ করিয়া থাকি। ইহার বেশী কিছু রহস্য আছে তাহা ত শুনি নাই।

উত্তর—ভাগবত ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার প্রাকৃত গ্রাম্য গল্প, নাটকীয় হাবভাব প্রকটন ও গান বক্তৃতাদিতে পটুতা লাভ করিয়া পণ্ডিত হওয়া আর প্রকৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং শাস্ত্রবিহিত সাধন রহস্য অবগত হওয়া পরস্পর ভিন্ন বিষয়। ব্যবসায় উপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া অর্থ প্রতিষ্ঠার লালসায় গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইলেই যে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধনরহস্যজ্ঞ হওয়া যায় তাহা নহে।

প্রশ্ন—তিলক মালা সম্বন্ধে বৈষ্ণবশাস্ত্রে কি সাধন রহস্য আছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি ?

উত্তর—যে বৈদিক উপাসনার প্রভাবে ব্রাহ্মণসকল ব্রহ্মণ্য তেজঃ ধারণ করিয়া জগতে সর্ব্বপূজ্য হইয়াছেন সেই বৈদিক উপাসনার সার রহস্য বৈষ্ণবদিগের একমাত্র তিলক ধারণের মধ্যেই রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ইষ্টার্চ্চনের সর্ব্বপ্রাথমিক কার্য্যই এই তিলকধারণ। তাঁহারা প্রথমতঃ ব্রহ্মতেজঃ অঙ্গে ধারণ করিয়াই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ অর্চ্চনে অগ্রসর হয়েন। শাস্ত্রবিহিত তিলকধারণ রহস্য জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ভাবে ত্রিসন্ধ্যা একমাত্র তিলক ধারণ সাধনেই শূদ্রকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় ব্রহ্মতেজঃ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণের ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন

ব্রাহ্মণের বৈদিক উপাসনার মূল গায়ত্রীর উপাসনা। এই গায়ত্রী উপাসনা সম্বন্ধে "অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতির স্বারস্যলব্ধ অর্থকে গ্রহণ করিয়া পুরাণে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ" ইত্যাদি সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত তেজোময়বপুঃ নারায়ণের ধ্যান এবং তদধিষ্ঠান সূর্য্যের উপস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। এখন বিচার করিলে দেখা যায় এই উপাসনায় প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যাবতীয় তেজোনিদানতত্ত্বের ধ্যানধারণাই মুখ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যতপ্রকার পদার্থের মধ্যে তৈজসিক তত্ত্ব নিহিত আছে তত্তৎ তেজঃসমূহের মূলাশ্রয় একমাত্র মহাসৌরমণ্ডলই এবং এই সমস্ত স্থূল বিশ্বের জীবন শক্তির পরিপুষ্টির মূল সহায় এই মহা সৌরমণ্ডলই। এই সৌরমণ্ডলের সাহায্যে পৃথিবী অন্ন জল তেজঃ বায়ু প্রভৃতি ভূত ভৌতিক

পদার্থ সকল যাবতীয় প্রাণীর প্রাণকে পরিপোষণ করে। সমগ্র প্রাণের প্রাণন এই সূর্য্যমণ্ডলের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত রহস্য গায়ত্রী উপাসনায় মন্ত্রাদির মধ্যে নিহিত আছে। ব্রাহ্মণগণ সেই সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত অপ্রাকৃত তেজোনিদান শ্রীভগবান্ নারায়ণকে উপাসনা করেন। উক্ত ধ্যানের মধ্যে নারায়ণকে "হিরণ্ময়বপুঃ" বলায় প্রাকৃত কলুষ রহিত বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত তেজোময় বিগ্রহই বলা হইয়াছে। এখন দেখুন গায়ত্রীমন্ত্রে মহাসমষ্টিতেজোময় সূর্য্যাধিষ্ঠানে অপ্রাকৃততেজোময়বপুঃ নারায়ণের উপাসনা দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ পরম সত্য ব্রহ্মণ্যতেজেরই উপাসনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ যখন যথেচ্ছ আহার বিহারে প্রলুব্ধমনা হইয়া রজস্তমঃপ্রধান সাধনে অগ্রসর হইলেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মণ্য উপাসনাতেও শিথিলতা আসিতে থাকিল। ফলতঃ তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মণ্য-হারা হইয়া শুধু নামেতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদিগের তিলকধারণে সেই ব্রহ্মণ্যতেজেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। বরং ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশী গায়ত্রী উপাসনায় সামান্যতঃ ব্রহ্মণ্য তেজের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের তিলকধারণ সাধনায় ব্রহ্মণ্য তেজের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া অধিকতর মহিমাই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—তিলকধারণ সাধনে ব্রহ্মণ্যতেজের উপাসনা কি প্রকারে সাধিত হয় তাহা একটু বিস্তারভাবে বলুন।

উত্তর—শুনুন ; ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পুষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্ট বিষ্ণবঃ॥ একই আদিত্য এই দ্বাদশ রূপ ধারণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্য নামে কথিত হয়েন। একই সূর্য্যের গুণক্রিয়াভেদে দ্বাদশ অবস্থা হয়, তাই দ্বাদশ আদিত্য নাম। একই বস্তু বিশেষ বিশেষ গুণ ক্রিয়া ভেদে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে ; যেমন বেদান্তশাস্ত্রে একই অন্তঃকরণকে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ভেদে মনঃ চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে তদ্বৎ। পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ প্রকার গুণক্রিয়াবিশিষ্ট দ্বাদশ আদিত্যের এক এক আদিত্যাধিষ্ঠানে ভগবান্ নারায়ণের দ্বাদশ রূপের এক একটি রূপ অধিষ্ঠিত আছেন। ভগবানের এই দ্বাদশ রূপ যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন,

ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। এই দ্বাদশ নারায়ণ আবার দ্বাদশ নারায়ণী শক্তি সমন্বিত, যথা—কেশবের শক্তি কীর্ত্তি, নারায়ণের শক্তি কান্তি, মাধবের তুষ্টি, গোবিন্দের পুষ্টি, বিষ্ণুর ধৃতি, মধুসূদনের শান্তি, ত্রিবিক্রমের ক্রিয়া, বামনের দয়া, শ্রীধরের মেধা, হৃষীকের হর্ষা, পদ্মনাভের শ্রদ্ধা, দামোদরের শক্তি লজ্জা। এই দ্বাদশ নারায়ণী শক্তির সহিত কেশব নারায়ণ মাধব ইত্যাদি ক্রমোল্লিখিত দ্বাদশ নারায়ণ মূর্ত্তি ঐ ধাতা অর্য্যমা মিত্র ইত্যাদি ক্রমোল্লিখিত দ্বাদশ আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ দ্বাদশ আদিত্য অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত দ্বাদশ নারায়ণী শক্তি সমন্বিত দ্বাদশ নারায়ণ মূর্ত্তিকে দ্বাদশ স্বরের বীজ অর্থাৎ অং আং ইং ঈং ইত্যাদি রূপে সমাযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণ ললাটাদি ক্রমে তিলকধারণের দ্বাদশ স্থানে ন্যাস করিয়া থাকেন। ইহার প্রয়োগ হইবে, যথা, "ললাটে, অং ধাতৃ-সহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ", "উদরে, আং অর্য্যমসহিতায় নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ" "বক্ষঃস্থলে, ইং মিত্রসহিতায় মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে। এখন বিবেচনা করুন বৈষ্ণবগণ একই তেজোমণ্ডল সূর্য্যের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ভেদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গের ধারণ, শোষণ, রসসঞ্চালন, কর্ষণ, পোষণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই সকল ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত তোজোহংশকে শরীরের মুখ্য মুখ্য দ্বাদশ স্থানে ধারণ করেন। শুধু তাহাই নহে, একবার এই দ্বাদশ নারায়ণী শক্তির রহস্যও মনে ভাবুন, অহো, যে সকল শক্তির কণিকার আবির্ভাবেও মানবদেহ দেবসদৃশ হইতে পারে। বুঝুন, এই জগতে সামান্য যৎকিঞ্চিৎ একটু "কীর্ত্তি"লাভের আকাঙ্ক্ষায়, একটু রূপযৌবন সৌন্দর্য্যাদি "কান্তি"লাভের লালসায়, একটু "তুষ্টি" "পুষ্টি" প্রাপ্তির বাসনায় মনুষ্য কতপ্রকারে তীব্র চেষ্টায় কাল অতিবাহিত করিতেছে। কত প্রাণপণ যত্নেও একটু "ধৃতি" অর্থাৎ ধৈর্য্য শান্তির লেশও পাইতেছে না। প্রকৃত ক্রিয়াশক্তিরহিত মৃতপ্রায় প্রাণ ধারণ করিয়া আমরা হাহাকারেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। ক্ষুদ্র স্বার্থলোলুপতার তীব্র কিরণে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া নির্দ্দয়তায় মরুভূমি তুল্য করিতেছে। "মেধা", "হর্ষা", "শ্রদ্ধা", "লজ্জা", হারাইয়া আমরা

সংসারপথ এবং পরমার্থপথ এই উভয় পথেই নিঃসম্বল বুভুক্ষু দরিদ্রের ন্যায় হা হুতাশ করিতেছি। "কীর্ত্তি", "কান্তি", "তুষ্টি", "পুষ্টি", "ধৃতি", "শান্তি", "ক্রিয়া", "দয়া", "মেধা", "হর্ষা", "শ্রদ্ধা", "লজ্জা" এই সম্পত্তিগুলি ভাগবতী সম্পত্তি, ভগবদ্ভক্তিসহচরী। এই মহতী সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিলে এই মানবাত্মা সর্ব্বতোভাবে পরম সুখী হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ তিলকধারণ সাধনে এই মহতী ভাগবতী শক্তিসমূহকে নিজশরীরে অধিষ্ঠাপিত করিয়া মনে প্রাণে এই ভাগবতীয় শক্তির তেজঃ ধারণ পূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্ম উপাসনা করেন। মহাভারতে ব্রাহ্মণের মুখ্য যে দ্বাদশ গুণ কথিত হইয়াছে তদপেক্ষাও অধিকতর মহদ্‌গুণে পরিপূর্ণ নারায়ণের কীর্ত্তি আদি এই দ্বাদশ শক্তির অধিষ্ঠানে সূর্য্যের ঐ দ্বাদশ তেজকে অধিকতর পুষ্টি বিধান করিয়া তাহাদের প্রাণস্বরূপ নারায়ণ মূর্ত্তি তাহাতে অধিষ্ঠাপিত করিয়া দ্বাদশ বীজ মন্ত্রে নিজ শরীরের দ্বাদশ স্থানে ত্রিসন্ধ্যা যাঁহারা ন্যস্ত করেন, বলুন, ব্রাহ্মণদিগের সামান্যরূপে গায়ত্রী উপাসনা অপেক্ষা তাঁহাদের এই সাধন কোন অংশে কম কি? যে সাধনার বলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ লাভ হয় উপযুক্ত বিজ্ঞ বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁহাদের প্রাথমিক সাধনেই সেই ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। তাই বৈষ্ণবীয় সাধন রহস্য পরমবিজ্ঞ মুনি ঋষি বৃন্দ ব্রাহ্মণেতরজাত্যুৎপন্ন বৈষ্ণবদিগকেও বিপ্রসাম্য বলিয়া শাস্ত্রে যে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অমূলক বা অযৌক্তিক নহে। প্রকৃত ভগবৎ শক্তি উপাসক বৈষ্ণবই, ইহাও একবার বিচার করুন।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ঐ প্রকার অধিষ্ঠানসহ শক্তিযুক্ত বিষ্ণু ধ্যান করিয়া ললাটাদি স্থানে অং আং ইত্যাদি বীজপুটিত মন্ত্রগুলি ন্যাস করিলেও ত হয়, তবে আবার মৃত্তিকাদি দ্বারা ললাটাদি স্থানে নানাপ্রকার চক্‌রা বক্‌রা চিহ্নাদি রচনা করার উদ্দেশ্য কি? ঐ চিহ্নগুলি দেখিয়া বেশভূষা বলিয়াই মনে হয়।

উত্তর—হরি! হরি! মৃত্তিকাদি লেপন দ্বারা শরীরের স্থানবিশেষে কথিত চক্‌রা বক্‌রা চিহ্ন করাটাই আপনাদের মত মহাবিজ্ঞদের মতে খুব একটা মনোহর বেশ না কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর সুন্দর মনোহর বেশ ধারণের উপযুক্ত দ্রব্যাদি বৈষ্ণবেরা খুজিয়া পাইলেন না। তাই তাঁহারা মনের

দুঃখে মাটি লইয়া গায়ে নানাপ্রকার চিহ্ন করিয়া বেশভূষার সাধ মিটাইতেছেন। আহা, আপনাদের কি গবেষণা! কি মহামহিম বিজ্ঞতার পরিচয়! আপনাদের গবেষণার বালাই যাই!

প্রশ্ন—বলুন, তাহা হইলে ঐ প্রকার চিহ্নাদি ধারণ কেন?

উত্তর—দেখুন, সব স্থলে সব 'কেন'র উত্তর সহজ নহে। বৈদিক স্মার্ত্ত যাগাদিতে "সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল," তান্ত্রিক অর্চ্চনাদিতে "ভুবনেশ্বরী" প্রভৃতি যন্ত্রাকৃতিকেও চক্‌রা বক্‌রা বলা যাইতে পারে। স্মার্ত্ত কর্ম্মে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি অঙ্কন এবং তান্ত্রিক পূজাদিতে যন্ত্রাদি অঙ্কনের ব্যবস্থা যে সকল গভীর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বৈষ্ণবদিগের তিলক চিহ্নে তদপেক্ষা কম তত্ত্ব নিহিত নহে, বরং অনেকাংশে অধিক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ সমস্ত যন্ত্রমণ্ডল চক্রাদির তত্ত্বরহস্যজ্ঞান জগতে বড়ই দুর্লভ, উহার প্রকৃত উপদেষ্টা জগতে অতীব বিরল। যাহা হউক বৈষ্ণবদিগের তিলক চিহ্নের রহস্য একটুমাত্র সংক্ষেপে বলি। বৈষ্ণবদিগের তিলকের সাধারণ ভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চিহ্নটি বস্তুতঃ "হরিপদাকৃতি"। পদ শব্দের অর্থ স্থান, অর্থাৎ নিবাস স্থল, আর আকৃতি শব্দের অর্থ চিহ্ন, তাহা হইলে "হরিপদাকৃতি" শব্দের অর্থ হইল "হরিবাসস্থলের চিহ্ন"। শাস্ত্রে এই প্রকার হরিপদাকৃতির লক্ষণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধভাবে দুই পার্শ্বে দুইটি রেখা, মধ্যে ছিদ্র (ফাঁক রাখা), এবং দুই রেখার নিম্নে সম্মিলিত স্থানের নিম্নে লেপন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যাধিষ্ঠান যুক্ত সশক্তিক শ্রীহরির অধিষ্ঠান স্থল। নিম্ন স্থলটি সূর্য্যাধিষ্ঠানের স্থান, মধ্যের ফাঁক স্থানটি পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তি কান্তি আদি শক্তিসমন্বিত নারায়ণের নিবাস স্থল, ইহার শাস্ত্রবিহিত অঙ্কনই বৈষ্ণবের তিলক চিহ্ন। সংক্ষেপে তিলক চিহ্নের কিঞ্চিৎ রহস্য বলিলাম।

প্রশ্ন—আপনি বলিতেছেন ব্রাহ্মণের গায়ত্রী উপাসনার ফল বৈষ্ণবদিগের তিলকধারণ ব্যাপারেই সম্পন্ন হয়, যেহেতু সূর্য্যমণ্ডলে নারায়ণের ধ্যান ধারণাদিই বৈদিক গায়ত্রীর উপাসনা, আর বৈষ্ণবেরাও তিলকধারণে সেই সূর্য্যমণ্ডলে নারায়ণ ধ্যানাদি করেন এবং তিলকধারণ স্থলে সেই ধ্যেয় নারায়ণকে ন্যাস করেন। এখানে আমার একটি সংশয় আছে।

ব্রাহ্মণগণ বৈদিক গায়ত্রী উপাসনায় ত শুধু নারায়ণকে ধ্যান করেন না, ব্রাহ্মী শক্তি রৌদ্রী শক্তি সমন্বিত ব্রহ্মরুদ্রের ধ্যানও গায়ত্রী উপাসনার মধ্যে করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা কেবল নারায়ণের ধ্যান দ্বাদশ স্থলে করেন, ব্রহ্মরুদ্রের ধ্যান বা ন্যাস ত করেন না, তিলকধারণে বৈদিক গায়ত্রী উপাসনার সমতার কি প্রকারে সামঞ্জস্য হয়?

উত্তর—পূর্ব্বে বলিয়াছি "অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ পুরাণে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এখানে "সদা" এই পদটির প্রতি লক্ষ রাখিয়া বৈষ্ণবগণ যদি সর্ব্ব স্থলে কেবল নারায়ণেরই ধ্যান করেন তাহাতে ব্রহ্মণ্য শক্তি লাভের কোনও হানি হয় না, কারণ নারায়ণই একমাত্র ব্রহ্মণ্য দেব। তথাপি আপনার সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের তিলকের ব্যবস্থার আরও একটু সংক্ষেপে বলিতেছি। বৈষ্ণবেরা তিলকধারণে ললাটাদি স্থলে ব্রহ্মরুদ্রেরও ধ্যান ধারণা এবং ন্যাস করেন। পূর্ব্বকথিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের দুই পার্শ্বেই ব্রহ্মরুদ্রের স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুঃ সদা স্থিত স্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥"

প্রশ্ন—আর একটু সন্দেহ; ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী উপাসনায় নারায়ণকে তেজোময় হিরণ্ময়বপুঃ চিন্তা করেন, বৈষ্ণবেরা কি তেজোময় হিরণ্ময়বপুঃ নারায়ণকে তিলকধারণে চিন্তা করেন?

উত্তর—বৈষ্ণবগণ তিলকধারণ ব্যাপারে মস্তকে একটি **কিরীট** মন্ত্র ন্যাস করিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রটি শ্রবণ করিলে আপনার সন্দেহ নিরসন হইবে। মন্ত্র যথা—ওঁং শ্রীকিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডলচক্রশঙ্খগদাপদ্মহস্তপীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থলশ্রীভূমিসহিতায় স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় **সহস্রাদিত্য-তেজসে** নমোনমঃ। এখন ভাবুন প্রকৃত শাস্ত্রবিহিত বৈষ্ণবীয় তিলকধারণ এবং মনের এই প্রকার বিষ্ণুতেজ ধারণে অভ্যাস দ্বারা বৈষ্ণবের দেহ মন আদি বিষ্ণুময় হইয়া উঠে কি না। অথচ সাধারণ অজ্ঞেরা বৈষ্ণবের তিলকধারণ ব্যাপারটিকে কত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। শাস্ত্রদৃষ্টি আর সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য।

একাদশী ব্রত রহস্য

প্রাকৃত বিষয় ভোগ এবং প্রাকৃত কার্য্য হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্ব বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে উপাবৃত্ত অর্থাৎ সংযত করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম আরাধনা করাই একাদশী ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য। একাদশ ইন্দ্রিয়ের এই প্রকার ব্রতকেই একাদশী ব্রত বলা যায়। ভোজন নিদ্রাদি ত্যাগ প্রভৃতিও ইহারই অন্তর্গত। একাদশী ব্রত বিধানশাস্ত্রে স্মার্ত্ত মতে এবং বৈষ্ণব মতে পার্থক্য বিশেষ দেখা যায়। স্মার্ত্ত মতে একাদশী তিথিতে মাত্র ভোজন না করা রূপ উপবাসের বিধানই প্রবল দেখা যায়, বিশেষতঃ ইহা বিধবার পক্ষে। কিন্তু শ্রীহরি আরাধনা বিধানের তেমন প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। বৈষ্ণব মতে ভোজনাদি ত্যাগ রূপ উপবাস এবং হরি আরাধনা এই উভয়েরই বিধান প্রবল ভাবে পাওয়া যায়, বরং যোগ্যতানুসারে অধিকারী ভেদে নিরম্বু উপবাস, তৎপরিবর্ত্তে ফলমূলগব্যাদি অনুকল্পের ব্যবস্থা করায় উপবাসলক্ষণকে সঙ্কোচ করা হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ হরি আরাধনায় কোনরূপ অনুকল্প বিধান করিয়া সঙ্কোচ করা হয় নাই। ইহাতে দেখা যায় বৈষ্ণব মতে একাদশী দিবসের যে নাম হরিবাসর সেই নামের সার্থকতাই বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে, কেননা হরির বাসরে হরির সাক্ষাৎ আরাধনা প্রবলভাবে না থাকিলে হরিবাসর নামের সার্থকতা কোথায়?

প্রশ্ন—প্রাকৃত বিষয় ভোগাদি বর্জ্জিত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক হরি আরাধনাই যদি একাদশী ব্রতের তাৎপর্য্য হয় তাহা হইলে যে কোন তিথিযুক্ত দিবসেই ত উক্ত প্রকার হরি আরাধনা হইতে পারে? ইহার জন্য একাদশী তিথিযুক্ত দিবসের সার্থকতা কি? এবং একাদশী তিথিতে

নিরাহারাদির ব্যবস্থাই বা কেন? একাদশী তিথিরই বিশেষ কোন মহিমা আছে অথবা ইহার অন্য কোনও বিশেষ কারণ আছে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া বলুন।

উত্তর—প্রতিপদ্ দ্বিতীয়াদি পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথির পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতা দেব আছেন। সেই সেই তিথিযুক্ত দিবসে সেই সেই দেবভাবপরিপূর্ণ দেবশক্তির ক্রিয়া জ্যোতিশ্চক্রকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকাশ পায়।

বৈষ্ণবগণ যে একাদশী তিথিতে উপবাসাদি অবলম্বন পূর্ব্বক হরি আরাধনা করেন তাহা মাত্র শুদ্ধা একাদশীতে নহে, দশমী তিথি সংস্পর্শশূন্যা দ্বাদশী তিথি সংযুক্তা একাদশী তিথিতে উপবাসাদি করেন। ঐ প্রকার একাদশী তিথিই বৈষ্ণবদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মহামহিমান্বিতা। বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী তিথি দ্বাদশী যাবৎ ঋষি তিথি একাদশীকে স্পর্শ করিয়া ঋষিশক্তিকে মহামহিমান্বিতা করিয়া না তুলেন তাবৎ পর্য্যন্ত ঋষিশক্তিকে নিজের আরাধ্যা বলিয়া মনে করেন না। বস্তুতঃ তখনই আর্ষজ্ঞান এবং আর্ষশক্তির পূর্ণতা এবং প্রকৃত সফলতা লাভ হয় যখন সর্ব্বতত্ত্ব পরাৎপর বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্বশক্তির মূলাশ্রয় বিষ্ণুশক্তিতে তাহারা পর্য্যবসিত হয়। প্রকৃত ঋষিত্বের পূর্ণতা এবং সফলতা লাভ করিতে হইলে "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ" এই জ্ঞানে সকল জ্ঞানের পর্য্যবসান হওয়া চাই। "ঋষি মর্ন্ত্রদ্রষ্টা," মন্ত্রের দ্রষ্টাকে ঋষি বলা যায়, বেদরহস্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন যিনি তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিপদবাচ্য। বেদজ্ঞান সামান্যতঃ দ্বিবিধ, এক আক্ষরিক জ্ঞান, অর্থাৎ বেদের অক্ষরসন্নিবেশাদি অক্ষরোচ্চারণে উদাত্তাদি স্বরভেদ কণ্ঠ্যতালব্যাদি ভেদ ছন্দোভেদ প্রভৃতির জ্ঞান বেদের আক্ষরিক জ্ঞান, আর দ্বিতীয় অর্থজ্ঞান, অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়াবিষয়ক যাবতীয় দেবতা মন্ত্র বিধি দ্রব্যাদি বিষয়ক মীমাংসা জ্ঞান এবং এতৎ সমূহের তাৎপর্য্যসমন্বয়জ্ঞান। এই সকল বেদজ্ঞানের পর্য্যবসান এবং জ্ঞেয় পদার্থের পর্য্যবসান একমাত্র নারায়ণেই। এই বেদের বিষয়বিষয়ী জ্ঞানজ্ঞেয় প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকাদি ভাবসম্বন্ধের পর্য্যবসান একমাত্র নারায়ণেই এবং এই সকল জ্ঞান এবং কর্ম্মাদি উপাসনার

ফল একমাত্র নারায়ণেরই প্রীতি। তৎসন্তোষণার্থে কর্ম্মই কর্ম্ম, তদুপাসনার নিমিত্ত উপাসনাই উপাসনা, তন্ময় জ্ঞানের জন্যই সকল জ্ঞান। সুতরাং বেদের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও বা দেবতান্তর ক্রিয়ান্তরাদি পরম্পরারূপে একমাত্র নারায়ণেই পর্য্যবসিত। তাই শ্রীগীতায় "সর্ব্বৈ র্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ" কথিত হইয়াছে। বেদোক্ত নানাবিধ দেবতামন্ত্রযজ্ঞাদি সমস্তই নারায়ণেরই বিভূতি। এই প্রকার বেদদ্রষ্টৃত্বই ঋষির ঋষিত্ব। **"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্ভবতি,"** যজ্ঞমাত্রই বিষ্ণুর স্বরূপ, বিষ্ণুতে পরম জ্ঞান ভিন্ন ঋষিত্বই নাই, তাই বৈষ্ণবগণ একাদশীর উপবাসের দিন বিষ্ণুশক্তিদ্বারা পরমানুগৃহীতা ঋষিশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। যথাশাস্ত্র একাদশীব্রতনৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণ এইরূপে ঋষিশক্তি বিষ্ণুশক্তির সম্মিলনরূপ একাদশী দিনে বিষ্ণু আরাধনা ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের যাবতীয় কার্য্যকে নিরোধ করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণু আরাধনায় তৎপর হইয়া বেদোক্ত পৃথক্ পৃথক্ অগ্নিহোত্রাদি না করিলেও সমস্ত বৈদিক উপাসনার মর্য্যাদা সারই রক্ষণ করিয়া থাকেন। **বৈষ্ণবের যথোক্ত শ্রীহরিবাসর প্রতিপালনে সমগ্র বৈদিক ব্রতই পালন করা হয়।** এখন বুঝুন এই একাদশী প্রতিপালনে কি অপূর্ব্ব তপস্যা নিহিত আছে, যে তপস্যার ফলে বৈষ্ণবগণ অতি অচিরেই ঋষিশক্তি লাভে সক্ষম হয়েন।

একাদশীতে ঋষিশক্তি ও দ্বাদশীর মিলন অপেক্ষায় কোন কোন সময় বৈষ্ণবদিগের একাদশী ব্রত স্মার্ত্তমতের একাদশীর পরদিন হইয়া পড়ে। ঐ প্রকার ঋষিশক্তিরূপ একাদশীতে বিষ্ণুশক্তিরূপ দ্বাদশী মিলিত হইলেও যদি দশমী তিথির গন্ধের দ্বারাও একাদশী দুষ্টা হন তাহা হইলে সে দিন বৈষ্ণবগণ ব্রতপালন করেন না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বৈষ্ণবদিগের একাদশী ব্রতের সহিত সাধারণ ব্রতাদির কোনওরূপ তুলনা করা সঙ্গত নহে। হরিসম্বন্ধীয় সমস্তই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, ইহাদের চরম ফল হরিপ্রাপ্তিই। যাহার ফলে তুচ্ছ জাগতিক সম্পত্তি লাভ হয়, তাহাকে এতাদৃশ মহামহিম বস্তুর সহিত তুলনা করাই চলে না, বস্তুতঃ উহা অপরাধ বিশেষ।

সদ্‌গুরু
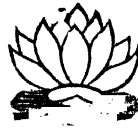
প্রশ্ন—সদ্‌গুরু কাহাকে বলা যায় ?

উত্তর—সতে অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিতে যে গুরুত্বের আবির্ভাব হয় সেই স্থলেই "সদ্‌গুরু" শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে দুইটি শব্দ—একটি "সৎ", আর একটি "গুরু," এই দুই শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলে "সদ্‌গুরু" শব্দের অর্থ বুঝা যাইবে।" "সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ"—সৎ বলিতে সাধু ব্যক্তিকে বুঝায়। একমাত্র সাধারণ লৌকিক বৈদিক কর্ম্মসাদ্‌গুণ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যদ্যপি সাধু বলিতে সাধারণ ভাবে সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝায়, তথাপি শুদ্ধ পরতত্ত্ব-বিষয়ক সাক্ষাৎ সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই এখানে সাধু শব্দের লক্ষ্য। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পরতত্ত্ব, ভাগবত গুণই প্রকৃত সদ্‌গুণ, ভগবজ্‌জ্ঞান লাভই পরম সদ্‌গুণ লাভ। যিনি এই ভগবজ্‌জ্ঞানলাভে সিদ্ধ হইয়াছেন তিনিই এখানে সাধু শব্দের লক্ষ্য। ভগবজ্‌জ্ঞান দুই প্রকার,—একটি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, দ্বিতীয় ভগবজ্‌জ্ঞান ; ইহার সাধন ও দ্বিবিধ,—একটি আত্মানাত্ম-বিবেকাদি জ্ঞানসাধন, আর একটি ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি ভক্তি-সাধন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।* সুতরাং সাধুও দুই প্রকার, ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধ আর ভগবদ্‌ভক্তিসিদ্ধ। **ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানীই জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ, আর ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্ত ভক্তই ভক্তিমার্গে সিদ্ধ। এই দুই প্রকার সাধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে গুরুত্বের আবির্ভাব হইলেই এই উভয় ব্যক্তিই সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত হয়েন।**

---

* ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"গুরুত্বের" আবির্ভাব যাহা বলা হইল সেই গুরুত্বটি কি তাহা বুঝা প্রয়োজন। গুরুত্ব বলিতে সাক্ষাদ্ ভগবদুপদেষ্টৃত্বই বুঝিতে হইবে। ভগবদ্‌বিষয়ক উপদেষ্টাই গুরু। তাহা হইলে সদ্‌গুরুর অর্থ এই যে তাদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বানুভবী জ্ঞানী যদি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেষ্টার স্তরে আরূঢ় হন তাহা হইলে জ্ঞানমার্গে তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলা যায়। আর যিনি ভগবৎপ্রেম নামক পঞ্চমপুরুষার্থকে লাভ করিয়াছেন তিনি যদি ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টার পদে আরূঢ় হন তাহা হইলে ভক্তিমার্গে তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলা যায়। প্রকৃত **সদ্‌গুরু অতীব বিরল**। কেবল মাত্র কথার চটকে অর্থ লাভ যশঃ লোকসংগ্রহাদি লালসায় পুঁথিপত্রের ব্যাখ্যার কৌশলে বা কেবল মাত্র গৈরিক বসন কৌপীন কন্থা তিলক মালাদির ধারণের আড়ম্বরে, অথবা অন্তরে মায়িক দেহ গেহ স্ত্রী পুত্রাদি লালন পালনে এবং তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত সতত উৎকণ্ঠিত থাকিয়া বাহিরে রাগমার্গ লীলাকথা ইত্যাদির খ্যাপনে নিপুণতা লাভ করিলেই সদ্‌গুরু হওয়া যায় না। "গুরু" হইবার বাসনা আমার প্রবল আছে, কিন্তু "সৎ" হইবার বাসনা মোটেই নাই, তাই আমার মত হতভাগ্য ব্যক্তিই **অসদ্‌গুরু** হইয়া পড়ে।

ভগবজ্‌জ্ঞানভক্তি গুণে যিনি সৎ তিনিই গুরু।

প্রশ্ন—গুরু ত ভগবান্‌ই, তবে আর "সদ্‌গুরু"র বিচার কি ?

উত্তর—শুধু ভগবান্ বলিয়া নয়, বলুন গুরু আমাদের পরমার্থ গতির আদর্শ, সাক্ষাদ্ ভগবদাবির্ভাব।

প্রশ্ন—কথাটি বিস্তার করিয়া বলুন।

উত্তর—গুরু শব্দের অর্থ বলিয়াছি, ভগবজ্‌জ্ঞানভক্তির উপদেষ্টাই গুরু। যিনি উপদেশ করিবেন তিনি স্বয়ং **আদর্শ** না হইলে উপদিষ্ট বিষয় গ্রাহ্য হয় না। যিনি উপদেশ করিবেন, তিনি স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়া বা তৎপ্রতিপালনে সচেষ্ট হইয়াই উপদেশ করিবেন, তাহা হইলেই উপদেষ্টা হইতে পারেন। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন,—"গুরুত্ব" ধর্ম্মের **স্থিতি** আর **অভিব্যক্তি** এই দুইটি অবস্থায় পূর্ণ আবির্ভাব হয়। **গুরুত্বের স্থিতি** এবং **অভিব্যক্তি** যে ব্যক্তিতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তিনিই সদ্‌গুরু। সদ্ধর্ম্মের আচরণে স্থিতি, আর প্রচারে অভিব্যক্তি।

ধর্ম্মের আচরণ করিলে ধর্ম্ম স্থিতি লাভ করে, আর ধর্ম্মের প্রচার করিলে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। প্রথমে আচার পরে প্রচার, আচারটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে প্রচারে অধিকার লাভ হয়। যাঁহারা স্বয়ং আচরণ করেন না, তাঁহারা কেবল প্রচার মাত্রেই প্রকৃত গুরু হইতে পারেন না। হায়! আমার কিন্তু আচারের পূর্ব্বে গুরু হইবার বাসনা জাগে। যৎকিঞ্চিৎ আচারের ভান দেখাইয়া উপদেশ দানে পাণ্ডিত্য লাভের লালসায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি।

"আচরণ না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়" ॥

জীবের প্রতি শ্রীভগবানের জড়প্রকৃতিধর্ম্ম বিরহিত শুদ্ধ স্বরূপ-শক্তিময়ী কারুণ্যশক্তির তীব্র স্পন্দনে যখন শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞানময় এবং শুদ্ধ ভগবদ্‌ভজনময় তত্ত্ব দুইটি মিলিত হইয়া উদ্রিক্ত অবস্থা প্রকাশ করে তাহাই "গুরুতত্ত্ব"। জ্ঞান এবং ভজন এই দুইটি তত্ত্ব মিলিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিলে গুরুত্বের সম্যক স্থিতিলাভ হয়, তাহাতে কারুণ্য শক্তির উদ্রিক্ততা প্রকাশ পাইলে তখনই গুরুত্বের অভিব্যক্তি হয়। এখন গুরুর স্বরূপটি কি তাহা বুঝুন—জীবের প্রতি ভগবানের স্বরূপ শক্তিময়ী করুণাঘন ভগবজ্‌জ্ঞানময় এবং ভগবদ্‌ভজনময় তনুই শ্রীগুরুবিগ্রহের স্বরূপ।

এখানে জ্ঞান বলিতে মৌখিক "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" ইত্যাদি গোটা কতক বাগাড়ম্বরে দিক্ মুখরিত করিয়া ছলতঃ নানাবিধ জাগতিক ভোগ-বিলাসে অভিনিবিষ্টতা নহে। **"মহান্ত স্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।"** এই সকল গুণ প্রকাশ পায় যে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে তাদৃশ জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষই জ্ঞানমার্গে সদ্‌গুরু। আবার ভজন বলিতেও কেবল মাত্র বাহ্যিক মালা তিলকের আড়ম্বর এবং অর্থাদি উপার্জ্জনে চাতুর্য্যময় কপট ভজন নহে। "অনন্যমমতা বিষ্ণৌমমতা প্রেমসঙ্গতা" ইত্যাদি গুণবান্ ভগবদ্‌ভক্তিসিদ্ধ পুরুষই ভক্তিমার্গে সদ্‌গুরু।

সতে গুরুত্বের আবির্ভাব

নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্ম সাধনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে সাধকোচিত ভাগবতীয় সত্য দয়া দাক্ষিণ্য সারল্য অহিংসা বিনয় সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রভৃতি

সদ্‌গুণ সমূহ. সাধকে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হইতে থাকে। ভগবদ্‌-ভজনরূপ পরম সৎসংস্কারটির আনুষঙ্গিক সত্য দয়া সারল্য বিনয়াদি সৎ-সংস্কারগুলি সাধকহৃদয়ে ক্রমশঃ যতই বদ্ধমূল হইতে থাকে সাধক পুরুষও ততই মায়াবল রহিত হইয়া নির্ম্মল সৎ হইতে থাকে। যখন সাধনটি সিদ্ধ হয় সঙ্গে সঙ্গে সত্য দয়াদি সদ্‌গুণ সমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন মায়ামুগ্ধ বহির্ম্মুখ জীবের মায়িক দুঃখ দেখিয়া তাদৃশ জ্ঞানসিদ্ধ বা ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষের হৃদয়ে ভগবদিচ্ছায় যে ভগবত্তত্ত্বোপদেশের নিমিত্ত জীবের প্রতি নির্হেতুক কারুণ্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় সেই **কারুণ্যব্যাকুলিত জ্ঞানভজনসিদ্ধ মহাপুরুষেই শ্রীভগবানের জ্ঞানভজনময় কারুণ্যঘন অবতার স্বরূপ সমষ্টি গুরুরূপ হইতে গুরুত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ গুরুশক্তিটি ব্যষ্টিভাবে আবির্ভূত হয়। তাদৃশ মহাপুরুষকেই সদ্‌গুরু বলা যায়।** (এখানে জীবের দুঃখে দুঃখী হওয়ার অর্থ তত্ত্বোপদেশ হরিকথা ভজন প্রচারাদির ছলনায় নিজের অর্থ যশঃ ভোগ বহু শিষ্য ভক্ত সংগ্রহাদি করা নহে।) জীবের প্রতি প্রকৃত দুঃখানুভব কি অবস্থায় হয় তাহা শুনুন—প্রকৃত ভাবে চিত্ত রজস্তমোগুণের উপচয়রূপ মলের আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যখন স্বচ্ছাত্মতা প্রাপ্ত হয়, যখন আর পুনরায় রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় না, তখনই চিত্ত বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ চিত্তের নির্ম্মল স্থিতিধারাকে অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধসত্ত্বাত্মক অবস্থাকেই বৈশারদ্য বলে। সেই বিশারদ চিত্তে "অধ্যাত্ম প্রসাদ" উদিত হয়। অধ্যাত্ম প্রসাদ বলিতে এক প্রকার চিত্তের উৎকর্ষতাই বুঝায় যে উৎকর্ষতার বলে চিত্তে সত্যপদার্থের ধারণার যোগ্যতা আইসে; মোট কথা তখন চিত্তে সত্য ভিন্ন মিথ্যার স্থান নাই, যাহা সত্য তাহাই চিত্তে উদিত হইবে, যাহা মিথ্যা তাহা উদিত হইবে না। বস্তুতঃ ইহাকেই জ্ঞানের প্রসার বলে। সাধন ভজনে সাধকের চিত্ত এইরূপ বিশারদ হইলে তাদৃশ সাধনসিদ্ধ ব্যক্তিকে **প্রাজ্ঞ** বলা যায়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সত্যদর্শী। তিনিই সংসারক্লিষ্ট জীবের দুঃখ প্রকৃতই দেখিতে পান, যথা—

প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥

রজঃ এবং তমোগুণের সমুদ্রেকরূপ মলাবরণ রহিত চিত্তের শুদ্ধ সত্ত্বময় স্থিতিধারাকে বৈশারদ্য বলে। তাদৃশ চিত্তে প্রজ্ঞার উদয় হয় (সত্য দর্শন হয়)। তাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞার উৎকর্ষ লাভ করিয়া নিজে অশোচ্য অর্থাৎ শোচনীয় সংসার বন্ধন মুক্ত হইয়া সংসারাসক্ত জীবদিগকে শোকগ্রস্ত দর্শন করেন। এই প্রকার প্রজ্ঞালাভ বিনা অন্যের সংসার দুঃখ প্রকৃত অনুভব হয় না।

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ অথবা ভগবৎ-প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তিসিদ্ধি মহাপুরুষের হৃদয় জীবের সাংসারিক দুঃখদর্শনে তাহাদের দুঃখ মোচনেচ্ছায় ভগবজ্‌জ্ঞান দান করিবার জন্য প্রবৃত্তোন্মুখ হইয়া উঠে যখন তখন সমষ্টি গুরুরূপ হইতে গুরুত্ব শক্তিটি ব্যষ্টিভাবে সেই সিদ্ধ মহাপুরুষে আবির্ভূত হয়।" ইহার নামই সদ্‌গুরু ইহাও বুঝিলাম, কিন্তু সমষ্টি গুরুরূপটি কি তাহা একটু খুলিয়া বলুন।

উত্তর—আমরা প্রত্যেকেই শ্রীগুরুপূজায় যে গুরুর ধ্যান করি সেই **ধ্যেয় গুরুই সমষ্টি গুরু।** আমি যে ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ধ্যেয় গুরুকে চিন্তা করি আমার শিষ্যও সেই ধ্যেয় মূর্ত্তিকেই, আবার আমার গুরুও সেই একই ধ্যেয় গুরুমূর্ত্তিকেই গুরুপূজায় ধ্যান করিয়া থাকেন। এই প্রকার অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সাধকের মন্ত্রদাতা নিজ নিজ গুরু পৃথক্ পৃথক্ হইলেও ধ্যেয় গুরু সকলেরই এক, ইহা শাস্ত্রে গুরুর ধ্যানরূপে কথিত হইয়াছে। "শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং" ইহাই, আমার আপনার এবং অন্যের যত পৃথক্ পৃথক্ গুরুমূর্ত্তি ব্যষ্টিভাবে আছেন সেই পৃথক্ পৃথক্ অনন্ত ব্যষ্টিগুরুর মূল গুরুকেন্দ্র এক সমষ্টিগুরুই। ইনিই বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের সাক্ষাদাবির্ভাব, ভগবজ্‌জ্ঞান-ভজন-উপদেষ্টৃত্বময় বিগ্রহ।

প্রকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইতে থাকিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অথবা ভগবদ্ভক্তির নির্ম্মল সাধনের আনুষঙ্গিক উপজাত জ্ঞান দ্বারা বিষয় বাসনা রহিত শুদ্ধ অন্তঃকরণে যে ভগবত্তত্ত্বানুভব হইতে থাকে অথবা ভক্তিশক্তির শুদ্ধাবির্ভাব হইতে থাকে, সেই তত্ত্বানুভবের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা ভক্তিশক্তির শুদ্ধাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাধক ভক্তেতে গুরুত্ব শক্তিটিও আবির্ভূতা হইয়া স্থিতি লাভ করিতে থাকে। পূর্ব্বে

বলিয়াছি "গুরুত্বের স্থিতি সদ্ধর্ম্মের আচরণেই", বিশেষতঃ "জ্ঞানময় এবং ভজনময়ই গুরুর স্বরূপ", সুতরাং যেখানে জ্ঞান বা ভজন স্থিতি লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থলে জ্ঞানদাতৃত্ব ভজনদাতৃত্ব রূপ গুরুধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞানদানের যোগ্যতা বা ভগবদ্ভক্তিদানের যোগ্যতাও স্থিতিলাভ করে। সুতরাং তত্ত্বানুভবী জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্তই পরমার্থে গুরু। কিন্তু যখন অবিদ্যাশৃঙ্খলিত ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রতি নির্হেতুকারুণ্যাভিঘাতে তাঁহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠে তখন তাঁহাদের হৃদয়স্থিত জ্ঞানময় ভজনময় স্বরূপ যে গুরুশক্তিটি স্থিতি লাভ করিতেছে তাহাও স্পন্দিত হইয়া নিজকেন্দ্র সমষ্টিগুরুশক্তির অভিমুখে ছুটিতে থাকে। (তাদৃশ জ্ঞানী বা ভক্ত হৃদয়স্থিতা ভগবজ্‌জ্ঞানভজনময়স্বরূপ গুরুশক্তিটি ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃখের সংবাদ বাহিকা হইয়া পুরচারিণীর ন্যায় জীবের দুঃখ-মোচনার্থিনীরূপে নিজের মূল (মালিক) পরমাশ্রয় প্রভুর চরণে নিবেদন করিবার জন্যই যেন ব্যাকুল প্রাণে ছুটিতেছে। ধন্য জ্ঞানী ভক্তহৃদয়বাসিনী ভগবজ্‌জ্ঞানভজন প্রাপিকা গুরুশক্তি! আহা! এমন না হইলে মাদৃশ সংসারপঙ্কনিমগ্ন হতভাগ্যজনের উদ্ধারের উপায় কি?) জ্ঞানী বা ভক্তহৃদয়স্থা গুরুশক্তির সহিত অবয়বাবয়বী ভাবে নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট সমষ্টিগুরুশক্তিও কারুণ্যস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া নিজের "উপদেষ্টৃত্ব" শক্তিটিকে ঐ জ্ঞানী বা ভক্তহৃদয়স্থিতা জ্ঞান বা ভজনময় স্বরূপ গুরুশক্তির মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দেন অর্থাৎ জীবের প্রতি উপদেশ প্রবৃত্তির প্রেরণাশক্তি সঞ্চালন করেন। তখনই জ্ঞানী বা ভক্ত হৃদয়স্থিতা গুরুশক্তিটি পূর্ণতা লাভ করে। অহো! সংবাদবাহিকা জীবদুঃখকাতরা জ্ঞানী বা ভক্তহৃদয়স্থা গুরুশক্তিটি যখন নিজের পরমাশ্রয় প্রভু সমষ্টিগুরুর অনুমোদন-প্রেরণা সঞ্চালনে অধিকতর করুণাচঞ্চলচরণা হইয়া জীবের ভাগ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তখনই জীব তাদৃশ জ্ঞানসিদ্ধ জ্ঞানীর মুখ নিঃসৃত জ্ঞানোপদেশ বা ভক্তিসিদ্ধ প্রেমবদ্ভক্তমুখোদ্গলিত ভগবদ্ভক্ত্যুপদেশামৃত লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। * ইহাই **সতে সাধুমহাপুরুষে গুরুত্বের**

* শ্রীপাদ গ্রন্থকারের রচিত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণন আছে,—পাঠক ইচ্ছা করিলে সেই গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

আবির্ভাব। হা দুর্ভাগ্য! আমি কিন্তু গৈরিকবসনাদিতে ভূষিত হইয়াই জ্ঞানী, বক্তৃতাদির ছলে, নিজের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই গুরু হইবার লালসায় ঘুরিয়া বেড়াই। বাহ্যিক মালা তিলকের আড়ম্বরে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যার কৌশলে অর্থ মান লোক প্রতিষ্ঠাদি উপার্জ্জনের জন্যই গুরু হইতে চেষ্টা করি।

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন যে সদ্ধর্ম্মের আচরণেই গুরুত্বের স্থিতি এবং যেখানে জ্ঞান বা ভক্তিসাধন অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞান ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব-শক্তিটিও সাধকের হৃদয়ে আগমন করিয়া স্থিতি লাভ করে। এখন আমার প্রশ্ন এই যে যেমন সাধকই হউক না কেন প্রত্যেক সাধকেই ত কিছু না কিছু ভগবদ্ভজনসাধন বা জ্ঞানের সাধন ত করেন। সুতরাং তাঁহারাও ত গুরু হইতে পারেন।

উত্তর—গুরু হইতে পারেন কি পারেন না, এই বিষয়ে কোন কথা হইতেছে না। যে কেহ যে কাহারও গুরু হউক না কেন ইহাতে কে কাহাকে বাধা দিতে পারে? আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? আমার উত্তরে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি আপনার প্রশ্নের উত্তরেও কিছু বলিতেছি শুনুন,—জ্ঞানসাধনের বা ভক্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকে গুরুত্ব শক্তির আবির্ভাব হয় ইহা সত্য। আর ঐ সাধনে ক্রমশঃ যত পরিমাণে নিষ্ঠা হইতে থাকে গুরুত্ব শক্তি ততই স্থিতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ঐ **সাধন যদি প্রকৃত সাধন না হইয়া সাধনের আভাস মাত্র হয় তাহা হইলে গুরুত্ব শক্তির আবির্ভাব হয় না।**

প্রশ্ন—সাধনাভাস কাহাকে বলে?

উত্তর—পরতত্ত্ব জ্ঞানসাধনে ভক্তিসাধনে যদি অন্য কোনও উপাধির লুকোচুরি খেলা থাকে তাহা হইলেই তাদৃশ জ্ঞান বা ভক্তি আভাসিত হয়। বাহিরে আত্মানাত্ম বিবেকের বাক্য ছটা এবং উপবাসাদি দ্বারা শরীরের কৃশতা সম্পাদন ও রুক্ষ মলিন বেশাদি ধারণ দ্বারা বৈরাগ্যের অভিনয় বা মালা তিলক পাঠ কীর্ত্তন নর্ত্তন অর্চ্চন জপাদি জ্ঞান ভজনের চাক্‌চিক্য আমার বেশ আছে, কিন্তু অন্তরাশয়ের কলুষতায় অর্থ লাভ যশ উপার্জ্জন লোক-সংগ্রহ মান আদির কামনা, তার প্রতিঘাতে ক্রোধের প্রাবল্য, সঙ্গে সঙ্গে

লাভ যশ আদির জন্য লোভ চাঞ্চল্য, লাভ যশ আদির হানির ভয়ে চিত্তের বৈকল্য মোহ, অপর কেহ যদি অর্থাদি লাভ করে তাহা হইলে তাহা দেখিয়া গুরুতর মাৎসর্য্যের অসহিষ্ণুতা হিংসা দ্বেষ অসূয়াদির ফলে অবশেষে স্বার্থান্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভক্ত সাধু মহাত্মা নিরাশ্রয় নিঃসম্বল দরিদ্রাদিরও প্রতি দয়ার লেশও রাখিতে পারি না, তখন অপরকে নির্জ্জিত করিয়া আমি বক্তা হইব, উপদেষ্টা হইব, গুরু হইব ইত্যাদিতে গুরুতর জিগীষা পরবশ হইয়া পড়ি, একজনা একজনার সত্য মিথ্যা নানাবিধ কুৎসা রটনা করিয়া অথবা একজনা একজনার পশ্চাতে নিজের দলবল লাগাইয়া নানাবিধ প্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্জ্জিত অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি ; হায়, মালা তিলক খোল করতাল ভাগবতের আড়ালে অতি হীন এই কদর্য্য ব্যাপারগুলির উদ্ভট নর্ত্তন প্রচুর পরিমাণে চলিতে থাকে, অথচ মালার ঝোলার মধ্যে হাত রাখিয়া ঝোলা নাচান বা ভাগবত খুলিয়া ব্যাখ্যামুদ্রায় হাত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্যবসায়ীর চাতুর্য্যে রাগানুগা ভক্তির মহিমাগানের গৎ আওড়ান বা ব্রহ্মজ্ঞানের "ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ব্যাখ্যার তুবড়ীবাজি ছুটানকেই প্রচুর সাধন বা মহাজ্ঞান মনে করি এবং অপর লোককেও মনে করাইতে চেষ্টা করি। বলুন এই প্রকার জ্ঞানে বা শ্রবণাদি ভক্তিসাধনে গুরুত্ব শক্তির প্রকৃত আবির্ভাব হয় কি ? এই জাতীয় সাধক আমার সাধনও যেমন ছলনাময়, আমার হৃদয়ে গুরুত্ব শক্তির আবির্ভাবও তেমনই ছলনাময়। সাধনের প্রকৃত ফলের প্রতি লক্ষ্যহারা হইয়া তুচ্ছ জাগতিক ফলের আকাঙ্ক্ষাই এখানে উপাধি। উহা আবার হিংসা দ্বেষ নির্দ্দয়তা বঞ্চকতা প্রভৃতি হীন বৃত্তির আশ্রয়ে অতি নিকৃষ্ট উপাধিই হয়। উহাতে জ্ঞানসাধনের বা ভক্তিসাধনের অপরাধময় হীন আভাস মাত্র প্রকাশ পায়, শুদ্ধ আভাসও নয়। এখন ভাবুন সদ্‌গুরু কাহাকে বলে।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরু পাওয়া যায় কি প্রকারে ? সদ্‌গুরু চিনিবার উপায়ই বা কি ?

উত্তর—নির্ম্মল অন্তঃকরণে অর্থাৎ কুটিলতা বর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে করিতে, এবং নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া ভগবৎ সাধন করিব, কতদিনে সংসার জ্বালার নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার উৎকণ্ঠা প্রবণ প্রাণে

সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভগবদুদ্দেশে প্রার্থনা করুন, সদ্‌গুরু পাইবেন।

প্রশ্ন—মধ্যে মধ্যে সৎসঙ্গ ত করি, পাঠকীর্ত্তনাদিস্থলেও যাই, সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশও শুনি, কই বিশ্বাস ত হয় না।

উত্তর—ঠিক কথা। সৎসঙ্গাদি বা পাঠকীর্ত্তনাদিতে যে যাই তাহা কি সাধুগুরু বাছাই করিতে যাই? না সাময়িক কৌতুক চরিতার্থ করিতে যাই? যেমন কলা বেচা রথ দেখার মত; সময় আছে, বেড়ান হাওয়া খাওয়া, পাঠাদিস্থলে লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, পাঠকেরও রূপগুণ কার্য্যকলাপ হাবভাব বক্তৃতার কৌশল মুখের ভঙ্গী দেখাশুনা, বা প্রাকৃত মনের মত কোন কায কর্ম্মের সহায়তা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা, বাড়ীতে আসিয়া তাহারই প্রতিকূল অনুকূল সমালোচনা পূর্ব্বক রোমন্থন করা, ইত্যাদির জন্যই যাই? না সত্যই আত্মকৃতার্থের তীব্র উৎকণ্ঠায় সাধুদর্শন পাঠাদিশ্রবণে যাই? দুঃখের বিষয় মনকে একটু ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই, করিলে সত্য ধরা পড়িত। যদি সত্য আত্মকৃতার্থের তীব্র উৎকণ্ঠায় "হা ভগবন্ দয়া কর, সংসারযাতনার নিবৃত্তি কর, সদ্‌গুরু সৎসঙ্গ দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর" এইরূপ প্রবণ হৃদয় লইয়া সৎসঙ্গাদিতে যান, তাহা হইলে বিশ্বাস হইবে, ক্রমশঃ ভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হইবে।

প্রশ্ন—কুলপরম্পরা প্রাপ্ত গুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও দীক্ষামন্ত্রাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না?

উত্তর—এ বিষয়ে একটু বিচার করুন, আপনি এখানে প্রধান ভাবে দুইটি কথা বলিতেছেন; একটি কথা "পরিত্যাগ করা", আর একটি কথা "গ্রহণ করা।" পরিত্যাগ এবং গ্রহণ এই দুইটি কার্য্যের প্রযোজক কে তাহা অনুসন্ধান করুন, অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তির জনক (কারণ) কে এবং গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তির জনক (কারণ) কে অনুসন্ধান করুন। অনিষ্ট সাধনতা জ্ঞানই পরিত্যাগের প্রবৃত্তির জনক, এবং ইষ্টসাধনতা জ্ঞানই গ্রহণ প্রবৃত্তির জনক। এইটি আমার অভীষ্টের বাধক এই প্রকার জ্ঞান হইলেই তাহার পরিত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, আর এইটি আমার অভীষ্টের সাধক এই প্রকার জ্ঞান হইলে তাহার গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে। গুরু স্বীকার পূর্ব্বক মন্ত্রাদি

গ্রহণের প্রয়োজন (অভীষ্ট) কি তাহা ভাবুন। ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান ভগবৎ সাধনাদি দ্বারা সংসার দুঃখ নিবৃত্তি এবং ভগবৎ প্রাপ্তিই যদি আপনার অভীষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ অভীষ্টের সাধকতা অর্থাৎ উক্ত প্রকারে সংসার-নিবৃত্তি ভগবৎপ্রাপ্তি প্রয়োজনটি সিদ্ধ হয় যেখানে তাহাকেই আপনার গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার বিরোধিতা বা অভাব যেখানে আছে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন বক্তব্য এই যদি ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবদ্ভজন পূর্ব্বক অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আত্ম-কৃতার্থতাই আপনার গুরুকরণের প্রয়োজন হয়, আর যদি গুরুবংশীয় ব্যক্তি সেই জ্ঞান ভগবদ্ভজন শিক্ষার অভাবস্থল বা বিরোধী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার দ্বারা তাদৃশ জ্ঞানসাধন শিক্ষালাভ হইতে পারে তাঁহাকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি শুধু একটি যেমন তেমন মন্ত্র গ্রহণ মাত্রই আপনার প্রয়োজন হয়, ততোধিক কোনও তত্ত্বজ্ঞান সাধনাদি প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে কুলপরম্পর গুরুবংশীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণই ভাল। মোট কথা এই যে অধ্যাত্ম-জ্ঞানপিপাসু ভগবৎসাধনেচ্ছু ব্যক্তি যাঁহাকে তাদৃশ যোগ্য পাইবেন তাঁহাকেই গুরু করিবেন, ইহাতে গুরুবংশ্য বা তদ্ভিন্নবংশ্য ইত্যাদি বিচারের অবকাশ নাই।

প্রশ্ন—গুরুবংশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও দীক্ষাদি গ্রহণ করায় পাপ হয় না কি ? অনেকে বলেন যে গুরুবংশ্যদিগের নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র মন্ত্রদীক্ষাদি গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ মহাপাপ হয়, ইহা কি সত্য ?

উত্তর—আপনার প্রশ্নের উত্তর বহু বিচার সাপেক্ষ। প্রথমতঃ বিচার করুন, "গুরুবংশীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিলে গুরু ত্যাগ করা হয়" এই যে অতিরিক্ত ভয় দেখান কথাটি ইহা শাস্ত্রানুগতযুক্তিসঙ্গত কি না ? আপনি যাহাকে "গুরুবংশ" বলিতেছেন সেটি কাহার গুরুবংশ ? আপনি ত এখনও মন্ত্রদীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া কাহাকেও গুরু করেন নাই, সুতরাং আপনার সাক্ষাৎ নিজের গুরুবংশ ইহা ত হইতেই পারে না। ইহার ত্যাগে আপনার সাক্ষাৎ গুরুত্যাগের পাপ আসিবে কি প্রকারে ? এখন

তাহা হইলে বলিতে হইবে আপনার সাক্ষাৎ গুরুবংশ নহে, আপনার পিতার, পিতামহের গুরুবংশ হেতু পরম্পরা ভাবে আপনারও গুরুবংশ। ইহার ত্যাগে "গুরুত্যাগরূপ মহাপাপ" কথাটা বড়ই অতিরিক্ত ভয় দেখান নয় কি? দ্বিতীয়তঃ বিচার করুন, আপনি যাহাকে গুরুবংশ বলিতেছেন সেই বংশটিকে ধরুন কাশ্যপ গোত্রীয় বংশ, আর আপনার বংশটি ভরদ্বাজ গোত্রীয়, আপনি কি বলিতে চান যে আপনার বংশসৃষ্টির প্রথম হইতেই ভরদ্বাজ কাশ্যপকে গুরু করিয়াছিলেন এবং তদবধি আজ আপনি পর্য্যন্ত আপনার ভরদ্বাজবংশীয়েরা অবিচ্ছিন্নভাবে কাশ্যপবংশীয়কেই গুরু করিয়া আসিতেছেন, কোনও সময় কি বিচ্ছিন্ন হয় নাই? ইহা কি সম্ভব? না হয় বড় বেশী দশ পুরুষ, পনর পুরুষ, বিশ পুরুষ, ইহাও প্রায়শঃ অসম্ভব। এখনকার গুরুবংশ একপুরুষেই বহু দেখা যায়, তাঁহারাও গুরুবংশ হইয়া পড়েন। হরি! হরি! যে বংশ নির্ণয়ই হয় না তাহার ত্যাগে একেবারে "গুরুত্যাগ মহাপাপ" ইত্যাদি কথাগুলি বিষয়াসক্ত মূঢ় মানবদিগের প্রতি অতিরিক্তভাবে ভয় দেখান নয় কি? এবং অবোধ বিষয়াসক্ত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখাইয়া নিজের গুরুতর বিষয়াসক্তি নিবন্ধন জ্ঞানভজন গুরুর অযোগ্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানাদি শূন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তির "গুরুতা" ব্যবসা রক্ষার সুন্দর উপায় নয় কি?

প্রশ্ন—তবে কি উক্ত শাসন অলীক? গুরুবংশ ত্যাগ করিলে দোষ হয় এই কথাটি কি একেবারে মিথ্যা?

উত্তর—না, একেবারে মিথ্যা নহে, উহার সত্যতার স্থান আছে। স্থান বিশেষে কার্য্য বিশেষে অভিপ্রায় বিশেষে উক্ত কথাগুলি সত্যই, একেবারে মিথ্যা নহে। ত্যাগ করার অর্থ—"পিতার গুরু, পিতামহের গুরু, আমার কি? কিছুই নয়" ইত্যাদি মনে করিয়া যথাযোগ্য সম্মান অভিবাদন সৎকারাদি না করাই; ঐ প্রকার ব্যবহারে সাধারণ পাপ অপেক্ষা অধিকতর পাপ হয় ইহাই তাৎপর্য্য। এ স্থলে আমার গুরূপদিষ্ট মত এই যে যদি কেহ বিশেষ কারণবশতঃ অর্থাৎ ভগবৎ সাধন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাদি লাভের নিমিত্ত গুরুবংশীয় ভিন্ন অন্যত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করেন তাহা দোষের নহে। কিন্তু তিনি যেন পিতা পিতামহের গুরুবংশীয়দিগের সহিত যথাযোগ্য

পূজ্যপূজকতাভাবকে লঙ্ঘন না করেন, কেননা উহা তাঁহার সাধনপথে বিঘ্ন আনয়ন করিবে। মনে করা উচিত যে—

"শ্রেয়ো হি প্রতিবধ্নাতি পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ" (রঘুবংশ)।

এ স্থলে আরও একটি তাৎপর্য্য আছে, শাস্ত্রে দীক্ষামন্ত্রগ্রহণ মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকল মনুষ্যই যে তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবৎ সাধনাদির নিমিত্ত বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত মনে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে তাহা নহে। সাধারণ বিষয়াসক্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ যে দীক্ষা গ্রহণ করে তাহা চূড়াকরণ উপনয়নাদি দশসংস্কারের ন্যায় সামান্য কর্ত্তব্য বোধে করে, এইস্থলে কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত গুরুবংশীয়দিগের নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ বিষয়াসক্ত ব্যবহারিক তৎপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কেননা ইহাতে গুরুবংশীয়দিগের সহিত শিষ্যবংশীয়দিগের সাংসারিক ব্যবহারিক বৈষয়িক সৌহার্দ্য দৃঢ় থাকিয়া প্রাথমিক সাংসারিক জীবনের অনেকটা সুশৃঙ্খলাই থাকে, হঠাৎ বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা কমই থাকে। সুতরাং এই সাংসারিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই ঐ প্রকার শাসন বাক্য রচিত হইয়াছে। উহাতে পরমার্থের সম্বন্ধ বিশেষ নাই।

যাঁহারা পরমার্থ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ভগবদ্‌ভজন জিজ্ঞাসু তাঁহাদের পক্ষে উক্ত শাসন বাক্য নহে। তাঁহারা উপযুক্ত জ্ঞান সাধনাদি যাঁহার নিকট পাইবেন তাঁহাকেই গুরু করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই পরমশ্রেয়ঃ,—তাহা যোগ্য কুলগুরুবংশীয়ের নিকটই হউক বা অন্য কোন যোগ্যব্যক্তির নিকট হউক।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

উত্তম মঙ্গল অর্থাৎ পরম নিঃশ্রেয়স জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি বেদাদিশাস্ত্রে তাৎপর্য্যাদি জ্ঞানে নিষ্ণাত এবং পরব্রহ্মে সাধনাদি দ্বারা অপরোক্ষানুভবকারী এবং নিষ্ঠাবান্ গুরুকে আশ্রয় করিবে। এমন কি শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যবহারিক কুলগুরুবংশীয়জন যদি পরমার্থমার্গের উপযুক্ত না হন তাহা হইলে তাঁহাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণের সুস্পষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়।

গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

প্রশ্ন—তাহা হইলে যিনি তাদৃশ কুলগুরুবংশ হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সেই গুরু তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানী বা ভজনবিজ্ঞ নহেন, আর শিষ্য যদি ভজন-অনুরাগী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য?

উত্তর—এইরূপ হইলে সাধনমার্গে একপ্রকার বিপদই বটে; এইরূপ বিপদে পতিত হইলে অন্য কোনও উপযুক্ত শাস্ত্র পারদর্শী ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরুত্বে বরণ করিয়া ভজন শিক্ষাদি লাভ করিবেন এবং তাদৃশ মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি যেন অবজ্ঞা না আইসে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সৎসঙ্গাদি করিবেন। এইরূপ স্থলে সাধুমহাপুরুষদিগের নিকট এবং মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই উপদেশই আমি শ্রবণ করিয়াছি।

প্রশ্ন—অনেকে দেখি পূর্ব্ব মন্ত্র ত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈরাগী সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। কোনও কোনও গৃহস্থ গোস্বামীকেও ঐ প্রকার পুনরায় মন্ত্র দান করিয়া শিষ্য করিতে দেখা যায়, এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর—আমার গুরূপদিষ্ট মত এই যে যদি শাস্ত্রবিহিত ভজনোপযোগী ভগবন্নাম মন্ত্রাদিতে কোন ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া থাকেন, কিন্তু দীক্ষাদাতা গুরুর নিকট তাদৃশ ভজন জ্ঞান লাভের উপায় নাই, তাহা হইলে বিরক্ত সন্ন্যাসী হউন বা গৃহস্থ হউন যে কোন ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দীক্ষিত ব্যক্তিকে পুনরায় দীক্ষিত না করাইয়াও ভজন শিক্ষা দিয়া উপদেশ করিতে পারেন, গুরুতর বিশেষ কারণ ভিন্ন এরূপ ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার হঠাৎ দীক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নহি। অবশ্য বৈষ্ণবমতে "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" স্থলে পুনর্ব্বার দীক্ষার বিধান আছে। কিন্তু ইহা সে স্থল কি না তাহা বিশেষ বিচার্য্য।

প্রশ্ন—তাহা হইলে ত অজ্ঞ হউন বা ভজনানভিজ্ঞই হউন কুলগুরুবংশীয় কাহারও নিকট প্রথমতঃ মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া পরে কোথায়ও ভজনবিজ্ঞস্থলে ভজনাদি শিক্ষা করাই ত ভাল? কেন না কুলগুরু ত্যাগও হইল না অথচ ভজনেরও কোন হানি হইল না।

উত্তর—না। ইহা ভয়ানক ভুল ধারণা। এখানে একটি সামান্য কথা বলি,

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্" অর্থাৎ "শরীরে কর্দ্দম লেপন করিয়া পুনরায় ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা দূর হইতে কর্দ্দম স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ," পাপ করিয়া প্রক্ষালন জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা অপেক্ষা পাপ না করা কি শ্রেয়ঃ নহে? আমি পূর্ব্বে যে তাদৃশ ব্যক্তির শিক্ষাগুরুর ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি তাহা নিতান্ত বিপন্ন স্থলে। তাই বলিয়া পরমার্থে তাদৃশ বিপদ নিজেই আহরণ করিবে! কি সর্ব্বনাশ! যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানসাহায্যে অপরোক্ষভজনবিজ্ঞানলিপ্সু, হায়! তাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞ ভজনরহিত গুরু করা কি ভয়ানক বিপদ, কি বিড়ম্বনা, কি সর্ব্বনাশ তাহা আপনি কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না। তাই অত সহজে অত বড় ভুল ধারণা করিতেছেন। হরি! হরি! আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন যে গীতা ভাগবতের দুই চারিটি শ্লোকের একটু অন্বয় করা, একটু গল্পাদি করিয়া ব্যাখ্যা করা শুনিলেই জ্ঞান লাভ হইল, আর একটু ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া দুই একটি ধ্যান, তিনবার প্রাণায়ামের একটু নাক টেপা, কোন্ আঙ্গুলের কর ধরিয়া জপ আরম্ভ করা, আর মালা তিলক ফোঁটার একটা দলাদলি অর্থাৎ দুই কণ্ঠী কি তিন কণ্ঠী মালা পরিব, বংশপত্র তিলক কি বটপত্র তিলক ধারণ করিব ইত্যাদি শিখিলেই ভজন হইল। সুতরাং যে কোন বৈরাগী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে অথবা শ্লোকশাস্ত্রব্যাখ্যাকার কোনও ব্রাহ্মণ গোস্বামী আদি গৃহস্থের নিকট ঐ সকল কিছু শিখিয়া লইলেই ত ভজন পাওয়া যাইবে, সুতরাং অজ্ঞ হউন ভজনশূন্য হউন বা ভক্তিবিরোধীই হউন, কুলগুরু ত্যাগ করি কেন? ইহাই যদি আপনার ভজন শিক্ষা, ভজনজ্ঞান লাভ মনে করেন, তাহা হইলে আমার মতও ইহাতে আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ভজনবিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা যাঁহাদের নাই, মোটামুটি ভাবে একটি দীক্ষা মন্ত্রাদি গ্রহণ করাই মাত্র যাঁহাদের প্রয়োজন, যৎকিঞ্চিৎ ঐ রকম ভজনের দুই চারিটি কথা জানিলেই বা সামান্য যৎকিঞ্চিৎ করিলেই ভজন সাধন হইল ইহাই যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে কুলপরম্পরা গুরুবংশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাই আপাততঃ পক্ষে ভাল।

সাধুগুরুতে শ্রদ্ধালাভের উপায়

প্রশ্ন—অনেক সময়ে আমাদের সাধুগুরুতে শ্রদ্ধাটি দৃঢ় হয় না, এই শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় কিসে?

উত্তর—শ্রদ্ধার উদয় হয় সাধু মহাত্মার কৃপার প্রভাবে। সাধুমহাপুরুষ বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে পারে। এই কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে ত্রুটিই অকৃতজ্ঞতা বিষকে উদগীরণ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাকে শুষ্ক করিয়া দেয়। যেমন মনে করুন, কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে উত্তম কতকগুলি উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিলাম, সেই শিক্ষার ফলে আমার মনঃপ্রাণ কিছু কিছু উন্নতির দিকে অগ্রসর হইল, আমি অপরকে উপদেশ দান করিতেছি, নানা প্রকারে বক্তৃতা পাঠাদি দ্বারা সেই শিক্ষিত বিষয়টির প্রচার করিতেছি, কিন্তু যে মহাপুরুষের কৃপায় এই শিক্ষাটি প্রাপ্ত হইয়াছি, শত শত প্রচারের মধ্যে, আমার পাঠ বা বক্তৃতার গলাবাজীর মধ্যেও একবার সেই মহাপুরুষের নামটিও উচ্চারিত হইতেছে না, যাঁহার কৃপায়, যাঁহার উপদেশে আমার এই উৎকর্ষ তাঁহার মহিমা একবারও আমার পাঠ বক্তৃতায় বাহির হইতেছে না। কি জানি লোক সমাজে জ্ঞানী পণ্ডিত আমি আবার অপরের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছি ইহা যদি ব্যক্ত হয় তাহা হইলে ত আর আমার মহিমা প্রকাশ পাইবে না। আমার উৎকর্ষ কিছু যদি কমিয়া যায় এই ভয়ে **অকৃতজ্ঞতার ভার বহন করিতে থাকিলে শ্রদ্ধা আপনিই নাশ পাইতে থাকিবে।** দেখুন, অন্ততঃ মনুষ্যের সাধারণ কর্ত্তব্য জ্ঞানের, যেমন "যার খাই তার গাই" এই নীতির অনুসরণ করিয়াও সাধু মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে সাধারণভাবে যতটুকু আমরা উপকৃত হই ততটুকু পরিমাণেও ত তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন একটু শ্রদ্ধা ভক্তি, তাঁহাদের গুণমহিমা কীর্ত্তন, তাঁহাদের সম্মান মর্য্যাদা রক্ষণ প্রভৃতি করা আমাদের কর্ত্তব্য? এই কর্ত্তব্যের ত্রুটি যাঁহার হয় না **সেই ভাগ্যবানই ক্রমশঃ সাধুগুরুতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন।** হায়! সৎ মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে আমরা যে অলৌকিক

কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করি সাধারণ জ্ঞানে তাহার মূল্যবোধ আমাদের না থাকিলেও তাঁহাদের মিষ্ট মধুর সম্ভাষণ, হিতাশংসন, বিনয় নম্রতা সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহার এবং সদুপদেশাদি যাহা লাভ করি তাহা ত সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানেও বুঝিতে পারি। কিন্তু দম্ভ অভিমান ভরা হৃদয়বৃত্তি কেবল ভোগ বিলাস তৎপরতাময় পশুত্বের আবরণে আবৃত থাকায় বুঝিয়া ও বুঝি না। আমার মনে হয় **সাধুমহাপুরুষে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হইলেই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।** এই কর্ত্তব্য জ্ঞান যাঁহাদের সহজে হয় না তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্রে সাধুগুরু বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কি প্রকার ভাষণ করিতে হয়, তাঁহাদের সমীপে উঠা বসা চলা ফেরা কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রানুশীলন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নিজে পঠন অথবা শ্রবণ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয় এবং তদাচরণে যত্নবান্ হইতেও হয়, তাহা হইলে সাধুগুরুতে শ্রদ্ধাভক্তির দৃঢ়তা আসে। আমরা ভ্রান্ত, অজ্ঞ, অথচ শিক্ষাভিমানী। মনে হইতে পারে,—সাধুগুরুর নিকট উঠা বসা চলা ফেরা প্রভৃতি, কথা বলা আদান প্রদানাদি ব্যবহার করা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য আবার শাস্ত্রানুশীলন, তাহাও আবার পুনঃ পুনঃ পঠন বা শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে? হরি! হরি! ধর্ম্মকর্ম্ম পথে কতকগুলি গোঁড়ামী আছে যাহা শুনিলে হাসি পায়। কেন বাপু, আমরা সাধুগুরুর নিকট উঠিতে বসিতেও শিখি নাই? ইত্যাদি দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া **সৎমহাপুরুষের কৃপার কথা, তাঁহাদের কৃত উপকারের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে নমস্কার করুন, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করুন, তাঁহাদের মহিমা গুণ কীর্ত্তন করুন,** শ্রদ্ধা ভক্তি দৃঢ় হইবে। অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভাগবতী ভক্তির স্থান নাই ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। কৃতজ্ঞ হৃদয় ধীরে ধীরে কোমল হয়। কোমল হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অচিরে ফল পুষ্পে শোভিত হয়।

জপরহস্য

এখন জপ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি শুনুন, জপটি কেমন করিয়া করিলে ঠিক কার্য্য করা হয় তাহা জানা প্রয়োজন। শ্রীভগবন্নামমন্ত্রাক্ষর বা বীজমন্ত্রাদির সহিত জীবের কোন প্রকার সম্বন্ধ ঘটিলেই জীব ক্রমশঃ কৃতার্থতার দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। বিশেষতঃ সৎ মহাপুরুষ প্রদত্ত নাম মন্ত্রাদির ত কথাই নাই। তবে শাস্ত্রদৃষ্টে এবং সাধক সম্প্রদায়ের আচরণে বিশেষ বিশেষ সাধনাবস্থায় এই জপের বিভাগ করা হইয়াছে। জপ ত্রিবিধ, **বাচিক, উপাংশু** এবং **মানসিক**। ওষ্ঠ জিহ্বা স্পন্দন পূর্ব্বক অক্ষরগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়া খুব লঘুভাবে নিজের শ্রুতিগোচর হইলেই বাচিক জপ বলা যায়। আর কেবলমাত্র জিহ্বার অগ্রভাগ ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া যাহা নিজের কর্ণেও শ্রবণ হয় না এমন ভাবে উচ্চারিত হইলে উপাংশু জপ বলা যায়। দীক্ষাপ্রণালীতে লব্ধ মন্ত্রবীজাদির সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। তদ্ভিন্ন (অর্থাৎ দীক্ষালব্ধ নহে যে ভগবন্নামাদি তাহা ভিন্ন) অন্যের শ্রুতিগোচর হয় এমন ভাবে স্ফুটরূপে শ্রীভগবন্নাম মন্ত্রাদির উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে, আর মাত্র ওষ্ঠ চালনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উচ্চারণ, যাহা নিজশ্রুতিগোচর হয়, তাহাই উপাংশু জপ। "মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ। শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ। কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥"

এখন বিবেচ্য এই যে উক্ত তিন প্রকার জপের মধ্যে কোন্ জপ শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ সকল প্রকার জপই শ্রেষ্ঠ। প্রথমেই বলিয়াছি বিশেষ বিশেষ সাধকের সাধনাবস্থায় অধিকারী বিশেষে এই তিনেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ত্রিবিধ জপের আধ্যাত্মিক গুণের বিভেদ কি এবং বিভিন্ন প্রকার জপে

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কি কি গুণ আছে, তাহার শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবই বা কি, একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি, শুনুন। ত্রিবিধ জপের মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য যথেষ্টই আছে। তাই শাস্ত্রে দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।" একমাত্র জপের দ্বারায় সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে কোনও প্রকার সন্দেহের অবসর নাই নিশ্চয়ই জানিবেন।

বাচিক জপ

প্রথমতঃ বাচিক জপের শ্রেষ্ঠতার কথা শুনুন। অপৌরুষেয় সাধনশক্তি এবং সিদ্ধশক্তি অনাদি কাল হইতেই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই মন্ত্রাদিতে নিহিত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপালব্ধ এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া সাধককে সিদ্ধি দান করে। মন্ত্রের সাধন সম্পত্তি একমাত্র জপই। স্নান আচমন আসন প্রাণায়াম ধারণা ধ্যান ব্রত নিয়ম ইত্যাদি জপেরই অঙ্গ; এই অঙ্গসমূহযুক্ত জপ অচিরেই সিদ্ধি প্রদান করে। ইহা সাধারণ মন্ত্রাদির কথাই বলা হইল। কিন্তু **সদ্গুরু শ্রীপাদপদ্ম কৃপালব্ধ শ্রীভগবন্নাম বীজমন্ত্রাদি কেবল জপরূপ সাধন সম্পন্ন হইলেই সাধককে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন।** কর্ম্ম বা আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বা আত্মানাত্ম বিবেক প্রভৃতি যে সকল সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার ফলসমূহ একমাত্র জপসাধকের প্রাথমিক শুদ্ধ বাচিক জপেই সিদ্ধ হয়। "অগ্নির্ব্বৈ বাগ্‌ভূত্বা প্রাবিশৎ" এই একটি শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে জীবের মনুষ্যাদি দেহে যে বাগিন্দ্রিয়টি আছে তাহা অগ্নিই। এই বাক্ রূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্নিরই অংশ। আমাদের বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগ্‌বিশৃঙ্খলায় অর্থাৎ অপরিমিত বাক্‌চালনায় শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়, মন যত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রাণের গতি অসমান এবং অস্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খল হয়, তত দুর্ব্বল বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অন্য কাহারও চালনায় সহজে হয় না। আবার এই অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি রহিত হইয়া

স্বাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়। বাচিক জপ দ্বারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টি লাভ করিয়া প্রাণশক্তিকেই বর্দ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগসাধনের মধ্যে প্রথমেই "যম" নামক সাধনে মৌনাবলম্বনটি বিহিত হইয়াছে। মৌনব্রতাবলম্বনে প্রাণাগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। প্রাণের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ক্ষুধাতৃষ্ণাদির বেগ সহনে অধিকার লাভ হয়, ধৈর্য্যশক্তি বাড়ে। কিন্তু শুদ্ধ মৌনব্রত হইতেও এই বাচিক জপ কত অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর তাহা একবার ভাবুন। শুদ্ধ মৌনব্রতে কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্নি বর্দ্ধিত হইলেও উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইতে পারে না। এই জন্য যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের মধ্যে "নিয়ম" নামক সাধনের মধ্যে "স্বাধ্যায়" এবং জপের দ্বারা পরিমিত বাগিন্দ্রিয় চালনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। **জপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়।** জপই প্রাণাগ্নির পুষ্টিকর আহার্য্য। এখন দেখুন যাঁহারা বাচিক জপে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের অযথা বাগিন্দ্রিয়ের অপরিমিত পরিচালনা হয় না, মৌনের কার্য্য আনুষঙ্গিকই হইতে থাকে। অথচ শুদ্ধ মৌনাবলম্বনে একেবারে বাগিন্দ্রিয়ের পরিচালনার অভাবে যে প্রাণাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়াও স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইতে পারে না, কিন্তু ঈষদুচ্চারিত জপের দ্বারা প্রাণাগ্নিতে যথাযোগ্য পরিমিত আহুতিদানের কার্য্য হইতে থাকায় সেই প্রাণাগ্নি হ্রাস পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হয় সাধকের প্রাণাগ্নিও তেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রকারে বাচিক জপটি মৌন এবং স্বাধ্যায়ের ফল প্রদান করে। অধিক কথা কি এই প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে। বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি ব্যাপারাদি এক প্রাণেরই অধীন। "প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি" এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই। বাচিক জপ দ্বারা প্রাণাগ্নিরই সাধন হয়, ফলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের স্থিতি ব্যাপারাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়া সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থির হয় এবং প্রাণের অনুগতই হয়।

ইন্দ্রিয়বর্গ অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইলে চঞ্চল মনকে অধিকতর চঞ্চল করিয়া

তুলে। মন যত চঞ্চল হইতে থাকে ইন্দ্রিয়বর্গও ততই চঞ্চল মনের সাহায্যে প্রাণের স্থিতিশক্তিকে ক্রমশঃ লুণ্ঠন করিয়া নিঃস্ব করিয়া তুলে। নিঃস্ব প্রাণটি শক্তিশূন্য হইয়া যাবতীয় দুঃখে হাবুডুবু খাইতে থাকে। এমন সময়ে যদি কোন প্রবল অনুকূল শক্তির সাহায্যে প্রাণটি বলশালী হইতে পারে তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দস্যুদিগকে দমন করিয়া দস্যুরাজ মনকে বান্ধিয়া নিজের অধীন করিয়া রাখিতে পারে এবং পুনরায় দস্যুবর্গ কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা রহিত হইয়া শান্তিময় সুখরাজ্য স্থাপনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে বাচিক জপে শরীরের মধ্যে প্রথমতঃ সমস্ত ইন্দ্রিবর্গের উপর একটা সাড়া পড়িয়া যায়, যতই বাচিক জপ সুস্পষ্ট এবং দ্রুত হইতে থাকে ততই উন্মার্গগামী ইন্দ্রিয়বর্গ বাধা প্রাপ্ত হয়। বিপথগামী অসংযত অশ্ব যদি হঠাৎ কোন গুরুতর প্রতিকূল বাধা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে যেমন চকিত হইয়া উঠে এবং নিজের বাসস্থান অভিমুখে ছুটে সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বর্গও নিয়মিত বাচিক জপে চকিত হইয়া নিজের মূল স্থান প্রাণাগ্নির দিকেই ছুটিতে থাকে, এদিকে বাচিক জপের প্রভাবে বীর্য্যশালী প্রাণও তাহাদিগকে নিজের অধীনে সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠে। এই বাচিক জপের দ্বারাই বিশৃঙ্খল উন্মার্গগামী রাষ্ট্রবিপ্লবী ইন্দ্রিয়সেনানীর উপর বীর্য্যশালী প্রাণ প্রথমতঃ একটি সংঘর্ষ উপস্থিত করে। কারণ বাগিন্দ্রিয়ের সাধনে শারীরিক প্রাণাগ্নি স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইয়া একটা সাত্ত্বিকভাবের তেজঃ ধারণ করে এবং তেজঃ কণাকারে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বার দিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মূলে বর্ষণ করে। তখন ঐ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই বাচিক জপই ইন্দ্রিয়গণের বিপ্লবকর বিষয়ভোগে বাধা দেয় এবং তাহাদিগকে চকিত সজাগ করিয়া তুলে। ক্রমশঃ বাচিক জপে সংঘর্ষ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে ইন্দ্রিয়বর্গও ভয় চকিত হইতে হইতে অতি তীব্র বিষয়ভোগানুরাগও পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং অতি সহজে দুর্দ্দমনীয় মনকে বশীভূত করিবার প্রধান উপায় শাস্ত্রবিহিত বাচিক জপ। ইহা একপ্রকার শরীরস্থ প্রাণাগ্নিরই উপাসনা। শ্রীগীতার "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" স্মরণীয়। অবশ্য ইহা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই শিক্ষণীয়।

উপাংশু জপ

উপাংশু জপ বলিতে ঠিক মানসিকও নয়, আবার বাচিকও নয়। ক্বচিৎ ক্বচিৎ অতি লঘুতর ভাবে জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হইয়া যে মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় তাহাকেই উপাংশু জপ বলা যায়। পূর্ব্ব কথিত বাচিক জপের সংঘর্ষ দ্বারা বিষয়ভোগে উদ্দামগতি বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়বর্গের বিপ্লবভাব দমনের পর উপাংশু জপ দ্বারা তাহাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনরায় ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদনে উন্মুখ করাই উপাংশু জপের কার্য্য। যেমন রাষ্ট্রবিপ্লবী সেনা সমূহকে দমন করিলেই মাত্র হয় না, পুনশ্চ তাহাদিগকে যথাযোগ্য আহার্য্য ভোগ্যাদি দিয়া সুশান্ত করা এবং তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া পুনরায় রাজানুগত কার্য্যে নিযুক্ত করাই যেমন প্রয়োজন, ঠিক এই প্রকার বাচিক জপ দ্বারা চঞ্চল ইন্দ্রিয় মন দমন হইলেও তাহাদিগকে সুশান্ত এবং পুষ্ট না করিলে তাহারা ভগবদুন্মুখ হইতে পারে না। জপসাধনের দ্বিতীয় স্তরে এই উপাংশু জপই ইন্দ্রিয়বর্গের ভগবদ্ ধ্যানধারণাদি বিষয়ে যোগ্যতা আনয়নের উপযুক্ত একপ্রকার শান্ততার সহিত স্নিগ্ধতা বর্ষণ করিয়া থাকে। তাহারই ফলে ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ যেন একটা অভিনব আনন্দপ্রদ পুষ্টতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ জপ জপ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে থাকে। প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ এবং মনের গাঢ় স্থিতি সম্পাদকই এই উপাংশু জপ। প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের এই প্রকার স্থিতি লাভ হইলেই সাধক উপাস্যের ধ্যান ধারণায় অধিকারী হইতে পারে। উপাংশু জপে এই অধিকার লাভ হয়। মনের অতিরিক্ত চঞ্চল অবস্থায় বাচিক জপ এবং মন কিঞ্চিৎ স্থির হইলে উপাংশু জপ বিশেষ ফলপ্রদ।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত এই উপাংশু জপ করিতে করিতে জপ যখন ঠিক হয় তখন মূলাধারে মিত্র নামক যে অগ্নি অবস্থান করিতেছে তাহাতে প্রাণ শক্তিটি নিবদ্ধ হইয়া এক প্রকার মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতে থাকে। এই মৃদু স্পন্দনই মানসিক জপে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শ্রবণ করা যায়। এই উপাংশু জপে যোগাঙ্গের প্রাণায়াম অপেক্ষাও অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রাণমনের সংযোগ সম্পন্ন হয়, এবং মনটি মন্ত্রাদি জপ বিষয়ে অতি আকৃষ্ট হইয়া অতিশয় স্নিগ্ধ কোমলতায় ভরিয়া উঠে।

মানস জপ

"ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্ বর্ণং পদাৎ পদং। শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥" অর্থাৎ মন্ত্রাক্ষর শ্রেণীর একবর্ণ হইতে ক্রমশঃ অন্যবর্ণ, আবার তাহা হইতে অন্য বর্ণ এই প্রকারে মন্ত্রের বর্ণগুলির অচঞ্চল মনে চিন্তনের অভ্যাস, অথবা এক একটি পদ হইতে অন্য পদের ক্রমশঃ চিন্তনের অভ্যাসকেই মানস জপ বলে। চিন্তনের অভ্যাস বলায় এই প্রকার বর্ণের বা পদের স্থির বুদ্ধির দ্বারা পুনঃ পুনঃ মানসিক আবৃত্তি করার নামই মানস জপ। এই প্রকার স্থির বুদ্ধি দ্বারা মন্ত্রস্থ বর্ণ বা পদের অর্থের মানস চিন্তনের আবৃত্তি করিতে হইবে। "যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ", তাদৃশ মানস জপটি ধ্যানেরই তুল্য। বস্তুতঃ উহাই মন্ত্রধ্যান। প্রথমতঃ বাচিক জপ দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়-বর্গ সংযতোন্মুখ হইলে উপাংশু জপ আশ্রয় করিয়া মনের স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইলে এই মানসিক জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ যখন সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্মদ্বার উদ্ঘাটিত হইতে থাকে তখন সাধকের মূলাধারে স্থিত মিত্র নামক অগ্নিতে নিবদ্ধ প্রাণ অতি গাঢ় এবং অতি দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে। তখন সাধক যোগি-গণ দুর্ল্লভ নাদধ্বনি শ্রবণে পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ নাদ মধুর হইতে সুমধুর এবং স্নিগ্ধ হইতে অতি স্নিগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য চক্রসমূহ ভেদ করিয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া সাধককে নিরন্তর কোনও অপার্থিব আনন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখে।

মানস জপে প্রথমতঃ মন্ত্রের অক্ষর শ্রেণীকে কিঞ্চিৎ পীতাভশুভ্রবর্ণ চিন্তা করিতে হয়। ক্রমশঃ ঐ অক্ষরগুলিকে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে একত্র শ্রেণীবদ্ধ একটি বিদ্যুৎ রেখা রূপে চিন্তা করিতে হয়। তদনন্তর ঐ মন্ত্রাক্ষর-শ্রেণী বিদ্যুল্লতার ন্যায় নিজের শরীরাভ্যন্তরস্থ মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। এই প্রকার মন্ত্রাক্ষর সাধন বড়ই গোপ্য, তথাপি কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিলাম। এই মানস জপের ব্যাপার অতীব রহস্যপূর্ণ। ইহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হয়; তখন এক মাত্র মন্ত্র প্রভাবে নানাপ্রকার অদ্ভুত শক্তি লাভে সাধক কৃতকৃতার্থ হন।

তদনন্তর মন্ত্রসমাধি লাভ হয়। অহো! "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স স্বয়ং হরিঃ" এই বাক্য সার্থক হয়। ইহা অতি রহস্যপূর্ণ, বড়ই গোপনীয়। এই রহস্য ব্যক্ত করিবার জন্য আমার মনঃ প্রাণ যেন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। তথাপি অতিকষ্টে এই চাঞ্চল্যকে সংযত করিয়া এখানে ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহার অত্যদ্ভুত প্রভাবময় কৃপাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শে এই প্রকার ত্বদীয় সাধন রহস্যোদ্ঘাটনে উন্মাদনা বাড়াইতেছে সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে "মাং মদীয়ং জুহোমি" আত্মমনঃপ্রাণাদি সমস্তই সমর্পণ করিতেছি। এই মানস জপ সম্বন্ধে শ্রীগুরূপদেশে যাহা কেবল অনুভবের বিষয় এবং এই সাধনের আরও উচ্চ উচ্চ যে সকল সোপান তাহা এখানে অব্যক্তই রহিল।

পুনশ্চ বাচিক জপের কথা কিছু বলি, কারণ প্রথমতঃ বাচিক জপই পরম শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ব্যক্তিগণ, এমন কি অনেক নবীন সাধক, শ্রীগুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্ত্র জপাদি সাধনে রত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন্ত্র জপকালে চিত্ত কেবল নানাপ্রকার বিষয়ের চিন্তনে বিক্ষিপ্তই হইয়া উঠে, অথবা নিদ্রা-কর্ষণ হয়। হায়, ইহার একমাত্র কারণ মন্ত্র জপাদি বিষয়ে সদ্গুরুর উপদেশের অভাব এবং সাধনাভিজ্ঞ সৎ মহাপুরুষের প্রকৃত সাধনোপদেশ তাঁহাদের কর্ণ-কুহরগত হয় না। হায়, তাঁহারা "জপ" শব্দটি পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া একেবারে বড় কথা "স্মরণ" "স্মরণ" "মন্ত্রস্মরণ" ইত্যাদি ব্যবহার করেন। জানি না ইহা কি অজ্ঞতা, কি অনধিকারচর্চ্চা। যাহা হউক আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, যাঁহাদের মন্ত্রস্মরণে চিত্তের বিষয় চাঞ্চল্য অথবা নিদ্রাকৃষ্টতাই স্মরণের ফল, তাঁহারা যেন স্মরণের স্থানে জপের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে আবার একটু বাচিক যোগ করিয়া মন্ত্রের সাধন করেন, নিশ্চয়ই ফল পাইবেন; বিশেষতঃ বৈষ্ণব মহোদয়গণের মধ্যে যদি কেহ ঐ প্রকার স্মরণের জালে পড়িয়া জড়ীভূত হইতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের "স্মরণ" "রাগ" ইত্যাদি একটু কমাইয়া "ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্" কথাটিকে তাঁহারা হৃদয়ে হার করিয়া ধারণ করুন।

আমরা সাধারণ ভাবে বাগিন্দ্রিয়ে যে সকল শব্দ উচ্চায়ণ করি সেই বাচিক শব্দোৎপত্তির রহস্য শ্রবণ করুন। আমরা বাচিক যাহা উচ্চারণ করি তাহা

মূল হইতে ক্রমশঃ চারিটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বাক্য রূপে প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ পরা, দ্বিতীয়াবস্থায় পশ্যন্তী, তৃতীয়াবস্থায় মধ্যমা, চতুর্থাবস্থায় বৈখরী। আমরা মুখে যাহা উচ্চারণ করি তাহা এই চতুর্থাবস্থাপ্রাপ্ত বৈখরী। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন অবস্থা আমাদের শরীরাভ্যন্তরে হয়। শরীর মধ্যে আধার চক্রে স্থিত মিত্র নামক অগ্নিমণ্ডল এবং বরুণ নামক সোমমণ্ডলে নাদবান্ প্রাণ সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছে। আমরা কর্ণপুট আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রোত্রবৃত্তি নিরোধ করিলে আধারচক্রস্থিত প্রাণের এই নাদ ধ্বনিটি অনুভব করিতে পারি। ইহাই পরাখ্য নাদ। এই পরাখ্য নাদটি ইচ্ছার অভিঘাত প্রাপ্ত হইলে নাভিদেশে মণিপুর নামক চক্রে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মনোময় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে "পশ্যন্তী" বলা যায়। তদনন্তর যখন ঐ নাদটি হৃদয় দেশে বিশুদ্ধি নামক চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি সংস্থা অর্থাৎ উচ্চারণ করিব ইত্যাদি বিচারযুক্ত হইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই "মধ্যমা" নাম ধারণ করে। তারপর করণবিশদ অর্থাৎ উচ্চারণের স্থান তালু কণ্ঠ দন্ত মূর্দ্ধা ওষ্ঠ ইত্যাদির প্রযত্নে নির্ম্মল হইয়া "বৈখরী" নাম ধারণ করে। এই চতুর্থাবস্থা বৈখরী শব্দই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন শব্দের আর যে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা নামক তিনটি অবস্থা আছে তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ পায় না, উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত যোগিগণের নিকট প্রকাশ পায়। মোটামুটি তাৎপর্য্য এই যে আমাদের উচ্চার্য্য শব্দ প্রাণ মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় এই চারি স্থানেই ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা মাত্র একটির খবর রাখি, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রূপে উচ্চার্য্য শব্দ যাহা বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাই মাত্র আমরা জানি, প্রাণে যে শব্দের ক্রিয়া হয় এবং মনে যে ক্রিয়া এবং বুদ্ধিতে যে ক্রিয়া হয় তাহা জানি না।*

এখন দেখুন সৎ মহাপুরুষ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুগামিনী শ্রীভাগবতী ভক্তি জীবে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অপ্রাকৃত শব্দাত্মক শ্রীভগবন্নাম মন্ত্রাদিকে আশ্রয় করিয়াই থাকেন। সাধক ব্যক্তি গুরুকৃপালব্ধ সেই মন্ত্রাদি জপ সাধনে তৎপর হইলে ঐ ভক্তিদেবী সাধনরূপেই প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের

*যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তীতি ত্রিষষ্টিং বর্ণানন্তঃপ্রকটকরণৈঃ প্রাণসঙ্গাৎ প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাং বাচং বক্তে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে॥

বৃত্তি সমূহে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বাচিক জপে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়বর্গকে অপ্রাকৃত ভাগবতী শক্তিতে পূর্ণ করিয়া ক্রমে উপাংশু জপাবস্থায় প্রধানতঃ মন এবং বুদ্ধিকে এবং অক্ষর ধ্যানরূপ মানসিক জপে আধারচক্রস্থিত প্রাণকে পূর্ণ করিয়া মানসিক জপের সমাধি দশায় শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থকে অর্থাৎ শুদ্ধ জীবচৈতন্যকে ভাগবতী ভক্তি শক্তির ফলস্বরূপ প্রীতিবৃত্তিতে পূর্ণ করে। এই ভাগবতী প্রীতিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যের পূর্ণতাই জীবের সর্ব্ব সাধন সাধ্যের শিরোভূষণ পরম পুরুষার্থ। শ্রীভগবন্নামাদি জপের এই অপূর্ব্ব মহিমা। এই বাচিক জপই এক প্রকার কীর্ত্তন বলিলেও হয়। শুদ্ধ শ্রীভগবন্নামাদির উচ্চারণই কীর্ত্তন।

ভগবন্নাম জপ

সংসার সমুদ্রে পতিত ক্লান্ত বিপন্ন জীবের মঙ্গলময় ভেলাস্বরূপ **নামমন্ত্র** যাহা সাধুগুরুকৃপায় লাভ করিয়াছেন, সংসারে রোগ শোক মান অপমান অভাব ভাব ইত্যাদি তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিমুহূর্ত্তে সেই **গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র ভেলা** দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করুন, রক্ষা পাইবেন। যাঁহারা ভেলা ছাড়িয়া হাত পা আছড়াইবার মত কেবল হা হুতাশ করে বা নানা প্রকার নিজের পৌরুষ প্রতিকার চেষ্টা করে তাহারা প্রায়শঃ ডুবিয়াই মরে। যাহারা ভেলা ধরিতে শিথিল হয় তাহারা কষ্টই পায়। সম্পদে বিপদে কখনও নামমন্ত্ররূপ ভেলা পরিত্যাগ করিবেন না।

ভগবানের নাম **সাক্ষাৎ ভগবানই** ইহা মনে করিয়া নাম জপ করিবেন, **নাম পরমানন্দস্বরূপ**, সর্ব্বদা জপের সময় লক্ষ্য রাখুন আপনার চিত্তে **বিমল আনন্দভাব** উদয় হইতেছে কি না। যদি আপনার হৃদয়ে আনন্দ না পান তাহা হইলে **নামের নিকট প্রার্থনা করুন**, "হে নাম, হে চিন্তামণি, হে পরমানন্দ-স্বরূপ, আমার হৃদয়ে তোমার বিমলানন্দজ্যোতিঃ প্রকাশ কর", নাম জপের সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা **করুন**। নাম করিতে করিতে **চিন্তা করুন**, নামে ভগবানের **রূপ** প্রকাশ করে, নামে ভগবানের **গুণ** প্রকাশ করে, নামে ভগবানের **সপরিকর লীলা** প্রকাশ করে; হায়, আমি ত ভগবন্নাম গ্রহণ

করিতেছি, আমার নিকট ত ভগবানের "রূপ গুণ লীলা" প্রকট হইতেছে না। হে নাম, আমাকে দয়া কর, তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর। নাম জপের সময় **চিন্তা করুন,** নাম ভগবানের অক্ষররূপী সাক্ষাদ্ অবতার। **ওষ্ঠ জিহ্বা কিঞ্চিৎ চালনাপূর্ব্বক পরিস্কার নামাক্ষরগুলি উচ্চারণ করুন।** নামের অক্ষরগুলিকে **কিঞ্চিৎ শুভ্র বিদ্যুদ্‌বর্ণ** ভাবনা করিতে চেষ্টা করুন। চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলে ধীরে ধীরে **নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত** সমান সংখ্যা রাখিয়া নাম গ্রহণ করুন। তন্দ্রাদোষ থাকিলে **চক্ষু মুদিয়া জপ করিবেন না, চক্ষু মেলিয়া অক্ষরের প্রতি মন রাখিয়া স্পষ্ট বাচিক জপ করুন। মিথ্যা বঞ্চনা কাপট্য নির্দ্দয়তা হিংসা ঈর্ষা মাৎসর্য্য প্রভৃতি হীনবৃত্তিগুলির উপর লক্ষ্য রাখুন, সর্ব্বোপরি লোকঠকান "ভজনের বাহ্যিক ভানে ক্ষুদ্রস্বার্থ" পরিহার করিতে চেষ্টা করুন। নাম প্রদাতা সাধুগুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে কৃতজ্ঞতার সহিত কৃপা প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে সাধনের সর্ব্ববিধ অন্তরায় দূরীভূত হইবে।*** প্রথমতঃ অশুদ্ধ চিত্তে অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত তন্দ্রাদি দোষযুক্ত অবস্থায় নামজপে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিবার চেষ্টায় কোনও ভগবদ্-রূপের বা লীলার স্মরণ মনন ধ্যানাদি প্রাথমিক সাধকের হিতকর হয় না। তাঁহাদিগের মনকে একাগ্র করিবার সুষ্ঠু উপায় নামাক্ষরগুলি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ হইতেছে কি না ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাহা হইলে এই প্রকারে নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত একাগ্র হইবে। এই প্রকার নামাক্ষর চিন্তন সহকারে কিঞ্চিদ্ ওষ্ঠ চালনা পূর্ব্বক নাম জপ অভ্যাসে সাধকের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে এক প্রকার স্পন্দন হইতে থাকে, ঐ অপূর্ব্ব স্পন্দনে সমস্ত শরীর মন ইন্দ্রিয় সকলেই একমুখী হইয়া উঠে। এবং যোগীদিগের যোগসিদ্ধ দশায় যে সহস্রার সুধা ক্ষরণ পরমানন্দাস্বাদন, তাহা ঐ প্রকার নামজপ সম্ভূত স্নায়ুমণ্ডলীর স্পন্দনের ফলেই সম্পন্ন হয়। **ইহা অতি সত্য প্রত্যক্ষ ফল।**

প্রশ্ন—আচ্ছা, প্রায়শঃ দেখা যায় বৈষ্ণবেরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রেরই জপে অধিক জোর দেন। ইহার কিছু গূঢ় রহস্য আছে কি ?

উত্তর—হাঁ, নিশ্চয়ই আছে। তবে সদ্‌গুরুমুখেই ইহার বিস্তৃত রহস্য শ্রবণীয়।

* শ্রীপাদ গ্রন্থকার কৃত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের নামকীর্ত্তন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জগতে দেব মনুষ্যাদি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি তরুলতা প্রভৃতি জঙ্গম স্থাবর দেহধারী যাবতীয় জীবচৈতন্য এবং ঐ জীবচৈতন্যের তত্তৎ ভৌতিক দেহ এবং ভোগ্য ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের অনন্তরূপে যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের প্রবাহ চলিতেছে, অনন্তরূপে উদ্ভব, অনন্তরূপে বর্দ্ধন, অনন্তরূপে ইহাদের আদান প্রদান গমন স্থিতি, ভোক্তা ভোগ্য ভোগ ক্রিয়াদি অনন্ত ব্যবহার, আবার অনন্তরূপে ইহাদের সঙ্কোচ, অনন্তরূপে নিরোধ সংহরণ প্রভৃতি যাহা ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে তাহার মৌলিক শক্তি কি? অনন্ত জীবের অনন্ত কালকর্ম্ম স্বভাব গুণাদির অনন্ত ক্রিয়ায় পরিপূর্ণ বিশ্বের মৌলিক ক্রিয়া কি? ইহাদের মৌলিক স্বভাবই বা কি? একবার ভাবুন দেখি, যে পরব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারায় এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই অনন্ত খেলা খেলিতেছেন সেই পরব্রহ্মের সেই শক্তির অনুভবধারার মৌলিকতাই বা কি? অর্থাৎ কি মৌলিক শক্তিধারার জ্ঞানাবলম্বনে তাদৃশ শক্তিমৎ পরব্রহ্মের পরমজ্ঞানে অনায়াসে পৌঁছুছিতে পারি? শাস্ত্র এবং মহা মনীষিবৃন্দের অনুভব সিন্ধু আলোড়ন করিলে আমরা তিনটি পদার্থ অনুভব করিতে পারি। তাহারই অভিব্যক্তি হরি, কৃষ্ণ, রাম; অর্থাৎ হরণ, কর্ষণ, রমণ এই তিনই মৌলিক শক্তি, এই তিন ক্রিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্রিয়ার মৌলিক ক্রিয়া, অনন্তকালকর্ম্ম-গুণান্বিত অনন্তজীবের অনন্তস্বভাবের মৌলিক স্বভাব এই তিনই,—হরণ, কর্ষণ, রমণ। অধিক কথা কি, চেতনমাত্রেরই যাবতীয় স্পন্দনের মূল এই তিনই। কেবলমাত্র চিজ্জড়াত্মক প্রাকৃত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই যে এই তিনের খেলা চলিতেছে তাহা নহে; হরণ, কর্ষণ, রমণের মূল যিনি শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁহারও অনন্ত শুদ্ধ চিদানন্দ বিলাস-বৈচিত্রীময় বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধ চিদানন্দ অনন্তধামস্থ লীলাবৃন্দের মূল পরমাশ্রয় গোলক বৃন্দাবনীয় লীলায় এই হরণ কর্ষণ রমণ লীলার আধ্যাত্মিকতাই প্রকাশ পাইতেছে। রহস্য এই যে হরণ কর্ষণ রমণ এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়াসম্বন্ধ বিশিষ্ট অনন্তশক্তিক পরব্রহ্মকে হরি কৃষ্ণ রাম এই তিন পদের সম্বোধনে "হরে" "কৃষ্ণ" "রাম" এই তিন নামে অভিমুখী করা হইতেছে। পরব্রহ্মের তিন পরম মুখ্য নামাত্মক মহামন্ত্রই "হরে কৃষ্ণ

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ইহাই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্ররূপে কথিত হয়। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণ নামকে পারক, আর রাম নামকে তারক বলা হইয়াছে। আমার গুরূপদিষ্ট "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র রহস্য অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম, আশা করি বুদ্ধিমান্ সাধক এতদ্দৃষ্টে সদ্গুরু কৃপায় সাধন করিলে বিস্তৃত রহস্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। অথর্ব্ববেদোপনিষদে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, রাধাতন্ত্রাদিতে এই মহামন্ত্রের অনির্ব্বচনীয় মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আমার সাধনজীবনের প্রারম্ভে যে পরমকৃপালু মহাপুরুষ ব্রহ্মচারীর নির্হেতু কৃপায় এই নামরহস্য অবগত হই সেই বর্ত্মোপদেষ্টা নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভূয়োভূয়ো নমঃ। সেই মহাপুরুষ আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, "হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর, হরিবাসর একাদশী তিথি প্রতিপালন কর, হরি নাম মহামন্ত্রই কলিতে একমাত্র পরমোপায়, পরম সাধন শ্রেষ্ঠ। শৈব শাক্ত সৌর বৈষ্ণব সম্প্রদায়াদি নির্ব্বিশেষে কলিযুগের **তারকব্রহ্ম** এই নামই। কলিতে ব্রত নিয়ম তপঃ কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না, একমাত্র বিষ্ণুতিথি শ্রীএকাদশীর আরাধনাই কলিযুগের তপস্যা।" ব্রহ্মচারী বলিতেন, "হরে র্নামৈব কেবলম্।" ইহার একটি নূতন ধরণের অর্থ তিনি করিতেন। হরির নামই মাত্র যাহাতে আছে এমন মন্ত্র অর্থাৎ নমঃ স্বাহা প্রভৃতির অপেক্ষা নাই, শুদ্ধ নাম মালায় গ্রথিত হরি নাম মহামন্ত্র ভিন্ন আর গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। একাদশী সম্বন্ধেও ব্রহ্মচারী বলিতেন,

"যা সা বিষ্ণুময়ী শক্তি রনন্তা ব্যাপ্য যা স্থিতা।
সা তেন তিথিরূপেন দ্রষ্টব্যৈকাদশী সতী॥"

যে অনন্ত বিষ্ণুময়ী শক্তি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি লাভ করিতেছেন অনন্তরূপিণী তিনিই তিথিরূপেতে বর্ত্তমানা একাদশী, ইহাই জানিবে।

"একাদশী ঋষীণাং বৈ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ।" একাদশীর অধিষ্ঠাতা ঋষি, অর্থাৎ ঋষি শক্তির অধিষ্ঠান একদশী তিথি, আর চক্রপাণি বিষ্ণু শক্তির অধিষ্ঠান দ্বাদশী তিথি।

বৈধী রাগানুগা ভক্তি

পুনরায় ভক্তিসাধন সম্বন্ধে কিছু বলি, শ্রবণ করুন। মহত্তম ভগবদ্ভক্তের করুণায় জীবেতে যে ভাগবতী শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হয় তাহা দুই প্রকার, একটির নাম বৈধী ভক্তি, অপরটির নাম রাগানুগা ভক্তি ; তাহার কারণও ঐ মহৎসঙ্গ ; যেমন যেমন মহৎসঙ্গ লাভ হয় অর্থাৎ যে জাতীয় ভক্তিবাসিত ভক্তের সঙ্গ লাভ হয় তাঁহার কৃপায় তাঁহার মুখনিঃসৃত ভগবৎ কথার দ্বারা সেই জাতীয় ভক্তির বিষয়রূপেই শ্রীভগবানেরও আবির্ভাব হয়। আবার ভক্তিদেবীও সেই ভগবদাবির্ভাবানুসারিণী হইয়াই জীবের দেহেন্দ্রিয়ে আবির্ভূতা হয়েন। মোট কথা বৈধীভক্তিবাসিতহৃদয় ভক্তের সঙ্গে জীবে বৈধী ভক্তির আবির্ভাব হয়, আর রাগানুগাভক্তিবাসিতহৃদয় ভক্তের সঙ্গে রাগানুগাভক্তির আবির্ভাব হয়।

ভক্তির অস্বাভাবিকী অবস্থা একটি, আর স্বাভাবিকী অবস্থা একটি, এবং ভক্তির প্রমাণের অল্পতা একটি, আর প্রমাণের পূর্ণতা একটি, এইরূপ ভক্তির ঐশ্বর্য্যবিষয়িণী জাতি একটি এবং মাধুর্য্যবিষয়িণী জাতি একটি ; একই ভাগবতী ভক্তির এই ষড়্‌বিধা অবস্থা। এই ষড়্‌বিধা অবস্থার ভেদের তারতম্য অনুসারে ঐ একই ভাগবতী ভক্তিশক্তি সাধন দশায় বৈধী রাগানুগা এই দ্বিবিধ হইয়া আবার সাধ্য দশায় ঐশ্বর্য্যাত্মিকা প্রীতি এবং মাধুর্য্যাত্মিকা প্রীতি রূপে চারি প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তি বৈধী সাধ্যভক্তি (ঐশ্বর্য্যাত্মিকা প্রীতি), আবার রাগানুগা সাধনভক্তি রাগানুগা সাধ্যভক্তি (মাধুর্য্যাত্মিকা প্রীতি) এই চারিপ্রকার হয়।

শাস্ত্রের শাসনবলে প্রবর্ত্তিতা ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলা যায়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে রূপসৌন্দর্য্যাদিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যে স্বতঃ রুচিযুক্ত

প্রবৃত্তি, এই প্রকার ভক্তির প্রবৃত্তিটি স্বতঃ রুচিযুক্তা না হইয়া কেবল শাস্ত্রাদির শাসনে কেবল মাত্র বিহিতত্ববুদ্ধিতে (কর্ত্তব্য জ্ঞানে) ভগবদ্‌বিষয়ে দেহেন্দ্রিয়াদির যে প্রবৃত্তি উহাই **বৈধী ভক্তি**। উহাকে **অস্বাভাবিকী ভক্তি**ও বলা যায়। ভগবদ্‌বিষয়িণী কায়েন্দ্রিয়ের বৃত্তির নামই ভক্তি। এখন দেখুন কায়েন্দ্রিয়ের যে সকল বৃত্তি (ব্যাপার) যেমন শুনা দেখা বলা গ্রহণ করা ভাবনা করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি দেহেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি, এই ব্যাপার সমূহ যেমন স্বভাবজাত, তেমনই ভগবৎ কথা বলা, শুনা, তদ্‌বিগ্রহাদি দেখা, তৎ চিন্তাদি করা ব্যাপারগুলি ইন্দ্রিয়ের স্বভাবজাত ব্যাপারের ন্যায় হইলে উহাকে স্বাভাবিক ভক্তি বৃত্তি বলা যায়। আর তাহা না হইয়া ঐ ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি যদি কেবল শাস্ত্র শাসন বলেই বিহিতত্ব মাত্র বুদ্ধিতে ক্রিয়মান ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপে উদিত হয় তাহা হইলে উহাকে অস্বাভাবিক বলা যায়। ইহাই বৈধী ভক্তি। সাধনাবস্থায় অস্বাভাবিকরূপে উদিত এই বৈধী ভক্তিটি সাধ্যাবস্থায় ভাবদশা প্রাপ্ত হইলে আবার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন ইহাকে রাগ ভক্তিও বলা যায়। কিন্তু ইহা ঐশ্বর্য্যবিষয়ত্বাবচ্ছিন্না জাতিমতী রাগভক্তি। প্রথমতঃ শাস্ত্রের শাসনাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও পুনঃ পুনঃ সাধনের দ্বারা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা রুচি আসক্তির স্তরে আরূঢ়া হইলে ক্রমশঃ ভগবদ্‌বিষয়িণী কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক হইয়া উঠে; তাৎপর্য্যার্থ এই যে বৈধী ভক্তির সাধন দশায় যে অস্বাভাবিকতা থাকে তাহাই সাধ্য দশায় ভাবভক্তি অবস্থায় স্বাভাবিকতা ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্যবিষয়িণী রাগাত্মিকা ভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। ভাব প্রেমাদি সাধ্যাবস্থায় ভক্তিটি শাস্ত্র শাসনে বিহিতত্ব মাত্র বুদ্ধিতে প্রবর্ত্তিত হয় না, তখন স্বভাবতঃই প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে রাগাত্মিকা বলা যায়। বৈধী ভক্তির সাধ্য ভাবাবস্থায় যে স্বাভাবিকতা ইহা প্রমাণের উৎকর্ষ বশতঃই হয়। সাধন দশায় বৈধী ভক্তিটি অল্পপ্রমাণা থাকে, সাধ্য দশায় ঐ ভক্তি ভাব-প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণপ্রমাণা হয়।

ভক্তির আর এক প্রকার স্বাভাবিক অবস্থা আছে; এই স্বাভাবিকতাটি তৎ জাতীয় উৎকর্ষবশতঃ অর্থাৎ এই ভক্তিটি জাতিতেই স্বাভাবিকী। **ভগবন্মাধুর্য্যবিষয়িণী দৃঢ়সম্বন্ধানুবন্ধিনী ভক্তি জাতিতেই স্বাভাবিকী**

হয়। ইহাকেই শুদ্ধা রাগভক্তি বলা যায়। এই রাগভক্তিতে সৎ মহাপুরুষের কৃপায় স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হইলেই রাগের অনুগামিনী রুচি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা যে ভগবন্মাধুর্য্যবিষয়িণী এবং সম্বন্ধানুবন্ধিনী শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপা বৃত্তি তাহাকেই **রাগানুগা সাধন ভক্তি** বলা যায়। প্রাচীন অথবা অর্ব্বাচীন তাদৃশ মহত্তম ভক্ত কৃপার সংস্কার বলে গুরূপদেশের পূর্ব্বে অথবা গুরূপদেশের অনন্তর শাস্ত্র শাসন বিধি বিনাই স্বভাবতঃ রুচির উদয়ে ভগবদ্‌বিষয়িণী ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই রাগানুগা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তিমার্গকে রুচি ভক্তিমার্গও বলা যায়, কারণ একমাত্র রুচি হইতেই এই ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। জাতিতে স্বাভাবিকী হইয়াও অল্পপ্রমাণা হইলে সাধনরূপা রাগানুগা হয়, আর পূর্ণপ্রমাণা হইলে সাধ্য-রূপা রাগাত্মিকা ভাবভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত বৈধী ভক্তিটি অস্বাভাবিকী অল্প-প্রমাণা হইলেই সাধনরূপা হয়, আর উহারই সাধ্যাবস্থায় বৈধী ভাবভক্তিটি পূর্ণপ্রমাণা হয়। তখন প্রমাণের পূর্ণতাবশতঃ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে, কিন্তু জাতিতে স্বাভাবিকী হয় না। আর জাতিতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিকী ভক্তিটি সাধন দশায় অল্পপ্রমাণা হইলে রাগানুগা নাম ধারণ করে। এখানে জাতির উৎকর্ষ বলিতে ভক্তির যে জাতিটি দৃঢ়সম্বন্ধানুবন্ধিমাধুর্য্যবিষয়কত্বা-বচ্ছিন্না তাহাই ভক্তির উৎকৃষ্টা জাতি। মোট কথা দৃঢ়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যকে বিষয় করিয়া যে ভক্তিটি প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই শুদ্ধা রাগভক্তি। আর তাহারই অনুগামিনী রুচি প্রবর্ত্তিতা সাধন ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়।

এই কথাগুলি প্রকারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করুন। রাগের অনুগামিনী ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। রূপ সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময় প্রেম তাহাই **রাগ** নামে অভিহিত হয়। মোট কথা স্বাভাবিক অতি উৎকট ইচ্ছাকেই সাধারণ লোকে রাগ বলে। যেমন মনে করুন, রূপসৌন্দর্য্যে চক্ষু স্বরসতঃই আকৃষ্ট, রূপ-সৌন্দর্য্যের সহিত মিলনে চক্ষুর অতিশয় ইচ্ছা ; ইহা যেমন রূপসৌন্দর্য্যের স্বরসতা এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বভাবতঃই হয়, কোনও প্রকার বাধ্যবাধকতাময় বিধি শাসনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক এই মিলনের ইচ্ছাটি নয়, এই ইচ্ছাটি যেমন স্বাভাবিকই, এই প্রকার শ্রীভগবানের রূপগুণলীলা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিতে

ভক্তের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের যে মিলনের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছার অতিশয়ময় প্রীতিভাব তাহাই রাগ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ **ইষ্ট বিষয়ে স্বাভাবিক প্রেমময় তৃষ্ণাকেই রাগ বলা যায়।** ভক্তির বৃত্তি যথাযোগ্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি যদি ঐ স্বাভাবিক প্রেমময় তৃষ্ণাময়ী হইয়া উদিত হয় তাহা হইলেই তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। এতাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির নিত্য অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ স্থানীয় দাস সখাদি সম্বন্ধ বিশেষের ভেদে নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; অর্থাৎ রাগ ভক্তিটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় তাদৃশ রাগের অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের অভিব্যঞ্জক শ্রীভগবানের সহিত কোনও না কোন সম্বন্ধ বিশেষই। তাদৃশ সম্বন্ধ বিশেষকে ক্রোড়ে করিয়া সম্বন্ধবৈশিষ্ট্যময়ী হইয়াই রাগ ভক্তিটি প্রকাশ পায়। মোট কথা ভগবানে কোন সম্বন্ধ বিশেষ নাই এমন ভাবে রাগভক্তি হইতে পারে না। এই প্রকার শুদ্ধা রাগভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যলোকে নিত্য পার্ষদবর্গেই অবস্থান করে। উহার নিত্য আশ্রয় একমাত্র ভগবানের নিত্য পার্ষদগণ। সুর সরিৎ ধারার ন্যায় ভক্ত সাধকের রুচিপরম্পরায় এই মর্ত্ত্য লোকের সাধকবর্গেও উহা আবির্ভূতা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমতঃ রাগানুগা সাধন সিদ্ধ মহত্তম ভক্ত সঙ্গে তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রাদিবর্ণিত তাদৃশ নিত্য পরিকরগণের শ্রীভগবানে স্বতোরাগময়ী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া যখন সাধক ব্যক্তির মনে তাদৃশ নিত্য পরিকরের রাগভক্তির প্রতি স্বতঃ আকৃষ্টতা আসিয়া শ্রীভগবানের শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী প্রীতিই একমাত্র অভীষ্ট এই প্রকার জ্ঞানে তাহাতে একটি রুচির উদয় হয় তখন তাদৃশ নিত্য পরিকরদিগের রাগভক্তির প্রতি প্রথমতঃ স্বাভাবিক রুচি উদিত হইয়া সেই রুচি দ্বারা প্রবর্ত্তিত সাধক জীবে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির উদয় হয় তাহাই **রাগানুগা ভক্তি** নাম ধারণ করে। বৈধী ভক্তি আর রাগানুগা ভক্তির ইহাই ভেদ। শাস্ত্রের শাসন ভয়ে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে যে ভক্তি তাহা বৈধী ভক্তি, আর ভগবন্মাধুর্য্যময় রূপগুণলীলাদির মাধুর্য্যে স্বতঃ লোভ-বশতঃ স্বভাবতঃ রুচি প্রবর্ত্তিত ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। সাধনদশায় লৌকিক দৃষ্টিতে এই দ্বিবিধা ভক্তির ব্যবহারগুলি মোটামুটি এক প্রকার হইলেও এই দ্বিবিধ ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য, চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ভগবদৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যের বিশ্লেষণ

ভাগবতী ভক্তি ভগবত্তোপজীব্যা অর্থাৎ পরতত্ত্বের সবিশেষ আবির্ভাব ভগবানের ভগবত্তাই এই ভাগবতী ভক্তির উপজীব্য। যাহাতে ভগবত্তার প্রকাশ নাই এমন শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম রূপ প্রকাশ কখনও ভক্তি শক্তির উপজীব্য হইতে পারে না। ভগবানের ভগবত্তা দ্বিবিধা, ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ভগবত্তা আর মাধুর্য্যাত্মিকা ভগবত্তা। ঐশ্বর্য্য বলিতে প্রভুতাকে বুঝায়। "প্রভাবেন বশীকর্ত্তৃত্বমৈশ্বর্য্যম্।" অর্থাৎ প্রভুত্বের অভিব্যঞ্জনের দ্বারা সকলকে বশীভূত করে ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম তাহাই ঐশ্বর্য্য। সংক্ষেপ কথা এই যে ঈশ্বরত্বের আবিষ্কারের নামই ঐশ্বর্য্য। যেখানে নরলীলার অপেক্ষা না করিয়া তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যের আবিষ্কার হয় তাহাকেই ঐশ্বর্য্য বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল যেমন বসুদেব দেবকীকে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইয়া ভগবান্ বলিলেন, "এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্তলিঙ্গেন জায়তে॥" এখানে নরলীলোচিত পুত্রত্বভাবকে অপেক্ষা না করিয়াই নিজের প্রভুত্বকে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, "আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবির্ভাব স্মরণ করাইবার জন্যই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলাম" ইত্যাদি। অথবা হঠাৎ যেমন পার্থসারথি ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্", এখানে অর্জ্জুনের সহিত সখ্যোচিত নরলীলাভাবের অপেক্ষা না করিয়া প্রভুত্ব ভাবকে প্রকাশ করিয়া হঠাৎ বলিলেন, "আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন কর।" ইহাই ভগবানের ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ভগবত্তা। আর মাধুর্য্য বলিতে রূপ বয়ঃশীলাদির এবং দাস সখাদি সম্বন্ধ বিশেষের মনোহারিতা অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই ঐ সকলের রুচিজনকতারূপ চারুতাকেই বুঝায়। তাৎপর্য্যার্থ এই যে যাহা পারমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ হইলেও অথবা পারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহার অপ্রকাশে নরলীলাকে অতিক্রম করে না তাহাই মাধুর্য্য। যেমন পূতনা বধ-লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলেও স্তনচূষনরূপ নরবাললীলত্বকে অতিক্রম করিতেছেন না, যেমন দামবন্ধনে নিজোদরের বিভুত্বরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশেও মাতৃভয়ে বিকলতারূপ নরবাললীলত্বকে অতিক্রম করিতেছেন না। আবার মহৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহার অপ্রকাশে যেমন দধিপয়শ্চৌর্য্য প্রভৃতি লীলা নরলীলাকে

অতিক্রম করিতেছে না, ইহাই ভগবানের মাধুর্য্যাত্মিকা ভগবত্তা। ভগবানের একই ভগবত্তার প্রকাশ ভেদে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপ ভেদ হয়, যেমন একই প্রদীপ স্ফটিক মণির গৃহাভ্যন্তরে তীব্র প্রকাশ পায়, আবার পদ্মরাগ মণির গৃহাভ্যন্তরে মধুর প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভগবানের ভগবত্তার তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য্য, আর মধুর প্রকাশের নাম মাধুর্য্য।

এখন দেখুন ভক্তিকে "আহ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত সম্বিৎ শক্তির সার" বলা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তির ধর্ম্মভূত জ্ঞানটা ঐ দ্বিবিধ ভগবত্তাকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও দ্বিবিধ হয়, একটি ভগবদৈশ্বর্য্য বিষয়ক জ্ঞান, অপরটি ভগবন্মাধুর্য্যবিষয়ক জ্ঞান। মনে রাখিবেন যে ভগবজ্‌জ্ঞানশূন্য ভক্তি হইতেই পারে না, কারণ ভক্তিকে সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তির সার বলা হইয়াছে। সুতরাং ভগবত্তৈকোপজীব্যা ভাগবতী ভক্তিও দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া ভগবানের নিত্যলোকে দ্বিবিধ নিত্য পরিকর জনে নিত্যই বিরাজমানা হইয়া আছেন, একটি ঐশ্বর্য্য ভক্তি অপরটি মাধুর্য্য ভক্তি। নিত্য পরিকরও ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রধান পরিকর মাধুর্য্য জ্ঞান প্রধান পরিকর ভেদে দুই প্রকার। এখানে একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবানের ঐ ঐশ্বর্য্যের এবং মাধুর্য্যের সামান্য বিশেষ ভাব আছে। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সামান্য আর মাধুর্য্য সামান্য, ঐরূপ ঐশ্বর্য্য বিশেষ আর মাধুর্য্য বিশেষ। ঐশ্বর্য্য সামান্য জ্ঞান বলিতে "ঈশ্বরোহয়ম্" অর্থাৎ ইনি ঈশ্বর এই প্রকার জ্ঞান সামান্য মাত্র বুঝায়, আর মাধুর্য্য সামান্য জ্ঞান বলিতে "অয়ং মনোহারী," অর্থাৎ ইনি মনোহর এই প্রকার জ্ঞান সামান্য মাত্র বুঝায়। একার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সামান্য ভাব পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্য সামান্যের অনুপ্রবেশ হয় এবং মাধুর্য্যেও ঐশ্বর্য্য সামান্যের অনুপ্রবেশ হয়। তথাপি **মাধুর্য্য জ্ঞানেরই বলবৎ সুখময়ত্ব** সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক সুখ বলিতে ভগবান্‌কে নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদরূপে যে অনুভব তাহাই বুঝায়। তাদৃশ নিরুপাধি প্রেমাস্পদতা-নুভবরূপ সুখের অনুভবটি কেবল মাধুর্য্য জ্ঞান হইতে হয়। সুতরাং **ভগবৎ প্রীতিটি ভগবন্মাধুর্য্যতাৎপর্য্যত্ব দ্বারাই সিদ্ধ হয়।** কেবল শুদ্ধ ভগবন্মাধুর্য্য ভিন্ন যদি অন্য কোনও তাৎপর্য্য থাকে তাহা হইলে

ভগবৎপ্রীতির সম্যগাবির্ভাব হয় না। তাই পারমৈশ্বর্য্যের তীব্র প্রকাশময় বৈকুণ্ঠাদির পার্ষদবর্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকিলেও সামান্তরূপে মাধুর্য্যের প্রকটন থাকায় তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যময় নারায়ণাদি স্বরূপও মনোহারী হন। এইজন্যই পারমৈশ্বর্য্য প্রীতিটিও সিদ্ধ হয়। যদি এইরূপ ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্য সামান্যের অনুপ্রবেশ না থাকিত তাহা হইলে সে স্থলে প্রীতি সিদ্ধ হইতে পারিত না। আবার শুদ্ধ পরম মাধুর্য্যের মধুরতম প্রকাশময় ব্রজবৃন্দা-বনের নন্দ আদি নিত্য পরিকরবর্গের মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকিলেও তাহাতে ঐশ্বর্য্য সামান্যের প্রকাশ থাকায় তাঁহাদের শুদ্ধা প্রীতির পুষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া অলৌকিকতাই সূচিত হইতেছে। যদি ঐ প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যের প্রবেশ না থাকিত তাহা হইলে প্রীতির অলৌকিকতা প্রকাশ পাইত না, সামান্য বিষয়-প্রীতি সাদৃশ্য হইয়া পড়িত। এই ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সামান্য মাধুর্য্যজ্ঞান সামান্যের কথা বলিলাম।

প্রকারান্তরে বৈধী রাগানুগা ভক্তির ভেদ

এখন ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিশেষ ও মাধুর্য্য জ্ঞান বিশেষের কথা শুনুন, যাহাতে বৈধী রাগানুগা ভক্তির রহস্যোদ্ঘাটন হইবে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিশেষ বলিতে **সম্বন্ধশৈথিল্যকৃৎ সম্ভ্রমজনকতাবচ্ছেদক রূপে ভাসমান ধর্ম্মবিশিষ্টই** বুঝায়। তাৎপর্য্যার্থ এই যে "ইনি পরমেশ্বর প্রভু" এই প্রকার অনুসন্ধান হইয়া হৃদয়ে ভয় সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়া ভগবৎ সেবোচিত স্বাভাবিক সম্বন্ধকে শিথিল করিয়া ভগবৎসেবাতে সঙ্কোচ আনয়ন করে যে ভক্তির ধর্ম্মভূত জ্ঞান তাহাই ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞান বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্থল যেমন কৃষ্ণ বলরামের প্রতি বসুদেব বলিতেছেন, "যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ" অর্থাৎ "তোমরা দুজন আমাদের পুত্র নও, তোমরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি পুরুষেরও ঈশ্বর," ইত্যাদি বাক্যে বসুদেবের বাৎসল্য স্বভাবোচিত নিজের পিতৃত্ব সম্বন্ধটি শিথিল হইল, ইহাই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিশেষ। যেমন বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া হৃৎকম্প সহকারে অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি প্রমাদবশতঃ বা প্রণয় হেতু হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি অন্যায় সম্বোধন করিয়াছি।...অপ্রমেয় তুমি

আমাকে ক্ষমা কর," ইত্যাদি স্থলে অর্জ্জুনের সখ্য স্বভাবোচিত নিজের সখিত্ব সম্বন্ধটি শিথিল হইল। এই প্রকার সম্বন্ধোচিত স্বভাবের শৈথিল্যকারী ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞান যে ভক্তিতে তাহাই ঐশ্বর্য্যভক্তি। এই ভক্তি নিত্যপরিকরে পূর্ণ প্রমাণা হইয়া স্বাভাবিকরূপে প্রবর্ত্তিতা হয় বলিয়া নিত্যপরিকরস্থিত এই ঐশ্বর্য্যভক্তিকে **গোণ রাগাত্মিকা** বলা যায়। নিত্যপরিকরস্থিতা এই সাধ্যরূপা ঐশ্বর্য্য ভক্তিটি যখন মর্ত্তলোকে জীবে আবির্ভূতা হয় তখন তাদৃশ সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের মুখনিঃসৃত ভগবানের মহিমা সূচক কথা শ্রবণ করিয়া জীবমাত্রেরই ভগবদ্‌ভক্তি সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইয়া ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন অর্চ্চনাদিতে যে প্রবৃত্তির উদয় হয় সেই প্রবৃত্তির দ্বার দিয়া সাধক জীবে যে ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন অর্চ্চন স্মরণ মননাদি দেহেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় তাহাই সাধনরূপা বৈধী ভক্তি। এস্থলে প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ চিকীর্ষা অর্থাৎ সাধন করিবার ইচ্ছা ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন মনে করুন কোন মহত্তম ভক্ত শ্রীভগবানের মহিমা ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন, "ভগবানই জীবের পরমাশ্রয়, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে আশ্রয় না করায় জীব মায়িক সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ হইতেছে। অনন্ত পাপপুণ্যের ফলদাতা ভগবান্, তাঁহার ভজন না করার মত মহাপাপ আর নাই। এই পাপের গুরুতর দণ্ড জীব অনাদি অনন্ত কাল হইতেই ভোগ করিয়া আসিতেছে। যাবৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম ভজনে প্রবৃত্তি না জন্মে তাবৎ বিশ্বের অন্য যাবতীয় পুণ্য করিয়াও ভগবদ্‌ভক্তি না করা পাপের দণ্ড হইতে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। অহো! পতিতপাবন অধমতারণ সর্ব্বক্লেশনিসূদন ভগবান্ মধুসূদনের চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ ভিন্ন মায়াগর্ত্তে নিপতিত সতত অধম কর্ম্মে রত সংসারক্লেশক্লিষ্ট জীবের উপায়ান্তর নাই," ইত্যাদি তাদৃশ মহিমৈশ্বর্য্যব্যঞ্জক ভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবদ্‌-ভজন না করা জনিত গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া নিজেকে মনে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ হৃৎকম্পজনক একপ্রকার সম্ভ্রমের ভাব মনে উদয় হইয়া ভগবদ্‌ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তদনন্তর তাদৃশ কর্ত্তব্য ভগবদ্‌ভক্তি সাধনে প্রবৃত্তির উদয় হইবে। **ইহাই সাধক জীবে বৈধীভক্তি উদয়ের ক্রম।**

সাধ্যাবস্থায় ঐশ্বর্য্যাত্মিকা প্রীতিতে ভক্তির ধর্ম্মভূত জ্ঞানে ভগবদৈশ্বর্য্যটি

বিষয়রূপে উদ্দীপ্ত হইয়া হৃৎকম্পের হেতু সম্ভ্রম গৌরবাদিকে অভিব্যক্ত করিয়া ভক্তির সর্ব্বায়বাংশে প্রবল প্রভুতা ব্যঞ্জক রূপেই প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও প্রীত্যংশ অবয়বীতে রুচিজনক মাধুর্য্যই উদ্দীপ্ত হয় বলিয়াই উহাকে ঐশ্বর্য্যাত্মিকা **প্রীতিই** বলা যায়। (পূর্ব্বে বলিয়াছি ঐশ্বর্য্যভক্তিতেও মাধুর্য্য সামান্য জ্ঞানেরও সদ্ভাব থাকে, মাধুর্য্য না থাকিলে প্রীতিই হইতে পারে না।) সাধ্যাবস্থায় ঐশ্বর্য্যাত্মিকা প্রীতিটি পূর্ণপ্রমাণা হইয়া প্রীত্যংশ অবয়বীতে যে মাধুর্য্যটি উদ্দীপ্ত হয়, সাধনাবস্থায় তাহা লুপ্তপ্রায়ের ন্যায় অতি সূক্ষ্মরূপে অত্যল্পপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করায় অবয়বী অংশ প্রীতিটি প্রায় প্রকাশই পায় না। আবার ঐশ্বর্য্যপ্রবল অংশটিও তখন অল্পপ্রমাণ হওয়ায় তাহার স্বাভাবিক অবস্থা আর প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রীত্যংশ অবয়বীতে মাধুর্য্যটি যে প্রকার অতি সূক্ষ্ম অত্যল্পরূপে অলক্ষিতভাবে মাত্রই থাকে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যটি কিন্তু অবয়বাংশে অলক্ষিতভাবে না থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ লক্ষিতভাবেই থাকে। তাই বৈধী ভক্তি সাধনে শ্রবণ কীর্ত্তন অর্চ্চনাদির ব্যাপারগুলি স্বাভাবিক রুচিবশতঃ প্রকাশ না পাইয়া শাস্ত্র বিধি শাসনের দ্বার দিয়া যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যব্যঞ্জক সম্ভ্রম গৌরবের প্রবৃত্তি জাগাইয়া সাধক মানুষের দেহেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায়। তাহাই বৈধী ভক্তি নাম ধারণ করে। তাৎপর্য্য এই যে ঐশ্বর্য্যাত্মিকা প্রীতির সাধনই বৈধীভক্তি সাধন।

এখন মাধুর্য্য জ্ঞান বিশেষের কথা কিছু বলিতেছি। মাধুর্য্য জ্ঞান বলিতে **সম্বন্ধাতিস্থৈর্য্যকৃৎ রুচিজনকতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান ধর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানই** বুঝায়। তাৎপর্য্যার্থ এই যে "ইনি পরমেশ্বর" এই প্রকার অনুসন্ধানেও হৃৎকম্প-জনক সম্ভ্রমের গন্ধও উদিত হয় না। প্রত্যুত স্বাভাবিক রুচ্যনুকূল সম্বন্ধকে দৃঢ় করিয়া ভগবৎ সেবায় নিঃসঙ্কোচ প্রবৃত্তি আনয়ন করে যে ভক্তির ধর্ম্মভূত জ্ঞান তাহাকেই ভগন্মাধুর্য্য বিশেষ জ্ঞান বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ব্রজবাসী পরিকর-বর্গ। শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন, যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, বরুণ দেব কর্ত্তৃক পূজা, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলাতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান হইলেও ব্রজবাসী পরিকরদিগের হৃৎকম্প হেতু সাদর সম্ভ্রমের অভাব বশতঃ নিজ নিজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ শিথিল না হইয়া প্রত্যুত "অহো! সর্ব্বেশ্বর আমার পুত্র, সর্ব্বেশ্বর আমার সখা, আমার প্রিয়" ইত্যাদি বিস্ময়ের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ অতিশয় পুষ্টিই লাভ করে। এই প্রকার সম্বন্ধোচিত স্বভাবের অতিশয় স্থৈর্য্যকারী ভগন্মাধুর্য্য জ্ঞান

যে ভক্তিতে তাহাই মাধুর্য্য ভক্তি। এই মাধুর্য্যময়ী ভক্তিটি নিত্যপরিকরে পূর্ণপ্রমাণা হইয়া স্বাভাবিকরূপে প্রবর্ত্তিতা হয় বলিয়া ব্রজনিত্যপরিকরে স্থিত স্বভাব মাধুর্য্য ভক্তিকে **মুখ্য রাগাত্মিকা** বলা যায়। গৌণ রাগাত্মিকা ভক্তিতে এইরূপ স্বভাব মাধুর্য্যের অভাব; উভয়ের এই ভেদ বুঝিতে হইবে।

ভাগবতী ভক্তি শক্তির প্রকৃষ্ট প্রকাশ এই রাগাত্মিকা ভক্তিতেই। পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি-অভিন্ন মিলিত সম্বিৎ শক্তির সারই ভক্তি। আহ্লাদাভিন্ন সম্বিতের সার বলিতে ভগবদ্‌বিষয়ক আনুকূল্যাভিলাষ বিশেষকেই বুঝায়। সাধক জগতে ভক্তির ধর্ম্মভূত জ্ঞানাংশ হইতে উদ্ভূত আনুকূল্য অংশটি শুদ্ধ জীবের ধর্ম্মভূত শুদ্ধ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত অভিলাষ বিশেষ অংশে মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। অভিলাষ বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অন্য তৃষ্ণাশূন্য ভগবান্ মাত্রে তৃষ্ণা। শুদ্ধ চিদাত্ম জীবের ধর্ম্মভূত শুদ্ধ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত তাদৃশ তৃষ্ণার সহিত ক্ষীরনীরের মত একত্রীভূত যে ভগবদানুকূল্যাংশ তাহাই ভক্তি, সুতরাং ভগবত্তৃষ্ণাময় আনুকূল্যই ভক্তির লক্ষণ। রাগভক্তিতেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। সুতরাং রাগানুগাকেও একপ্রকার **তৃষ্ণাময়ী ভক্তি** বলা যাইতে পারে।

নিত্যপরিকরাশ্রয়া সাধ্যরূপা **এই মুখ্য রাগাত্মিকা ভক্তিটি** যখন মর্ত্ত্য-লোকস্থিত সাধক জীবে সাধনরূপে আবির্ভূতা হয়েন তখন নিজের মাধুর্য্য জাতীয় স্বাভাবিকতা পরিত্যাগ না করিয়া কেবল মাত্র প্রমাণের ন্যূনতা (পরিমাণে অল্পতা) প্রকাশ করিয়াই তাদৃশ কোন রাগসিদ্ধ ভক্ত কৃপা সংস্কৃতা হইয়াই আবির্ভূতা হয়েন। তখন তাহাকে রাগানুগা সাধনভক্তি বলা যায়। কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে যখন তাদৃশ কোনও রাগানুগভক্তিবিজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গাদি কৃপায় ভক্তিটি কোনও জীবে আবির্ভূতা হন, তখন ঐ ভক্তিরই ধর্ম্মভূত জ্ঞান জ্ঞাপন বৃত্তি দুইটির মধ্যে **জ্ঞাপন বৃত্তিটিই** প্রথমতঃ প্রবলা হইয়া শ্রীভগবানে (দাস্যসখ্যবাৎসল্যকান্তাদির মধ্যে) যে কোনও একটি মধুর সম্বন্ধ বিশিষ্ট রুচি উৎপাদনকারী ভগবন্মাধুর্য্যকেই জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবানের জ্ঞান দুই প্রকার, একটি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান, আর একটি মাধুর্য্য জ্ঞান; মাধুর্য্য জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার স্বভাবই এই যে সে ভগবানে নিঃসঙ্কোচ সেবার অনুকূল কোনও সম্বন্ধ স্থাপিকা রুচিকেই জন্মায়। মনে করুন আপনার নিকট কোনও রাগানুগা ভক্তি সাধক ভক্ত শ্রীভগবানের

কোন পরম মাধুর্য্যময়ী ব্রজলীলা বর্ণন করিতেছেন,—"স্থলকমলদল অপেক্ষাও অতি সুকোমল অরুণিমচরণরাজীবরাগরঞ্জিত মণিময় নূপুরের মধুররবে মুখরীকৃত যামুনপুলিনবীথিতে কেলিকলারসামোদমদচপলব্রজগোপালবালবৃন্দসহচরসঙ্গে চন্দনকুঙ্কুমমৃগমদবিলেপনে বিলেপিত নবজলদশ্যামঘনতনুর অতিমনোহারিরুচি-লহরী বিস্তার করিতে করিতে, নীলকুবলয়দলোপরিশায়িতসর্পশিশুকুণ্ডলতুল্য-ভ্রূমণ্ডলকে নর্ত্তন করাইতে করাইতে, কোমলনবকিশলয়তুল্য ঈষদরুণকিরণ-বিকীরণকরকরতলকবলিত মোহনমুরলীটিকে বদনসুধাকরসুধাসুরঞ্জিতমন্দস্মিত-যুত মধুর বিম্বাধরে ন্যস্ত করিয়া ফুৎকারোদ্গারিত অধররসপূরিত সুললিতকল-কলবংশীনাদামৃতবর্ষণে ত্রিভুবনকে শীতল করিতে করিতে, পৃথুকটিতটে কষিত-কনককান্তিকন্দলীসন্দীপিতপরিহিতপীতবসনকে আন্দোলন করিতে করিতে, ব্রজজননয়নানন্দবিবর্দ্ধন ব্রজবরধন নন্দনন্দন বৃন্দাবনবৃন্দারকেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নিজমুখচন্দ্রচন্দ্রিকামৃতসিঞ্চনে মৃগময়ূরপ্রমুখ পশুপক্ষিনিকরকে অভিনব জীবন দান করিতে করিতে প্রফুল্লিতকুসুমস্তবকমঞ্জরীসমন্বিতবৃক্ষবল্লরী-আদি-শোভিত বৃন্দাদেবীসেবিত বৃন্দাবনীয় কমনীয় কাননে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীদামসুদামদাম-বসুদামসুবলমধুমঙ্গলবলাদিমুখসহচরসঙ্গে সখ্যরসোদ্গারবিহাররঙ্গতরঙ্গসঙ্গরে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ ক্রীড়ারসলোল বালকদিগের সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্র ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের কেলিশ্রমোদ্গলিতস্বেদবিন্দুশোভিতমুখারবিন্দকে সন্দর্শন করিয়া অতি প্রিয় সুবল সাতিশয়ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চঞ্চলকুটিলচূর্ণকুন্তলপরিশোভিত মুখমণ্ডল-খানি স্বীয় মৃদুল দুকূলাঞ্চলে নির্ম্মঞ্জন করিতে লাগিলেন। স্বীয়নয়নকমলদল-গলিত অবিরল জলধারায় বক্ষঃস্থলকে প্লাবিত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের আলুলায়িত কেশকলাপে স্খলিত কলাপিকাপিঞ্ছরচিত মোহনচূড়াটিকে মঞ্জুলমালতীদামে নিবদ্ধ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'হে সখে কহ্ন, অপগত পূর্ব্বাহ্ন, আসন্ন মধ্যাহ্ন, কেলিশ্রমে অবসন্ন ক্ষুৎক্ষিন্ন তোমার অপ্রসন্ন বদন আমার অন্তরাত্মাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। হে ভ্রাতঃ, মদীয় অংসে তোমার বাহু বিন্যস্ত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।' শ্রীকৃষ্ণও প্রিয় সুবলের স্কন্ধে নিজের বাহু বিন্যাসপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের ক্লান্তি অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রিয় সখা শ্রীদাম তড়িদ্দামের ন্যায় দ্রুত আগমন করিয়া ক্রোড়ে

স্থাপন করিলেন। মহাবল বলদেব কৃষ্ণমুখ চুম্বন করিয়া কৃষ্ণের শিরঃ আঘ্রাণ করিলেন। মধুমঙ্গল নবপল্লবকুসুমদলকল্পিত সুকোমল মঞ্জুল সুতল্পে উপবেশন করাইলেন। সুদাম কমলকুবলয়কহ্লারদলরচিত শীতল ব্যজনে বীজন করিতে লাগিলেন। কোন বয়স্য সরহস্য হাস্য পরিহাসময় বাগ্‌বিন্যাসে কৃষ্ণাস্য প্রফুল্লিত করাইতে লাগিলেন। কোন কোন প্রিয় সখা যমুনাজল আহরণ করিয়া কৃষ্ণচরণ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ গৃহ হইতে আনীত প্রাণকোটিতুল্য সযতনে রক্ষিত সুবাসিত দধিমিশ্রিত অন্ন শ্রীকৃষ্ণমুখে অর্পণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন গোপবালক নিজ অঙ্কে কৃষ্ণের চরণযুগল স্থাপন করিয়া মৃদু মৃদু সংবাহন করিতে লাগিলেন।” এই প্রকার মহৎমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী ভগবল্লীলা কথা শ্রবণ করিতে থাকিলে নিজপার্ষদ ঐ গোপবালকদিগের শ্রীভগবানে যে দৃঢ় শুদ্ধ সখ্য সম্বন্ধটি ঐ লীলাটিকে মাধুর্য্য-ময়ী করিয়াছে মহৎ কৃপায় ঐ লীলাকথা শ্রবণ করিয়া আপনার মনে প্রথমতঃ ভক্ত ভগবানের তাদৃশ সম্বন্ধ জ্ঞানটিই উদিত হইবে, বৈধী হইতে রাগানুগা ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য। বৈধীতে এই প্রকার সম্বন্ধের মাধুর্য্য অনুভব হয় না। ইহা ঐ ভক্তির ধর্ম্মভূত **জ্ঞানজ্ঞাপনবৃত্তির কার্য্য**। আপনার এই প্রকার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ ভক্তির অন্যভাগ অহ্লাদিনীর সারাংশ তাহার কার্য্য “তাদৃশ সম্বন্ধ মাধুর্য্যে বিশিষ্ট মাধুর্য্যলীলানন্দময় ভগবান্ নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ” এই প্রকার আনন্দরূপ পুরুষার্থ প্রয়োজন অর্থাৎ অভীষ্ট এইরূপে জ্ঞাপনবৃত্তির সহিত মিলিত করিয়া আপনার ইষ্টজ্ঞানে দাঁড় করাইবে, অর্থাৎ এই সম্বন্ধ-লীলাদিবিশিষ্ট ভগবান্‌ই নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ, ইহাই আমার প্রয়োজন, অর্থাৎ ভগবান্‌কেই প্রীত্যাস্পদরূপেই প্রয়োজন এই জ্ঞান হইবে, ইদং মদিষ্টম্ এই প্রকারই জ্ঞান হইবে। তদনন্তর ভক্তির ঐ ধর্ম্মভূত জ্ঞান হইতে ফলবিষয়িণী অত্যুৎকট ইচ্ছার উদ্গম হইবে ; সেই তৃষ্ণাময়ী ইচ্ছাকেই রুচি বলা যায়। ইহা জন্য জ্ঞান হইতে জাত নিজ সুখ তাৎপর্য্যে ফলবিষয়িণী ইচ্ছা রূপ তৃষ্ণা নহে। ভক্তির স্বরূপ যে আনুকূল্যাংশ, তাহারই স্বরূপগত জ্ঞানধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত তৃষ্ণাটিও আনুকূল্যাত্মিকা, ইহা নিজ ভোগতৃষ্ণা নহে। এই তৃষ্ণাই “ঈদৃশো ভগবৎসেবা-সুখৈকপরনিত্যপরিকরভাবো মে ভূয়াৎ” ইত্যাকার ধারণ করে। এই প্রকার ইচ্ছাটি বলবতী হইয়া এতাদৃশী প্রীতি রূপ ইষ্টটি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে

এমন একটি অনুসন্ধিৎসা আপনার মনে উদয় হইবে। ঐ মহৎমুখনিঃসৃত উপদেশে আপনার উপায়বিষয়ক জ্ঞান উদয় হইবে, অর্থাৎ অয়ং নিত্যপরিকর-নিষ্ঠো ভাব স্তদ্ভাবানুগসাধনভক্তিসাধ্যঃ এই প্রকার ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের উদয় হইবে। এই জ্ঞানের অনন্তরে ঐ সাধনের একটি ইচ্ছা জাত হইবে। ফলে ঐ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান এবং ভাবানুগসাধনে ইহা লভ্য হয় এই প্রকার কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান দৃঢ় হইয়া রাগানুগং ভক্তিসাধনং করোমি এই প্রকার সাধনে প্রবলা রুচি প্রকাশ পাইবে। ইহাকে চিকীর্ষা বলা যায়। এই চিকীর্ষাই প্রবৃত্তি। ইহাই রাগানুগা ভক্তির আবির্ভাবের কার্য্যকারণের ক্রম। এ স্থলে কার্য্যকারণ যাহা বলা হইল অর্থাৎ প্রথমতঃ ইষ্ট জ্ঞান, তাহা হইতে জাত ইষ্টবিষয়িণী ইচ্ছা, পুনশ্চ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান, তাহা হইতে সাধনেচ্ছা, পুনশ্চ কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান এবং ইষ্টসাধনতা জ্ঞানদ্বারা চিকীর্ষা, তদনন্তর প্রবৃত্তি, তদনন্তর চেষ্টা, এই ক্রমগুলি ভাগবতী ভক্তি ধর্ম্মে পরম্পরারূপে প্রকাশ পাইলেও ইহা জন্য জ্ঞান জন্য ইচ্ছা এই প্রকারের খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ইচ্ছা নহে। সর্ব্বত্রই নিত্য অখণ্ড একই ভক্তি শক্তিরই আবির্ভাব ক্রিয়ার ভেদে কোথাও স্বয়ং জ্ঞানরূপী আবার তাহা হইতে কার্য্যরূপী ইচ্ছা স্বয়ংই এই প্রকারে প্রকাশ পায়। ইহা অলীক সিদ্ধান্ত নহে। নিত্য বস্তুর অনন্ত বিলাস বৈচিত্রীর প্রকাশের এইরূপই ধারা।

রাগানুগা ভক্তির সাধন

রাগানুগা ভক্তির সাধনকে ভাবমার্গের সাধন বলা যাইতে পারে, কারণ শ্রীভগবানের বিশুদ্ধমাধুর্য্যময়ী লীলায় অবস্থিত নিত্যপরিকরদিগের **ভাবের অনুগত ভক্তির সাধনই** রাগানুগা ভক্তির সাধন। ইহাতে মনোধর্ম্মই প্রধান, বিশেষতঃ শাস্ত্রে এই রাগানুগা মার্গকে রুচিপ্রধান মার্গ বলা হইয়াছে। এই রুচিটি আবার মনেরই স্বরসতাময় ধর্ম্মবিশেষ। সুতরাং মনোধর্ম্মপ্রধান রাগানুগা সাধনকে একপ্রকার ভাবমার্গের সাধনই বলা যায়। এই সাধনে মানসিক ভাবনারই পরিচালনা মুখ্যভাবে হয় বলিয়াও ইহাকে ভাবমার্গের সাধন বলা যায়। কারণ শ্রীভগবানের নিত্য লীলাপরিকরদিগের যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব সকল, সেই সেই ভাবের উপযুক্ত সেবাকার্য্যগুলি

সাধকের সাধনাবস্থায় এই অসিদ্ধ দেহে সুষ্ঠুরূপে কখনই সম্ভব নহে। সাধক ভক্ত তত্তদ্ভাবোপযোগী ভগবৎসেবাকার্য্যগুলি মানসিক ভাবনার দ্বারাই সম্পন্ন করিবেন এবং সেই সেই ভাবের অবিরোধী ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনবিগ্রহপরিচর্য্যাদি বাচিক এবং শারীরিক সাধনও করিবেন। সুতরাং এই সাধনে ভক্ত্যঙ্গের **স্মরণাঙ্গই** প্রধান। কিন্তু স্মরণটি চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। কামক্রোধাদি দ্বারা জর্জ্জরিত, নিরন্তর অর্থযশোলোকসংগ্রহাদির লোভে বিষয়বিক্ষুব্ধ, পরের উৎকর্ষ অসহমান, বিষয়ভোগের নাশভয়ে বিকলতাপ্রাপ্ত, দম্ভাদিপরিপূর্ণ অশুদ্ধান্তঃকরণের কদর্য্যবৃত্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতাদি যে স্থলে ভক্তির ধর্ম্ম নামকীর্ত্তন পাঠ বক্তৃতা বিগ্রহার্চ্চনাদির মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করে, এমন সাধক-বর্গের "রাগমার্গ", "রাগানুগসাধন", "স্মরণমনন", "লীলাস্মরণ, লীলাস্মরণ" ইত্যাদি দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্যচ্ছটা বিস্তার দ্বারা কেবল অজ্ঞলোকদিগের রাগানুগা ভক্তির কৌতূহল নিবৃত্তি হয় বটে, বস্তুতঃ "স্মরণং শুদ্ধান্তঃ-করণতামপেক্ষতে" ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরের স্বতোরাগময়ভাবানুগত ভাবের সাধনটি কেবল মানসিক চিন্তনাদি স্মরণাঙ্গের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। রাগানুগা সাধনমার্গের স্মরণাঙ্গটি সাধকচিত্তে ভক্তির জাত্যনুরূপ **ভক্তিপরিকর পদার্থ সমূহকে** অতি ঝটিতি উদয় করায়। বৈধী ভক্তি অপেক্ষা এই ভক্তি অতিশয়বতী। শ্রীভগবানে রুচিবিশেষ মানসিক ভাবের দ্বারা যেমন মনের আবেশ জাত হয়, শাস্ত্রশাসনরূপ বিধিপ্রেরণা দ্বারা তেমন আবেশ জাত হয় না। শ্রীভগবান্‌কে নিজের প্রীতিমধুময় সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতে এবং নিজের দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাত্মাকে ভগবন্মাধুর্য্যামৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া মধুময় করিয়া তুলিতে ইহার তুল্য অন্য কোনও সাধন নাই। **বিশেষতঃ গোপীভাবে রাগানুগা সাধন পরমার্থ সাধনরাজ্যে অধ্যাত্মমনোবিজ্ঞানের অভিনব চরমবিজ্ঞান।*** সাধক ব্যক্তি শ্রীভগবানের দাস সখা গুরু (মাতা পিতা) কান্তা ভাবের মধ্যে রুচি অনুসারে কোনও ভাবের আশ্রয় স্বরূপ সেইভাবে ভগবৎপ্রীতিময় সেবোপযোগী নিজের কোনও সাধ্য দেহ স্মরণ করিবেন এবং শ্রীভগবান্‌কেও নিজের দাস্য সখ্যাদি যে ভাব সেই ভাবের মূলাশ্রয় যে ভগবন্নিত্যপরিকর সেই নিত্য-

*শ্রীপাদ গ্রন্থকারকৃত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থে "গোপীভাব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরিকরবিশিষ্ট ভাবেই স্মরণ করিবেন। ইহার নামই লীলাস্মরণ। এই **দ্বিবিধাত্মক স্মরণাঙ্গই রাগানুগা ভক্তি সাধনের পরিকর পদার্থ।** মহৎ কৃপায় গাঢ় প্রবল জাতরুচি সাধকের বিশুদ্ধান্তঃকরণে সমূহালম্বস্মরণবৎ এই দ্বিবিধ স্মরণ একসঙ্গেই হয়। তাদৃশ রুচির গাঢ় প্রবলতা যাঁহাদের নাই তাঁহাদের অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট অস্পষ্ট ভাবে স্মরণটি হয় অর্থাৎ পরিকরাদি সমন্বিত ভগবদ্‌রূপ বা লীলার স্মরণটি স্পষ্ট হয়, আর নিজের সাধ্য দেহের স্মরণ অস্পষ্ট হয়। আবার তদপেক্ষা রুচির গাঢ়তা যাঁহাদের স্বল্প, তাদৃশ সাধকের চিত্তে লীলাদির স্মরণ অস্পষ্ট এবং সাধ্যদেহের স্মরণটি কষ্টকর হইয়া উঠে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ওতপ্রোতের ন্যায় জড়িত এই উভয় স্মরণই রাগানুগা ভক্তিসাধনের পরিকর পদার্থ। উভয়ের স্পষ্টতাই উক্ত সাধনের পূর্ণতা। প্রথম সাধকের নিজ সাধ্য দেহের স্মরণ কষ্টকর হইলেও রুচিবশতঃ লীলাপরিকরবিশিষ্ট ভগবচ্চিন্তনে ক্রমশঃ রুচি গাঢ় হইলে সাধ্য দেহের স্মরণ সুখকর হইবে। সাধকের নিজের সাধ্য দেহ সম্বন্ধে সদ্‌গুরুর নিকট হইতেই সমস্ত অবগত হইতে হয়।

স্মরণাঙ্গ সাধন অবস্থাভেদে পঞ্চপ্রকার,—১। যৎকিঞ্চিৎ ভাবে মনের দ্বারা অনুসন্ধানই স্মরণ। ২। অন্য বিষয় হইতে যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া স্মর্য্যপদার্থে সামান্যাকারে মনের ধারণা করাই ধারণা। ৩। বিশেষভাবে রূপাদির চিন্তা করাই ধ্যান। ৪। ধ্যেয় পদার্থে অমৃতধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ধ্যানই ধ্রুবানুস্মৃতি। ৫। ধ্যেয় মাত্রেরই স্ফুরণই সমাধি।

রাগানুগা ভক্তি সাধনমার্গে প্রাথমিক সাধকগণ শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনকে সহচর করিয়াই স্মরণ করিবেন অর্থাৎ নিজভাবানুকূল প্রিয় নামাক্ষর জপ সহকারে লীলা রূপ পরিকরাদি স্মরণ করিবেন। দুর্ব্বলরুচিবিশিষ্ট প্রাথমিক সাধকদিগের লীলাপরিকরাদির স্মরণের প্রতি অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহাদের **ভাব** এবং **ভাবোপযোগী সেবার পরিপাটিই** মনের দ্বারা বারংবার অনুশীলন করিবেন। "লীলা স্মরণ লীলাস্মরণ" করিয়া ব্যস্ত হইবেন না। সাধক নিজ যোগ্যাধিকারকে লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার্য্য সাধনে যথেচ্ছ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে বস্তুতঃ অগ্রসর হইতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় লীলাস্মরণ লীলাস্মরণ যত বেশী শুনা যায়, হায়, নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণস্মরণ, পরিকর-

দিগের ভাব স্মরণ এইগুলি ততবেশী দূরে থাক, কিছুই শুনা যায় না। সর্ব্বোপরি দুঃখের বিষয় প্রকৃত **ভগবৎশরণাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধির কথা** হতভাগ্য আমার মোটেই **স্মরণ হয় না।** "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।" এই শ্রদ্ধার আসন মাত্র লোকভুলান মৌখিক বক্তৃতায় রাখিয়া অন্তরে কিন্তু কার্য্যের দ্বারা শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধের বিধানেই প্রস্তুত হই। অথচ "রাগানুগা রাগানুগা লীলাস্মরণ" ইত্যাদি অনধিকার বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করি। শ্রদ্ধার কথা কিছু বলি—ভক্তিমার্গে অধিকার বিষয়ে শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। যদিও জ্ঞান সাধন কর্ম্মসাধনাদিতেও শ্রদ্ধা ভিন্ন তত্তৎ বিষয়ে অন্তর্ব্বহিঃ প্রবৃত্তিই প্রকৃত হয় না, সুতরাং শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র সাধনে হেতু, তথাপি ভক্তিমার্গে জ্ঞানকর্ম্মাদি নিরপেক্ষ একমাত্র শ্রদ্ধাই হেতু।

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আর লৌকিকী শ্রদ্ধা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রার্থাবধারণজাত শ্রদ্ধাকেই বুঝায়। শাস্ত্রার্থবধারণজাত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাটি শ্রীভগবৎশরণাপত্তিভাবপ্রবলা হয়। বস্তুতঃ শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ যে বিশ্বাস তাহা ভগবৎশরণাগতিই। আমার শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে হইলে ভগবৎ শরণাগতির যে সকল লক্ষণ সেই লক্ষণ আমাতে প্রকাশ পায় কি না তাহার অনুসন্ধান করিলেই শ্রদ্ধা আছে কি না, শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা মন্দ শ্রদ্ধা কি মধ্যম শ্রদ্ধা কি তীব্র শ্রদ্ধা তাহাও বুঝা যাইবে। অনেকে "শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া শাস্ত্রের শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করা তর্ক বিতর্ক করাই উত্তম শ্রদ্ধা বলিয়া মনে করিলেও বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্র ভগবৎশরণাপত্তিরূপেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে শাস্ত্রার্থ দ্বারা এবং শাস্ত্রানুগত মনন প্রণালী দ্বারা নিপুণ অর্থাৎ **দৃঢ়নিষ্ঠাবান্** যিনি তিনিই উত্তম-শ্রদ্ধ। হৃদয়ে প্রকৃত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদয় প্রাপ্ত হইলে "শ্রীভগবান্ আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন" এই ভাবটি দৃঢ় হইয়া ভগবান্কে সর্ব্বতোভাবে নিজের রক্ষাকর্ত্তা মনে করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করা, তাদৃশ বিশ্বাসের অনুকূল সঙ্কল্প মনে উদিত হওয়া, তাহার প্রতিকূল ভাব পরিত্যাগ করা, শ্রীভগবানে নিজের অসামর্থ্য নিবেদন করা, এই শরণাগতি লক্ষণ গুলি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সদ্ভাব থাকিলে পারমার্থিক কার্পণ্য

ত দূরের কথা, ব্যবহারিক কার্পণ্যও থাকিতে পারে না। পরদ্রব্য পরস্ত্রী পরহিংসা পরনিন্দা অর্থযশ আদিতে স্বার্থান্ধতায় উন্মত্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণে নিজের দেহ দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মিথ্যা শঠতা পরস্পর জিগীষা প্রভৃতি যে সমস্ত কদর্য্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক কার্য্যগুলি আমরা করিয়া থাকি তাহার স্থান **শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় নাই**। নিত্যনৈমিত্তিকাদি বেদবিহিত সৎকর্ম্ম এবং স্বর্গাদি তত্তৎফল এমন কি মুক্তি সুখকে তিরস্কার করিয়া যে ভক্তি মার্গ তার মধ্যে আবার ভক্তির চরম পরম গতি যে রাগানুগা ভক্তি মার্গ তাহাতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে তাদৃশ অতি হেয় ব্যবহারিক কদর্য্য কার্পণ্য কখনই সম্ভব হয় না। এই শ্রদ্ধা আবার **রুচি**প্রবলা শ্রদ্ধা, যে শ্রদ্ধার প্রতি অবয়বে লোভের প্রাবল্যে শ্রীভগবানে ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়; তাহাতে যদি অতি হেয় প্রাকৃত প্রবৃত্তি প্রবল রূপে প্রকাশ পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে **ঐ ভক্তি বস্তুতঃ রুচি প্রবর্ত্তিতা নহে বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধামূলাও নহে**। ঐ প্রকার শ্রদ্ধাকে **লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা** বলা যায়। ঐ প্রকার কেবল লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় ভক্ত্যধিকারীই বলা যায় না। এখন বুঝুন রাগানুগা ভক্তিমার্গে প্রকৃত অধিকারী কে। ঐ প্রকার শ্রদ্ধাকে প্রশংসা মাত্র করা যায়, কিন্তু ভক্তিমার্গে অধিকারীর বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

মোট কথা এই যে এই "রাগানুগা ভক্তিতে" স্বল্পরুচি সাধক ব্যক্তিদিগের "লীলাস্মরণ" "লীলাস্মরণ" ইত্যাদি উচ্চ অধিকারীর অধিকার্য্যে বৃথা প্রৌঢ়ি না করিয়া প্রথমতঃ নামজপ, নামকীর্ত্তন, সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে অধিকারানুযায়ী ভগবল্লীলাকথা শ্রবণ এবং যথাসম্ভব লীলাকথাকীর্ত্তন **সাবধানের সহিত** করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সাবধান, শ্রবণকীর্ত্তনে মানসিক বাহ্যিক কদর্য্যবৃত্তির পরিচালনা যেন না হয়। নাম জপাদি দ্বারায় শুদ্ধ অন্তঃকরণে ধীরে ধীরে লীলাস্মরণের অধিকার আসিবে।

যস্যানুকম্পামৃতলেশভাজো মজ্জন্তি রগানুগভক্তিসিন্ধৌ।
বন্দে তমদ্ভুতমনন্তশক্তিং শ্রীরাধিকানন্দপদারবিন্দম্॥
রাগানুগামৃতাব্ধৌ মাং নিমজ্জয়তু সর্ব্বদা।
শ্রীযুতরাধিকানাথদেবস্য শ্রীযুতা কৃপা॥

যোগমায়া

বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্রে যে "যোগমায়া" শব্দের ব্যবহার হয় তাহার তাৎপর্য্য কি তাহা শ্রবণ করুন। "যোগমায়া" বলিতে দুইটি শব্দ পাই। একটি "যোগ" আর একটি "মায়া"। যোগ শব্দের অর্থ অচিন্ত্য, আর মায়া শব্দের অর্থ শক্তি, সুতরাং যোগমায়ার অর্থ অচিন্ত্য শক্তি। "মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়া" এই অর্থ বলে মায়া বলিতে বিচিত্রার্থকরী শক্তিকেই বুঝায়। আরও একটি অর্থ হয়, অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিকেই যোগমায়া বলা যায়। অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব ভগবানে অঘটনঘটনপটীয়সী বিচিত্রার্থকরী কোন **কার্য্যক্ষমতা** নিশ্চয়ই আছে। মনে রাখিতে হইবে সামান্যতঃ **কার্য্যক্ষমতার নামই শক্তি।** ভগবানের সেই কার্য্যক্ষমতারূপ শক্তির অবান্তর জাতীয়তা ভেদে এবং কার্য্যভেদে পরস্পর বিরোধী ভাব অবলম্বনে দুইটি ভেদ হয়। একটি চিজ্জাতীয়া বিচিত্রার্থকরী অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, আর একটি জড়জাতীয়া বিচিত্রার্থকরী অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। প্রথমটির কার্য্য শুদ্ধ অখণ্ড পরমানন্দ জ্ঞানরূপ পরতত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ পরতত্ত্বকেই বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাকেই অন্তরঙ্গা শক্তি, চিৎ শক্তি, যোগমায়া শক্তি ইত্যাদি বলা যায়। দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই অখণ্ড পরমানন্দ পরতত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহাকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, অনাদিকাল হইতে কেবলমাত্র জীবনিষ্ঠ হইয়া জীবকেই বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাকেই বহিরঙ্গা শক্তি, জড়া শক্তি, মায়া শক্তি ইত্যাদি বলা যায়।

প্রথমতঃ জড়া শক্তি মায়াকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিলে যোগমায়ার অর্থ বুঝিতে একটু সহজই হইবে। এই পরিদৃশ্যমান জড় বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্য

সম্পন্ন হইতেছে যে শক্তির বলে ঈশ্বরের সেই কার্য্যক্ষমতা শক্তিকেই মায়াশক্তি বলা যায়। এই মায়াশক্তির বিষয় জীব। শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে বিষয় করিয়া এই মায়াশক্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই প্রকার সাক্ষাৎ পরতত্ত্বস্বরূপকে, অথবা পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তিবর্গকে, কিম্বা সেই স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট পরতত্ত্বকে বিষয় করিয়া অনন্ত চিদানন্দের বিলাসবৈচিত্র্যবিধায়িনী স্বরূপশক্তিই ভগবানের **যোগমায়া নাম্নী শক্তি।** শ্রীভাগবতী ভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব হয়। ইহারই শক্তির বলে ভক্তের ভগবৎসেবোপযোগী চিদানন্দ দেহ গঠিত হয়। ইহার গঠন কার্য্য বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে গ্রহণ করিয়াই হয়। যে শক্তির বলে জীবের শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বে পরমানন্দঘন শ্রীভগবানের রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদির আনন্দানুভবের উপযোগী চিদ্‌বিভূতির অপূর্ব্ব গঠন কার্য্য ঘটন হয়, ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহময়ী শক্তির নামই **যোগমায়া।** "যোগায় মায়া" যোগমায়া। অনাদিবহির্ম্মুখতাপ্রাপ্ত জীব জড় মায়ার কুক্ষিকবলিত অবস্থায় অনাদিকাল হইতেই ভগবানের সহিত বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াই আছে। অহো! ভগবৎ তটস্থশক্তি ভগবদংশ হইলেও মায়াকুহকে হৃতসর্ব্বস্বা ভগবদ্বিয়োগিনী জীবপ্রকৃতিকে নিজের চিদ্‌বিলাসভূষণে ভূষিত করিয়া ভগবানের সহিত সংযোগ করাইতে যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী **তিনিই যোগমায়া।** ইনিই বৈষ্ণবদিগের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে উপাসিতা হইয়া থাকেন। ইনিই সদাশিবশক্তি চিদ্দুর্গা বৈষ্ণবী শক্তি **যোগমায়া।**

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবের শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বের উপর গঠনকার্য্যটি আবার কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি শক্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা বা **কার্য্যক্ষমতা।** পরতত্ত্বের স্বরূপগত কার্য্যক্ষমতাই স্বরূপশক্তি। এই শক্তি বা শক্তির কার্য্যগুলি পরতত্ত্বের শুদ্ধ স্বরূপ হইতে ভিন্নজাতীয় বা ভিন্ন স্বরূপ নহে, ইহা পরতত্ত্বের জাতীয় এবং পরতত্ত্বেরই স্বরূপ। পরতত্ত্বের স্বরূপ "সচ্চিদানন্দ", এই স্বরূপশক্তিটিও সচ্চিদানন্দরূপিণী। কিন্তু মায়াশক্তিটি পরতত্ত্বের বিজাতীয়া জড়া শক্তি, ইহা মনে রাখিতে হইবে। সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্বের সৎ শক্তি, চিৎ শক্তি এবং আনন্দ শক্তি, এই প্রকারে একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সচ্চিদানন্দ ভগবানের "সৎ" অংশে যে শক্তি অর্থাৎ সত্তারূপে যে কার্য্যক্ষমতা তাহাকে **সন্ধিনী** বলে; "চিৎ" অংশে যে শক্তি অর্থাৎ

জ্ঞান (প্রকাশ) রূপে যে কার্য্যক্ষমতা তাহাকে **সম্বিৎ** বলে; আর "আনন্দ" অংশে যে শক্তি অর্থাৎ আহ্লাদ (প্রিয়তা) রূপে যে কার্য্যক্ষমতা তাহাকে **হ্লাদিনী** বলে। ইহাদিগকে "অস্তি" "ভাতি" "প্রিয়তা" ইহাও বলা যাইতে পারে। এই ত্র্যাত্মিকা একই স্বরূপ শক্তি ব্যাপারভেদে অনন্তরূপ অনন্তকার্য্য অনন্তনামাদি ধারণ করিলেও মূলতঃ প্রধানরূপে "সন্ধিনী" "সম্বিৎ" "হ্লাদিনী" এই তিনভাগেই বিভক্ত হয়েন।

কার্য্যক্ষমতারূপা স্বরূপশক্তির কার্য্য

ভগবান্ স্বয়ং সদ্রূপ হইয়াও যে **ক্ষমতার** বলে সকল প্রকার সত্তার মূল পরমসত্তা ধারণ করেন এবং সকল পদার্থে সত্তা ধারণ করান এমন যে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল এবং সর্ব্বদ্রব্যাদি প্রাপ্তিকরী ভগবানের ক্ষমতা সেই "অস্তিতা" লক্ষণ পরমসদ্রূপা ক্ষমতাই ভগবানের **সন্ধিনী নাম্নী শক্তি**। এই প্রকারে স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও ভগবান্ যে ক্ষমতার বলে নিজে জানেন এবং সকলকে জানান ভগবানের তাদৃশ ক্ষমতার নামই **সম্বিৎ শক্তি**। এইরূপ ভগবান্ স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও যে শক্তির বলে নিজে আহ্লাদিত হয়েন এবং অপরকে আহ্লাদিত করেন সেই শক্তিই **হ্লাদিনী শক্তি**। এই ত্র্যাত্মিকা একই মূল শক্তি স্বপ্রকাশতালক্ষণ নিজ ব্যাপারবিশেষে বিশুদ্ধ সত্ত্ব নাম ধারণ করেন। নিজের প্রকাশে অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই, নিজেতেই "জ্ঞানজ্ঞাপন" বৃত্তি আছে। সুতরাং ইনি সম্বিৎ নামও ধারণ করেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব নাম্নী ত্র্যাত্মিকা স্বরূপ-শক্তিটি ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীতে কোথাও সন্ধিন্যংশপ্রধানা হইয়া **আধার শক্তি নাম ধারণ করেন,** যে শক্তির অনন্ত ব্যাপার ভেদে ভগবানের অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধামাদি প্রকাশ পায়; কোথাও সম্বিদংশপ্রধানা হইয়া জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তনা ব্যাপার জ্ঞাপনাদি শক্তি প্রকাশ করেন; যে শক্তির বৃত্তিটি পরতত্ত্বো-পাসকের পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানকে প্রকাশ করে সম্বিদংশপ্রধানা সেই শক্তিকে **আত্মবিদ্যা বলা** যায়; ঐ প্রকার আহ্লাদিনী প্রধানা হইলে **ভক্তি প্রীতি গুহ্যবিদ্যা** ইত্যাদি বলা যায়। ভগবৎপ্রিয়াবর্গ মহালক্ষ্মী গোপী প্রভৃতি হ্লাদিনী শক্তিরই মূর্ত্তি। এই প্রকার শ্রীভগবৎপদার্থের স্বরূপানুবন্ধিনী একই শক্তির ব্যাপারভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনন্ত রূপ অনন্ত নাম অনন্ত কার্য্য প্রকাশ পায়।

একই অখণ্ড জ্ঞানানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বপদার্থে নিজান্তরঙ্গ এই স্বরূপশক্তির অনন্তবিলাসবৈচিত্রীবলে ভোগ্যভোক্তৃভোগাদি লক্ষণ ধামলীলাপরিকরাদি অনন্ত বিশেষণে বিশিষ্টতা প্রকাশ করে, ইহাই সবিশেষ ব্রহ্ম বা ভগবান্। এ সমস্তই জড়মায়ার অতীত বিশুদ্ধ চিৎশক্তির বিলাস বৈভব।

যখন মহাভাগবত সাধুপুরুষের কৃপাপ্রণালীকে আশ্রয় করিয়া জীবে শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তি শক্তির আবির্ভাব হয় তখন হইতেই জীবের মধ্যে একটি অপ্রাকৃত গঠনমূলক কার্য্য হইতে থাকে। ভক্তির এই গঠনমূলক কার্য্যের পরিণতি সেই জীবকে ভগবানের **প্রেমবৎপার্ষদত্বভাবে পূর্ণ করা।** মোক্ষ দুই প্রকার; একটি চিন্মাত্ররূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ, আর একটি সাধ্যভক্তি-প্রাদুর্ভাব লক্ষণ মোক্ষ। উভয়ত্রই সংসারবন্ধনধ্বংসপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্তি আছে। প্রথম মোক্ষটিতে পরমানন্দ প্রাপ্তির বিশেষত্ব নাই। যেমন মনে করুন, কোন ভারবহনে কাতর ব্যক্তি নিজের মস্তকের ভার মাত্র নামাইয়াই নিজকে সুখী মনে করে। এই প্রকার দেহেন্দ্রিয়প্রাণাদির অধ্যাস জনিত সংসারভারক্লিষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধাত্মজ্ঞান দ্বারা তত্তৎ অধ্যাস হইতে মুক্ত হইয়া সংসার-ভার মাত্র নামাইয়া স্বরূপে অবস্থান মাত্র সুখই অনুভব করে, ততোধিক অন্য কোন নূতন সুখপ্রাপ্তি তাহার হয় না, কেবল দুঃখের নিবৃত্তি মাত্রই হয়। আর একজন ভারবাহী ব্যক্তি মস্তকের ভার নামাইয়া সুখস্পর্শ শীতল বায়ু সেবন, স্নিগ্ধসুপেয় পান, সুখময় শয্যাদিতে শয়ন প্রভৃতি অন্য নূতন নূতন সুখকর দ্রব্যাদি ভোগে অধিকতর সুখভোগ করে। দুইজনেরই মস্তকে ভার আর নাই, কিন্তু তার মধ্যে একজনের অপেক্ষা অন্যের যেমন সুখভোগ্য পদার্থলাভে সুখাধিক্য আছে, সেইরূপ চিন্মাত্রতারূপে অবস্থানরূপমুক্তি এবং সাধ্যভক্তির প্রাদুর্ভাবরূপমুক্তি এই উভয়বিধ মুক্তিতে দুঃখনিবৃত্তি আছে, তথাপি ভক্তির আবির্ভাবরূপমুক্তিতে ভগবৎপ্রেমসেবোপযোগী নূতন পরমানন্দপ্রদ কোন চমৎকারিতার আধিক্য আছে। ইহাই **প্রেমবৎপার্ষদত্ব।**

ভক্তি শক্তির একটি কার্য্য জীবকে শ্রীভগবানের প্রেমবান্ পার্ষদ রূপে সংগঠন করা। অর্থাৎ অনন্ত পরমানন্দঘন শ্রীভগবানের শুদ্ধ প্রীতিময় সেবনের দ্বার দিয়া অশেষে বিশেষে ভগবৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির বিচিত্র বিলাসানন্দানুভবের উপযোগী জীবের শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বে শুদ্ধ চিদাত্মজাতীয় দেহ

প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদির সংগঠন করাই ভক্তি শক্তির একটি কার্য্য। ভক্তি শক্তিতে যে গঠনকরী বৃত্তিটি আছে তাহা সম্বিদংশেরই কার্য্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে **আহ্লাদিনী শক্তির সার এবং সম্বিৎ শক্তির সার এই উভয়ের মিলিতাবস্থাই ভক্তি শক্তির স্বরূপ।** সুতরাং ভক্তি শক্তিতে যে সম্বিদংশ আছে তাহারই কোন উদ্রিক্ত বৃত্তির বলে এই অপূর্ব্ব সংগঠন কার্য্য সম্পন্ন হয়। **ভাগবতী ভক্তি শক্তিতে যে সম্বিৎ শক্তির সারাংশ আছে তাহাতে উক্ত প্রেমবৎ-পার্ষদত্ব সংগঠন কার্য্যের উপযোগিনী দুইটি বৃত্তি (ব্যাপার) আছে। একটি উপাদানাংশ দ্রব্যবৃত্তি আর একটি নিমিত্তাংশ অভিমানময়ী গুণবৃত্তি।** ঐ গুণবৃত্তিটি ভক্তির জাতি ভেদে চতুর্ব্বিধা হইয়া থাকে, ইহা পরে বলা যাইবে। এ স্থলে রহস্য এই যে প্রথমতঃ মহাভাগবত মহাপুরুষের কৃপানুগামিনী ভাগবতী ভক্তি শক্তি জীবে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধর্ম্মভূত স্বপ্রকাশতা লক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তিবিশেষ দ্বারা ভক্তি নিজের জাতি এবং পরিমাণাদির তারতম্যানুসারে শ্রীভগবান্‌কেই সাধকের নিকট প্রকাশ করে এবং জীবের মনঃপ্রাণদেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের সহিত তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান পূর্ব্বক তাদৃশ ভগবৎস্বরূপকেই বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ভক্তির জাতি পরিমাণাদির তারতম্যটি যেমন যেমন জাতীয় মহাভাগবতের সঙ্গ লাভ হয় তেমন তেমন ভাবেই হয়। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যোপাসক বৈধ ভক্তের সঙ্গগুণে ভক্তির জাতিটি ঐশ্বর্য্যময়ী বৈধী ভক্তি হয়; মাধুর্য্যোপাসক রাগানুগা জাতীয় ভক্তসঙ্গগুণে রাগানুগা জাতীয় ভক্তি লাভ হয়; এবং সেই সেই ভক্তকৃপার মাত্রার তারতম্যে অর্থাৎ কৃপাভাস, ঈষৎ কৃপা, অধিক কৃপা, পূর্ণ কৃপা ইত্যাদি পরিমাণের তারতম্যে ভক্তির আবির্ভাবেরও তারতম্য হয়, এবং তদনুপাতে ভগবৎস্বরূপস্বভাবের আবির্ভাবটিরও তারতম্য হয়। মোট কথা যেমন যেমন ভক্ত কৃপায় যেমন যেমন জাতীয় ভক্তি জীবে উদিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধকের নিকট ভগবান্‌ও তেমন তেমন স্বরূপ এবং স্বভাবকে প্রকটন করিয়া থাকেন। ভক্তি শক্তি নিজের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বপ্রকাশতা লক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তি দ্বারা ভগবান্‌কে সাধকের নিকট যেমন প্রকটন করেন তেমনই নিজের সম্বিদংশের উপাদানাংশ দ্রব্যবৃত্তি এবং নিমিত্তাংশ অভিমানময়ী গুণবৃত্তির দ্বারা সাধকের শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বের উপরেও প্রেমবৎপার্ষদত্বোপযোগী দেহমনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয়াদি

সংগঠন এবং তাহাতে অভিমানবৃত্তি স্থাপন করিতে থাকেন। এই অভিমানময়ী গুণবৃত্তিটি চতুর্ব্বিধ, যথা ঃ—অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানময়ী গুণবৃত্তি, মিত্রত্বাভিমানময়ী গুণবৃত্তি, অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী গুণবৃত্তি এবং প্রিয়াত্বাভিমানময়ী গুণবৃত্তি। যেমন যেমন ভগবৎস্বরূপস্বভাবের আবির্ভাব হয় সাধকের তেমন তেমনই অভিমান জাগে। আবার যেমন যেমন ভাগবত সঙ্গ হয় তেমন তেমনই ভগবৎ-স্বরূপ স্বভাবের আবির্ভাব হয়। ভাগবত মহাপুরুষের সঙ্গবৈশিষ্ট্যই ভগবদাবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণ। আবার ভগবদাবির্ভাববৈশিষ্ট্যই সাধকের চিদানন্দ পার্ষদদেহে অভিমানবৈশিষ্ট্যের কারণ। এই ক্রম সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।

কোন কোন সাধকে ভক্তির সম্বিদংশের উপাদানাংশ দ্রব্যবৃত্তির দ্বারা সংগঠিত চিদানন্দ দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণে (ভক্তির আবির্ভাবের বীজের তারতম্যানুসারে) ভগবদনুগ্রাহ্যত্বরূপ একপ্রকার অভিমানময়ী বৃত্তি স্থাপিত হয়। এই অনুগ্রাহ্যতাময়ী ভক্তির বৃত্তিটি সাধকের নিজ পার্ষদ দেহেই "আমি শ্রীভগবানের অনুগ্রাহ্য" এই ভাবটি আনয়ন করিয়া শ্রীভগবানে মহিত্বজ্ঞান পূর্ব্বক একপ্রকার স্নেহের উদয় করায়। মনে করুন, প্রথমতঃ কোন ভাগবত মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দঘন অখিলাত্মা পরম-প্রেমাস্পদ" ইত্যাদি মহামহিত্বসূচক বাক্য শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহতের কৃপানুগামিনী ভক্তি কোন ভাগ্যবান্ জীবে উদিত হইল। ভক্তি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির পরিমাণের তারতম্যানুসারে তাহার স্বপ্রকাশতা লক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তি দ্বারা তাদৃশ পরমানন্দত্ব নিখিলাত্মত্ব পরমপ্রেমাস্পদত্ব প্রকাশ করিয়া ভগবান্ও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (অর্থাৎ সে স্থলে যদি মহতের কৃপাটি কিঞ্চিন্মাত্রই প্রকাশ পায় তাহা হইলে ভগবদাবির্ভাবটি ঐ শ্রবণাদি-রূপেই কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ পাইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন। আবার কৃপাটির পরিমাণাধিক্যে ঐ শ্রবণটি একটি ভাবাকারে পরিণত হইয়া সাধকের চিত্তকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার পক্ষে ইহাই ভগবদাবির্ভাব। তদপেক্ষা কৃপার আধিক্যে ঐ শ্রবণটি ভগবানে তৃষ্ণার আধিক্য প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ শ্রবণাদি সাধনে লোভ জন্মান রূপেই ভগবদাবির্ভাব করায়। আবার যদি তদপেক্ষা অধিকতর কৃপা হয় তাহা হইলে সাধকের হৃদয়ে ভগবানের রূপ গুণাদি স্ফুরণ রূপ আবির্ভাই হইয়া থাকে। এই প্রকারে কৃপার পূর্ণতায়

ভগবানের আবির্ভাবও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল কৃপানুগামিনী ভগবদাবির্ভাবের তারতম্য)।

ঐ প্রকার ভগবদাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ জীবাত্মতত্ত্বের উপর সংগঠিত দেহে ভগবানের স্বরূপ স্বভাবের আবির্ভাবানুসারেই সাধকের তদুচিত অভিমান জাগিয়া উঠে। সাধকের তাদৃশ চিদানন্দ পার্ষদদেহে ভক্তির সম্বিদংশের অনুগ্রাহ্যত্বময়ী, মিত্রত্বময়ী, অনুকম্পিত্বময়ী, প্রিয়াত্বময়ী চারিটি অভিমানরূপিণী গুণবৃত্তির উদয়ের সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে যে সাধক ভক্তের পার্ষদদেহে অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানময়ী গুণবৃত্তির উদয় হয় সেই স্থলে সেই পার্ষদদেহের অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানের উপযুক্ত বিষয়রূপে ভগবানেরও স্বরূপ স্বভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভগবান্‌ও সেই ভক্তের তাদৃশ অভিমানের অনুকূলভাব প্রকটন করেন, অর্থাৎ তিনিও অনুগ্রাহকরূপে মহিমজ্ঞানের বিষয় হইয়া তাদৃশ অনুগ্রাহ্যতাভিমানী ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া থাকেন। ভক্ত ভগবানের এই প্রকার সম্বন্ধ-স্থাপিকা শক্তি ঐ ভাগবতী ভক্তিই।

এই অনুগ্রাহ্যতাভিমানী ভক্ত দুই প্রকার হয়। এক প্রকার শ্রীভগবানে নির্ম্মম ভক্ত, আর এক প্রকার ভগবানে সমম ভক্ত। তাদৃশ অভিমান স্থলেও ভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশ দুই প্রকারে হয়। নির্ম্মম অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানী ভক্তেতে ভগবানের পোষণ নামক অনুগ্রহমাত্রই প্রকাশ পায়। এই পোষণ শব্দের অর্থ এই যে ভগবান্ ব্রহ্মপরমাত্মস্বরূপের দ্বারা এবং তাদৃশ গুণ প্রকটন দ্বারা ভক্তকে আনন্দমাত্রই দান করেন। ভক্তও ভগবান্ পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভাবেই আনন্দনীয় অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভাবেই ভগবানে একমাত্র আনন্দ এইমাত্র অভিমানই পোষণ করেন। যেমন চন্দ্রে মমতা না থাকিলেও অর্থাৎ চন্দ্রটি আমার এই প্রকার অভিমান না থাকিলেও চন্দ্রদর্শনে আনন্দই হয় এবং চন্দ্র যেমন প্রীতিদ হইয়া থাকে সেই প্রকার তাদৃশ নির্ম্মম অনুগ্রাহ্যতাভিমানী ভক্তও ভগবদ্দর্শনে আনন্দ লাভ করেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহার পক্ষে সেই প্রকার প্রীতিদ হইয়া থাকেন। ইহাই ভগবানের পোষণরূপ অনুগ্রহ। আর তাদৃশ ভক্তের ভক্তিও স্তব স্তুতি প্রণাম বন্দনাদি আনুকূল্যাংশময়ী মাত্রই। ইহাই শান্ত ভক্তের শান্ত ভক্তি।

আর ঐ অনুগ্রাহ্যতাভিমান যদি সমম হইয়া উঠে তাহা হইলে ভক্তির স্বপ্রকাশতা লক্ষণ রূপ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তি বিশেষের দ্বারা ভগবানেরও তাদৃশ ভাবোপযোগী স্বভাব এবং স্বরূপবিশেষ আবির্ভূত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ সাধকে ভগবানের "অনুকম্পা" রূপ অনুগ্রহই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃ পূর্ণ হইয়াও ভগবান্ নিজেতে নিজ সেবাদি অভিলাষ সম্পাদন করাইয়া তাদৃশ ভক্তে সেবাদি সৌভাগ্য সম্পাদিকা ভগবানের চিত্তদ্রবময়ী ভক্তোপকারেচ্ছাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভগবদনুকম্প্য সমম ভক্তের ভক্তির আনন্দাংশের কার্য্য আনুকূল্যাংশটির আধিক্যে সম্বিদংশটি একটু আবৃত থাকায় "ইনি আমাদেরই প্রভু" এই প্রকার ভগবানে একটি মমতা ভাব উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে শান্ত ভক্ত অপেক্ষা অধিক আনন্দানুভব হইয়া থাকে। ইহাই দাস ভক্তের দাস্য ভক্তি। এক অনুগ্রাহ্যতাভিমানই নির্ম্মম সমম ভেদে শান্ত এবং দাস্য দুই প্রকার পার্ষদ দেহ হয়।

আবার কোন কোন সাধকে ভক্তসঙ্গের ভেদে ভক্তির আবির্ভাবের তারতম্যে ভক্তির সম্বিৎ ভাগের অন্যবিধ নিমিত্তাংশ গুণবৃত্তিটি মিত্রতাভিমানরূপে প্রকাশ পায়। তাহাতে আবির্ভূত শ্রীভগবানে ভক্তের একটি অনির্ব্বচনীয় প্রেমবিশ্রম্ভ-ভাবের উদয় হয়, যাহার ফলে সমভাবে নিরুপাধি প্রণয়ের আশ্রয়বিশেষরূপে সখ্যভাবটি প্রকাশ পায়। এ স্থলেও ভক্তির স্বপ্রকাশতালক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভক্তি ভগবান্‌কে, তাদৃশ ভক্তের সখ্যোচিত সম মধুর শীলবয়োবেশাদিকে নিরুপাধি প্রণয়ের আশ্রয় বিষয়রূপে প্রকাশ করে। ইহাতে ভক্তির আনন্দভাগটি প্রবল হইয়া নিঃসঙ্কোচ আনুকূল্যাত্মতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ নিঃসঙ্কোচ আনুকূল্যাত্মতার প্রাবল্যে শান্তের পরব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞান এবং দাস্যের প্রভুজ্ঞানকে আবরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচ প্রীতিময় সেবানন্দ বিশেষকেই প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাই সখা ভক্তের সখ্য ভক্তি।

আবার কোথাও সাধকে ভক্তসঙ্গভেদে ভক্তির উদয়ে ভক্তির সম্বিৎ ভাগের অন্যবিধ নিমিত্তাংশ গুণবৃত্তিটি গুরুত্বভাবাভিব্যঞ্জিকা হইয়া অনুকম্পিতাভি-মানময়ী রূপে প্রকাশ পায়। সেই স্থলে ভগবান্‌ও ভক্তির স্বপ্রকাশতা লক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তি বিশেষ দ্বারা তাদৃশ ভক্তের নিকট লালন পালন সেবাদি-রূপ উপকারপ্রার্থী রূপেই প্রকটিত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানে

লাল্য পাল্যাদিভাবে অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী ভক্তির বৃত্তিই বাৎসল্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি প্রীতিরূপা ভক্তি মাত্রেই বাৎসল্যটি উপলক্ষণ, তথাপি বাৎসল্য ভক্তির মুখ্য প্রবৃত্তি এই গুরুত্বভাবময়ী অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী বৃত্তিতেই। "বৎসে গৌরিব বৎসলা।" এই বাৎসল্য ভক্তিতে আনন্দাংশের প্রবলাধিক্যে জ্ঞানাংশের উপর আনুকূল্যভাবের গুরুত্বই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। শান্তের পরব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞান এবং দাস্যের প্রভুজ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং সখ্যের নিঃসঙ্কোচ আনুকূল্যাত্মতার উপর মদীয় অর্থাৎ "এ আমারই" এই প্রকার একটি অভিমানের গুরু চাপ দিয়া নিঃসঙ্কোচানুকূল্যাত্মতাকেই কোন অনির্ব্বচনীয় মদীয়তাময় গুরুত্বে পূর্ণ করিয়া তুলে। তখন ভক্তির সম্বিদংশটি আনন্দের অধীন হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্যাংশকে শিথিলীভূত করাইয়া মহামাধুর্য্য উদ্গীরণ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ প্রেমসেবা গ্রহণে অনুকম্প্য, আর ভক্ত প্রেম-সেবাদানে অনুকম্পী, এই প্রকার সম্বন্ধই ভক্তভগবানে স্থাপিত হয়। ইহাই বৎসল ভক্তের বাৎসল্য ভক্তি।

আবার কোন কোন সাধকে ভক্তসঙ্গভেদে ভক্তির উদয়ে ভক্তির সম্বিৎ ভাগের উপাদানাংশ দ্বারায় গঠিত চিদানন্দ পার্ষদ দেহে ঐ সম্বিৎ ভাগের অন্যবিধ নিমিত্তাংশ গুণবৃত্তিটি প্রিয়াত্বাভিমানময়ী রূপে উদিত হইয়া শ্রীভগবৎ প্রীতিময় সেবানন্দের চরমাধিক্যই প্রকটন করে। সে স্থলে শ্রীভগবদাবির্ভাবও পরমপ্রেমাস্পদ কান্ত রূপেই হয়। তখন ভক্তিশক্তির স্বপ্রকাশতালক্ষণ জ্ঞানজ্ঞাপন বৃত্তিটি নিজের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগ-বান্‌কে অসমোর্দ্ধ পরমানন্দকন্দকন্দলীভূত মহাশ্চর্য্যময় মাধুর্য্যের চরম নিদান রূপে প্রকট করাইয়া ভক্ত ভগবান্‌কে পরিপূর্ণতম আনন্দ রস আস্বাদন করাইয়া থাকে। ইহাই মধুর জাতীয় ভক্তি, এই ভক্তিতেই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতা। শান্ত ভক্তি, দাস্য ভক্তি, সখ্য ভক্তি, বাৎসল্য ভক্তির মাধুর্য্যসার সমস্তই এই মধুর ভক্তিমাধুর্য্যে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, অধিকন্তু চরমনিঃসঙ্কোচপ্রিয়তা, সর্ব্ববিধ সেবা প্রেমানন্দের পরাকাষ্ঠা এই কান্তাভক্তিতেই। **এই মধুর জাতীয় ভক্তির চরম পূর্ত্তি গোপী ভাবেই প্রকাশ পায়।***

*শ্রীপাদ গ্রন্থকারের "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে উৎকৃষ্ট দার্শনিকযুক্তিশাস্ত্রসম্মত "গোপীভাব" প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ **মধুরেতে** বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে॥" —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ইহা অলীক কল্পনা নহে, "ভক্তিসংস্কার" নিমিত্তকারণ বশতঃ এই প্রকার চিদানন্দ দেহের গঠন হয়। ভক্তি শব্দের অর্থ সেবা, সেবা শব্দের তাৎপর্য্যই "আনুকূল্য"। ভগবৎপ্রীত্যানুকূল্য ভাবনাই ভক্তিসংস্কার। ভক্তের যে ভগবৎ-ভক্তিসংস্কার প্রীত্যানুকূল্য ভাবনা সেই ভাবনার সাফল্যের জন্যই পাতঞ্জল দর্শনের "প্রকৃত্যা পূর" ন্যায়ে অর্থাৎ উৎকট পুণ্য বা পাপ প্রভাবে যেমন এই মনুষ্য শরীরে ইন্দ্রিয়াদির অপগম হইয়া দেবাদিদেহ বা তির্য্যগাদি দেহেন্দ্রিয় ধারণটি প্রকৃতির পরিণাম ক্ষিতিজলাদি দ্বারা প্রকৃতিই পূরণ করে, যেমন রাজকুমারের শিবপার্ষদ নন্দীশ্বর রূপে দেহ লাভ, আবার যেমন নহুষের দেবদেহের অপগম হইয়া তির্য্যগ্‌দেহ লাভ, এইরূপ পরাপ্রকৃতি চিৎশক্তি যোগমায়া জড়মায়ার উপাদানকে জড়মায়ার নিমিত্তকে (অবিদ্যা অস্মিতাদিকে) অপসারণ করিয়া নিজের চিদ্‌বিলাস (বস্তুতঃ বিকার নহে) বৈচিত্র্যময় উপাদান দ্বারা ভক্তের দেহকেও চিন্ময় করেন। জড়মায়ার উপাদান প্রবৃত্তি যেমন ঈশ্বরানুমোদিত অদৃষ্ট বশতঃই হয়, "ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা" (কৈবল্যপাদ ব্যাসভাষ্য), তেমনই ভক্তের চিদানন্দময় দেহাবয়ব পূরণে **"ভক্তিসংস্কারনিমিত্তমপেক্ষমাণা" যোগমায়া।** এই জন্যই মহাপুরুষ-কৃপোদ্ভূত ভক্তিসংস্কারকে "পরমসংস্কার" বলা হইয়াছে। এই ভক্তিসংস্কার অনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ মায়াহত জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ, আবার সুলভও বটে, ইহা সুদুর্ল্লভ, কারণ মহাপুরুষের কৃপা কৃতিসাধ্য নহে, কোন্ অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে কাহার ভাগ্যে কখন্ উদয় হইবে তাহা বলা যায় না, তবে যখন যাহার ভাগ্যে উদয় হয় তখন তাহার পক্ষে ইহা সুলভই বলিতে হইবে।

ভক্তিলতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আহ্লাদিনী ও সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তির মিলিত সারাংশরূপা

ভক্তি

- আহ্লাদ বৃত্তি (আনন্দরূপ পুরুষার্থ সর্ব্বত্রই)
- জ্ঞান বৃত্তি (ধর্ম্মভূত জ্ঞান)
  - জ্ঞান জ্ঞাপন বৃত্তি (শ্রীভগবান্ ও ভক্তকে প্রকাশ করা কার্য্য)
  - কারণ বৃত্তি
    - নিমিত্ত (গুণবৃত্তি, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি প্রকার সম্বন্ধে অভিমান স্থাপন করা কার্য্য)
    - উপাদান (সম্বন্ধাভিমানানুসারী সেবোপযোগী পার্ষদ দেহ গঠনোপযোগী দ্রব্য বৃত্তি)
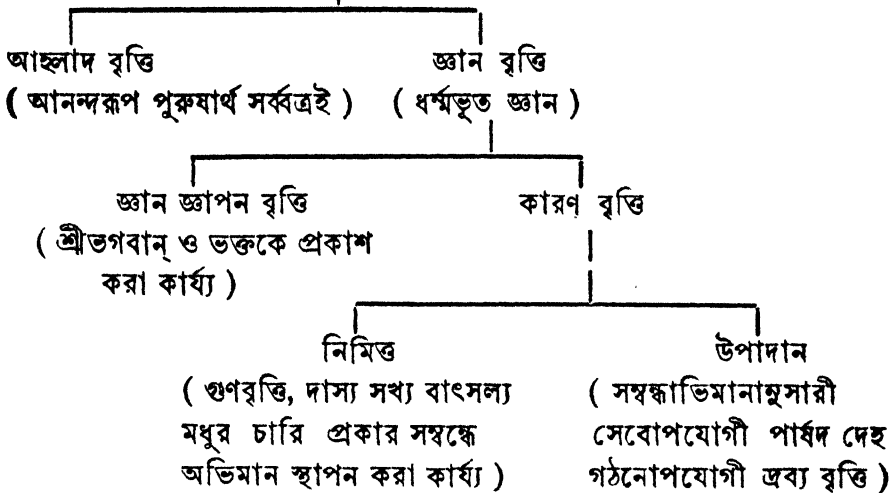
এখন আমার বক্তব্যের সার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। **ভগবদাহ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত সম্বিৎ শক্তির সারাংশরূপা ভক্তি নাম্নী ভাগবতী শক্তি** সৎ মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া স্বীয় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ যে অচিন্ত্য কার্য্যক্ষমতার বলে নিজাংশ সম্বিৎ শক্তির জ্ঞান জ্ঞাপন বৃত্তি দ্বারা সাধক হৃদয়ে "শ্রীভগবানের অবির্ভাব" করায় এবং অন্য অংশ উপাদানবৃত্তির দ্বারা ভক্তিমান্ সাধকের "প্রেমবৎপার্ষদ দেহ" সংগঠন করে এবং গুণবৃত্তির দ্বারা সেই পার্ষদ দেহে ভগবৎপ্রেমানুসারী "অভিমানের উদয়" স্থাপন করে, সেই সম্বিৎ শক্তির কার্য্যক্ষমতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই **যোগমায়া**। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সৎ-চিৎ-আনন্দাত্মিকা একই বিশুদ্ধসত্ত্বনাম্নী ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তিই কার্য্যভেদে অনন্তগুণা অনন্তরূপা অনন্তনাম্নী হইয়া বিরাজ করে। ভাগবতী ভক্তিশক্তির সম্বিদংশের (চিদংশের) যে বৃত্তিটি প্রধানা হইয়া স্বপ্রকাশতা লক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞান বৃত্তিটির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকেও অনুভব করায়, চিৎপ্রধানা সেই শক্তিবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই **যোগমায়া**। আবার ঐ ভাগবতী ভক্তি শক্তির যে চিদংশের উপাদানাংশ দ্রব্যবৃত্তি সাধকের শুদ্ধাত্মতত্ত্বে চিদানন্দ দেহ

মন আদি সংগঠন করে তাহার অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিও **যোগমায়া**। আবার ঐ ভাগবতী ভক্তিশক্তির যে চিদংশের গুণময়ী বৃত্তিটি সাধকের তাদৃশ পার্ষদদেহে ভগবৎ প্রীত্যুপযোগী দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রিয়াত্ব ভাবময় অভিমান স্থাপন করে, সেই চিৎপ্রধানা গুণবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও **যোগমায়া**। মোট কথা ভাগবতী শক্তিটি ভগবৎপ্রকাশিকা ভগবৎপ্রাপিকা রূপে চিদংশপ্রধানা হইয়া যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে সেই মূর্ত্তিই **যোগমায়া**।

শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণ এই ভগবত্তত্ত্বপ্রকাশিকা এবং ভগবৎপ্রাপিকা চিদংশ-প্রধানা যোগমায়াশক্তিকে **নিজ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী রূপে** উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবদ্‌বৈকুণ্ঠলোকে ইনিই চিদ্‌দুর্গারূপে সতত বিরাজিতা। ইনিই শ্রীবৃন্দা-বনীয় লীলায় সর্ব্ব যোগমায়া শক্তির অংশিনী রূপা পরম যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলিয়া খ্যাতা। এই যোগমায়া শক্তির অংশই আহ্লাদিনী শক্তির আধিক্যে **লীলাশক্তি** নাম ধারণ করে। ভগবানের অচিন্ত্য লীলাশক্তিকেও যোগমায়া বলে। ইনিই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ কর্ত্তৃক পূজিতা **কাত্যায়নী সদাশিবশক্তি যোগমায়া**।

ভক্তির গৌণমুখ্যরূপে আবির্ভাবের রহস্য

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তিটি ভগবানেরই শক্তি। জীবে ভক্তির আবির্ভাব দুই রূপে হয়, গৌণরূপে আর মুখ্যরূপে। প্রথমতঃ গৌণরূপে ভক্তির আবির্ভাবের কথা বলি। বর্ণাশ্রমাদ্যুচিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির দ্বার দিয়া এবং আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান বা যোগবৈরাগ্যাদির দ্বার দিয়া যে ভক্তিটি প্রকাশ পায়, অথচ সেই ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি বা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিই মুখ্যরূপে থাকে, ভক্তির স্বরূপটি মুখ্যরূপে প্রকাশ পায় না, সেইস্থলে মহৎকৃপা বিনাই ভক্তিটি যৎকিঞ্চিৎ আভাসরূপেই উদিত হয়। ইহাই গৌণী ভক্তি। এই গৌণী ভক্তির মূলে **মহৎকৃপা** না থাকা হেতু জীবের শুদ্ধাত্মতত্ত্বের উপর ঐ ভক্তিশক্তির ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় না। ইহার রহস্য এই যে যেমন ঊর্দ্ধগমন ও সর্ব্বতঃ প্রসরণশীলা কোনও লতিকা ঊর্দ্ধগমনের উপযোগী কোনও আশ্রয় না পাইলে, আবার কোন সময়ে কচিৎ যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় পাইলেও যদি তাহার মূলে তদুচিত রসবাহিকা

শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আর সেই লতিকা সর্ব্বতঃ প্রসারিণী হইয়া অধিকতর উর্দ্ধগামিনী হইতে পারে না, তেমনই ভক্তিলতিকাও শুদ্ধপ্রীতির পরমাস্পদরূপে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় না পাইলে, দৈবাৎ কোন সময়ে সৎশাস্ত্রাদি শ্রবণাদিকালে শুদ্ধপ্রীতিমহিমা শ্রবণ করিলেও, মূলে ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষের করুণারূপ রসবাহিকা শক্তির অভাবে শুদ্ধাত্মতত্ত্বকে অধিকার করিয়া তদুপরি নিজের প্রসারতা প্রকাশ করিতে পারে না। কর্ম্মজ্ঞানাদি-মুখ্যা ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন হইয়া চলে বলিয়াই বস্তুতঃ ইহা আভাসরূপা এবং গৌণীরূপেই প্রকাশ পায়। এই আভাসরূপা গৌণীভক্তি শুদ্ধাত্মতত্ত্বের উপর আবির্ভূ'তা হইয়া শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান ইচ্ছাদিকে নিজতন্ময় করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা **প্রকাশ পায় না**, ইহা মায়িক দেহ ইন্দ্রিয় মন আদিতে "অহং"গ্রস্ত অধ্যাসিত আত্মার মায়িক জ্ঞান ইচ্ছাদির আনুগত্যে মায়িক দেহেন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞানাদির সহচরী হইয়া চলিতে থাকে। মায়িক উপাধির অনুগামিনী হওয়ায় আর মায়াতীত শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বের উপর এই ভক্তির অধিকার থাকে না। যে যাহার অধীন সহগামী, তাহার গতি-নিবৃত্তিতে সেই সহগামীরও গতির নিবৃত্তি হয়। সকাম স্বধর্ম্মাচরণের গতি ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচরণের গতি চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত ; ইহার উর্দ্ধে বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের গতি নাই, সুতরাং কর্ম্মানুগামিনী ভক্তিরও ইহার উর্দ্ধে গতি থাকিতে পারে না। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানাদির গতি শুদ্ধ চিদাত্ম-জ্ঞানাবধি ; তদূর্দ্ধে তাদৃশ জ্ঞানাদির আর গতি না থাকায়, সেই জ্ঞানাদির অনুগামিনী ভক্তিরও আর তদূর্দ্ধে গতি হইতে পারে না। আবার ঐ ভক্তির মূলে ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষের প্রবল করুণা শক্তি না থাকায় উহা তাদৃশ কর্ম্ম বা জ্ঞানাদিকে ভেদ করিয়া স্বয়ং প্রবল হইয়া শুদ্ধাত্মতত্ত্বের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে না। ইহাই ভক্তির আভাস এবং গৌণরূপে আবির্ভাব।

এখন মুখ্যা ভক্তির উদয়ের কথা বলি। সদ্‌ভক্তকৃপাপরিমলপরিবাসিতা ভক্তিদেবী (আভাসরূপা নহেন) স্বপ্রকাশরূপা হইয়াই জীবের স্বপ্রকাশ শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপরই নিজের সিংহাসন রচনা করেন। মহৎকৃপাপ্রেরিতা ভক্তিশক্তিটি প্রথমতঃই জীবের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে অবস্থিতি লাভ করিয়া শুদ্ধাত্মার শুদ্ধ স্বরূপভূত ধর্ম্মজ্ঞান ইচ্ছাদিকে নিজের স্বপ্রকাশতাময় জ্ঞানবৃত্তির সহিত

তাদাত্ম্যরূপে মিলিত করিয়া একটি স্পন্দনের সৃষ্টি করেন। এই প্রকার শুদ্ধ চিদাত্মতত্ত্বের উপর আবির্ভূতা ভক্তি যে স্পন্দন সৃষ্টি করেন, তাহা **যুগপৎ ত্রিবৃৎ স্পন্দন**। এই ত্রিবিধ স্পন্দনের মধ্যে একটি **দ্রব্যবৃত্তির** স্পন্দন, যাহা দ্বারা সেই **শুদ্ধচিদাত্মতত্ত্বে শুদ্ধাত্মস্বরূপ চিদানন্দময় দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি গঠিত হয়**; সঙ্গে সঙ্গে আর একটি **গুণবৃত্তির স্পন্দন** যাহা দ্বারা ঐ শুদ্ধ চিদানন্দময় দেহে **"আমি ভগবদ্দাস", "আমার কার্য্য ভগবৎপ্রীতি"** ইত্যাদি অহংমমাকার চিদভিমান (ইহা জড় প্রকৃতি জাত অভিমান নহে) স্থাপিত হইয়া **ভক্তির বাসনা** সৃষ্ট হয়; সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি **ক্রিয়াবৃত্তির স্পন্দন** যাহা দ্বারা সেই শুদ্ধ চিদভিমানবিশিষ্ট চিদানন্দময় দেহেন্দ্রিয় মন আদিতে ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন অর্চ্চন স্মরণাদি রূপ ভক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। বস্তুতঃ মহৎকৃপাসঞ্চালিতা স্বপ্রকাশরূপিনী ভক্তি সাধক জীবের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ পান না, মহৎ কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ সাধকের শুদ্ধ চিদাত্মাতেই ভক্তি উদিত হইয়া চিন্ময় দেহ গঠন পূর্ব্বক সেই দেহেই প্রকাশ পান, সঙ্গে সঙ্গে "জ্বলল্লৌহ"বৎ এই জড় দেহেন্দ্রিয়াদিতে সেই চিদানন্দভক্তিময় শরীরটি তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জড়ীয় দেহ মন ইন্দ্রিয়কেও অপ্রাকৃত করিয়া তুলে। মহৎকৃপাবাহনা ভক্তি প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিস্পাদিত কোনও কর্ম্ম বা জ্ঞানাদির অধীন হইয়া চলেন না, নিজে স্বাধীন হইয়া উহাদিগকে নিজের অধীন করিয়াই চলেন।

মহদ্ভেদে মহৎসঙ্গের তারতম্যে এবং মহতের করুণাভেদে এই মুখ্যা ভক্তি দুইপ্রকারে জীবে উদিত হয়েন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ মহৎ কৃপায় জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্বস্বরূপে যে উদয় তাহাকে শুদ্ধা ভক্তি বলা যায়। আর জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রভক্তিসিদ্ধ মহৎকৃপায় ভক্তি স্বস্বরূপে উদয় প্রাপ্ত হইয়াও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিয়া প্রধানীভূতা থাকেন, কিন্তু ইনিও পরিণামে শুদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়েন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মহাভাগবতকৃপাসঞ্চালিতা ভক্তিই সাধকের প্রারব্ধাদি যাবতীয় কর্ম্মবন্ধন বিধ্বংসন পূর্ব্বক ভগবৎপ্রেমবৎপার্ষদ গতিরূপ বিমুক্তিদায়িনীই হয়েন। সুতরাং **যোগমায়াও ভক্তিরই রূপ বিশেষ** একথা বলা যাইতে পারে।

প্রারব্ধখণ্ডন

সাধন ভজন দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে প্রারব্ধ খণ্ডন হয় কি না এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় দুইটি মত প্রবল দেখা যায়। প্রথম মতে প্রারব্ধ খণ্ডন হয় না; ইহা কোন কোন শাস্ত্র এবং বিদ্বদনুভব প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রথম মতবাদী শাস্ত্র এবং বিদ্বদ্গণ বলেন যে প্রারব্ধ শব্দের অর্থ—যাহা ফলের নিমিত্ত প্রকর্ষরূপে আরব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রকর্ষভাবে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়াই তাহা আর খণ্ডন হইতে পারে না। তাই শাস্ত্রে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্ম কৃতং শুভাশুভম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশ্য ভোক্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইত্যাদি গীতার তাৎপর্য্য প্রারব্ধেতরাণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় না, ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ। তাঁহাদের মতে যুক্তি এই যে কর্ম্মভোগের জন্যই দেহ; যে সকল কর্ম্ম প্রকর্ষ প্রাপ্ত অর্থাৎ ফলোন্মুখ হইয়া দেহের আরম্ভক তাহার নামই প্রারব্ধ কর্ম্ম। দেহারম্ভক প্রারব্ধের নাশ হইলে দেহও নাশ প্রাপ্ত হইবে। কারণ নাশ পাইলে কার্য্য থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহ বর্ত্তমানে প্রারব্ধের নাশ হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে তবে আর সাধন ভজন করার সার্থকতা কি? উত্তরে বলা যায় যে প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্তৎ দেহারম্ভক সামান্য কতকগুলি কর্ম্মমাত্রই; ইহা ভিন্ন জীবের অনাদি সঞ্চিত রাশি রাশি কর্ম্ম বীজরূপে এবং কূটরূপে সর্ব্বদাই আছে। বর্ত্তমান দেহে কতকগুলি প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইতে হইতে ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম গুলির মধ্যে যোগ্য কতকগুলি কর্ম্ম নূতন প্রারব্ধ হইয়া জীবকে ভাবী নূতন দেহ ধারণ করাইয়া যাহাতে ফলভোগ করাইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে

থাকে এবং এই বর্ত্তমান দেহ নাশের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে প্রবল ঐশ্বরিক প্রেরণা শক্তির বলে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া নূতন প্রারব্ধরূপে দণ্ডায়মান হয়, যাহার ফলভোগের জন্য আবার দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্মাদি পরিগ্রহ করিতে হয়। এই প্রকারে সেই সঞ্চিত অফুরন্ত কর্ম্মকূট সমূহ ভোগ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। অনাদি কাল হইতেই মায়ামুগ্ধ জীবগণ কর্ম্মফল সমূহের মধ্যে কতকগুলি ফলোন্মুখ কর্ম্মের সমষ্টি এক প্রারব্ধ রূপে শেষ করিয়া আবার নূতন প্রারব্ধের হাতে পড়ে; এইরূপে অনন্ত জন্ম মৃত্যু চক্রের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। সাধন ভজনের দ্বারা পরতত্ত্ব জ্ঞানরূপ সাম্মুখ্য লাভ হইলে ঐ সঞ্চিত কর্ম্মরাশি আর নূতন প্রারব্ধরূপে দাঁড়াইয়া ভাবী দেহারম্ভক হইতে পারে না। পরতত্ত্বসাম্মুখ্যলাভ হইলে প্রারব্ধেতর সঞ্চিত সর্ব্ববিধ শুভাশুভ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ভাবী জন্মমৃত্যুর ধারা আর থাকিতে পারে না। ইহাই সাধন ভজন করার সার্থকতা। মাত্র প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হয় না বলিয়া সাধন ভজনের নিরর্থকতা বলা যায় না।

সন্দেহ হইতে পারে তবে আর কেবল মাত্র সঞ্চিত কর্ম্মনাশের জন্য ভগদ্ভজনাদির প্রয়োজন কি? কেন না যদি একদেহে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইতে হইতে সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ হইতে যোগ্য কতক কতক কর্ম্ম আবার প্রারব্ধরূপে দাঁড়াইবার জন্য পুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং সেই দেহের প্রারব্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঐ পুষ্ট কর্ম্মসকল প্রারব্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে পুনরায় দেহ ধারণ হয়, আবার সেই দেহে প্রারব্ধ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রকার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি হইতে পূর্ব্ববৎ প্রারব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, এবং পুনরায় দেহ ধারণ হয়, যদি এই প্রকারে সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রারব্ধরূপে দাঁড়াইয়া ভোগান্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে যত রাশি রাশি কর্ম্ম থাকুক না কেন একদিন নিঃশেষ ত হইবেই; সুতরাং সাধন ভজনাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাদির প্রয়োজন কি?

এ সন্দেহের অবসর আছে বটে। তবে এখানে কর্ম্মচক্রের একটু রহস্য আছে। জীব যখন প্রারব্ধোচিত মানুষ দেহ ধারণ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে, সেই সময় সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাসনা করিয়া কর্ম্মকূটও সঞ্চয় করিতে থাকে। মনুষ্য হৃদয়ে নিরন্তর যে সকল বাসনার উদয় হয়

তাহার মধ্যে কতকগুলি বাসনা তৎকালে ভোগ হইতেছে যে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহারই সহায় হইয়া দাঁড়ায়, আর কতকগুলি বাসনা চিত্তে আহিত সংস্কার রূপে অবস্থান লাভ করে এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম রাশিতে মিলিত হইয়া কর্ম্মস্তূপকে অফুরন্তই করিয়া রাখে। ইহাই অবিদ্যাগ্রস্ত মানুষের কর্ম্মচক্র। সাধন ভজন দ্বারা পরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে এই বাসনার মূল জীবের অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইয়া এই কর্ম্মচক্রের নিবৃত্তি হয়। এই কর্ম্মচক্রের মূল কারণ জীবনিষ্ঠ অবিদ্যাই।

পরতত্ত্ববহির্ম্মুখ জীবগত অবিদ্যা হইতেই এই বাসনার সৃষ্টি। এই বাসনা সৃষ্টির কোনও নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বাদি দিন নাই, অর্থাৎ অমুক দিন হইতেই জীবের বাসনা প্রথম আরম্ভ হইল এই প্রকার দিন নির্দ্ধারণ নাই। এই জন্য এই কর্ম্মকে অনাদি বলা যায়। অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের প্রাকৃত কর্ম্ম বাসনা করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই বাসনা ভোগের জন্য দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি দেহ ধারণও জীবের অনাদি প্রবাহরূপে হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে একমাত্র মনুষ্য দেহই জীবের পূর্ণ কর্ম্মময় দেহ। দেবাদি পুণ্যময় শরীর ভোগময় শরীর, তির্য্যগাদি পাপময় শরীরও ভোগময় শরীর। ঐ সকল ভোগময় শরীরে ভোগের ভাব প্রচুর থাকায় যাহা যাহা বাসনা উদিত হয় তাহা প্রায়শঃ তত্তৎ দেহাবচ্ছিন্ন ভোগেরই অনুকূল হয় এবং সেই সেই দেহের প্রারব্ধ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাসনার ফলও ভোগ হইয়া যায়। তাহাদের বাসনা আর চিত্তে আহিত সংস্কার রূপে প্রায়শঃই সঞ্চিত হয় না। তবে দৈবাৎ কচিৎ কোথাও ভোগময় শরীরেও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম সংস্কার রূপে আহিত হয়, তাহা সৎসঙ্গাদি বিশেষ কোন কারণ বশতঃই হয় বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের গতি অনুসারে জীব যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করে সেই সময়ই তাহার নূতন কর্ম্মবীজ সঞ্চয়ের যোগ্যতাও লাভ হয়। মনুষ্য শরীরে জীব প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিলেও নূতন নূতন ভোগের আকাঙ্ক্ষারই প্রাচুর্য্য এবং প্রাবল্যবশতঃ কর্ম্মবাসনাতে অতিশয় প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ভাল করিয়া একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে যে দেবতির্য্যগাদি শরীর যেমন ভোগবিষয়ে পটু মনুষ্য শরীর তেমন ভোগবিষয়ে পটু নহে। মানুষ ভোগ অপেক্ষা বাসনা করিতেই অধিকতর পটু, ইহা অনুভববেদ্য। ভোগময় দেবতির্য্যগাদি দেহে

তত্তৎ দেহাবচ্ছিন্ন ভোগেই আবেশটি প্রচুর এবং প্রবল থাকে; তাহাতে যে সকল বাসনার উদয় হয় তাহা কেবলমাত্র সেই সেই দেহের ভোগটিকেই পরিপোষণ করিবার জন্য উদয় হয়, সুতরাং ঐ বাসনাগুলি ভোগক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয় হইয়া যায়। তবে যদি ঐ ভোগময় শরীরধারী জীবের সহিত কোন অচিন্ত্যশক্তি ভগবৎসম্বন্ধীয় পদার্থের সংযোগাদি ঘটে তাহা হইলে ঐ ভোগময় দেহীর চিত্তে নূতন বাসনা সৃষ্ট হইয়া সংস্কাররূপে আহিত হইতে পারে। ইহা অচিন্ত্যশক্তি ভগবৎসম্বন্ধী পদার্থের স্বাভাবিক প্রভাবেই হয়।

কিন্তু মনুষ্যদেহে প্রারব্ধ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বাসনার উদয় হয় তাহার কতকগুলি সেই মনুষ্যদেহে ভোক্তব্য প্রারব্ধকর্ম্মফলের অনুকূল হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মফলের পুষ্টি বিধান করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্য হয় এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ, প্রারব্ধফলভোগের যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম হইতে জাত সমান জাতীয় এবং সমান পরিমিত যে সকল বাসনার উদয় হয় তাহারাই প্রারব্ধ ভোগের সহায় হইয়া দাঁড়ায়; আর স্বতন্ত্র ভাবে উদয় প্রাপ্ত হয় প্রারব্ধ কর্ম্মের বিজাতীয় অসম পরিমিত যে সকল বাসনা তাহারাই চিত্তে সংস্কার রূপে পরিণত হয়, পরে ভাবনাদির সাহায্যে ক্রমশঃ সংস্কারটি স্থিতি লাভ করিয়া কর্ম্মকূটের সহিত মিলিত হয়। পরে কোনও সময়ে আবার ভোগের জন্য উহারাই প্রারব্ধরূপে দাঁড়াইবে। আবার ঐ স্বতন্ত্র ভাবে উদিত বিজাতীয় অসম পরিমিত বাসনা মাত্রই যে সঞ্চিত কর্ম্মকূট হইয়া পশ্চাৎ ভাবী দেহ-ধারণোপযোগী প্রারব্ধরূপে পরিণত হইবে এমন নহে। যে বিজাতীয় অসম পরিমিত বাসনা সমূহ অতি তীব্রবেগে তীব্রশক্তি সম্পন্ন হইয়া চিত্তে উদিত হয়, অথবা ক্ষীণশক্তি বিশিষ্ট হইয়া উদিত হইলেও যদি পুনঃ পুনঃ ভাবনার স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া শক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যদি তাহার সমজাতীয় সমপরিমিত বা ততোঽধিক পরিমিত সমজাতীয় প্রতিকূল বাসনা শক্তির তীব্র আঘাত তাহাতে না পড়ে, তাহা হইলেই ঐ বাসনা সমূহ চিত্তে আহিত সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। মনে করুন, আপনার মনে কোন পাপকার্য্যের বাসনার উদয় হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরে কোন সময়ে ঠিক তাহার সমপরিমিত বা ততোঽধিক পরিমিত সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত কোন পুণ্য বাসনার উদয় হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পাপ বাসনা তদ্বিপরীত পুণ্য বাসনা দ্বারা নাশ প্রাপ্ত

হইবে। এই জন্যই পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। যথোচিত অনুতাপে পাপ বাসনা নাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার পুণ্য বাসনা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। কোনও পুণ্য কার্য্যের জন্য আপনার মনে বাসনার উদয় হইল, কিন্তু পরে যদি সমপরিমিত বা ততোঽধিক পরিমিত ঠিক তাহার বিপরীত পাপবাসনার উদয় হয়, তাহা হইলে তাদৃশ পাপবাসনা দ্বারা উক্ত পুণ্যবাসনা নাশ প্রাপ্ত হইবে। আর যে সকল পাপ ও পুণ্যবাসনা পরস্পর পরস্পরের নাশোপযোগী শক্তি ধারণ না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উদয় প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রারব্ধ পাপপুণ্যেরও সমজাতীয় না হয়, তাহারাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে চিত্তে আহিত হইয়া সংস্কারে পরিণত হয়। আর যাহারা নাশোপযোগী পরস্পর সমবিরোধী হইয়া উদয় হয় তাহারা উভয়েই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, চিত্তে আর সংস্কাররূপে পরিণত হয় না। আবার কোথাও কোথাও সমান পরস্পর বিরোধী বাসনার উদয় হইল, কিন্তু উভয়ের সমান শক্তি না থাকায় পরস্পর উভয়কে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পারিল না, এমন অবস্থায় পরস্পর সংঘর্ষণে উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া চিত্তের উপর অচিরস্থায়ী সংস্কারাভাসরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার সংস্কারাভাস কর্ম্মবাসনা স্বপ্নাদি অবস্থায় বা জাগ্রৎস্বপ্নদশায় ভোগ্য হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নাদিতে যে অঙ্গনালিঙ্গন সুখময় দর্শন স্পর্শনাদি হয় তাহা সংস্কারাভাস পুণ্যবাসনার ফল, ঐ প্রকার আবার ভয়ঙ্কর দুঃখময় দর্শনাদি পাপবাসনার ফল।

কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন আসিতেছে; যদি প্রারব্ধ কর্ম্ম অখণ্ডনীয়ই হয় তাহা হইলে রোগাদি আকস্মিক বিপদাদিতে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা কেন? দেখাও যায় শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিতে আকস্মিক বিপদাদি হইতেও লোকে উত্তীর্ণ হয়। ইহার উত্তর এই যে মনুষ্য দেহে যে সমস্ত সুখদুঃখ ভোগ হয় তাহা কেবলমাত্র প্রাক্তন প্রারব্ধের ফল নহে। মনুষ্য দেহে জীব যে সকল কর্ম্ম করে সেই ক্রিয়মাণ কর্ম্মগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলোপভোগের উপযোগী কর্ম্ম, ঐ কর্ম্ম সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেই জন্মে; যেমন একটি তরঙ্গ হইতে অন্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, এইরূপ প্রারব্ধ ফলোপভোগের উপযোগী কর্ম্ম প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হয়। যেমন মনে করুন অদ্য অমুক স্থলে আছাড় খাইয়া একটা দুঃখ পাওয়া আপনার

প্রারব্ধে আছে ; ঠিক ঐ স্থানে আছাড় খাওয়া জনিত দুঃখফলভোগটি যাহাতে অবশ্য হয় তাহার জন্য ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মই আপনার মনে একটি বাসনার সৃষ্টি করিবে, যে বাসনার ফলে আপনার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, আর আপনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন না, আপনি তখন সেইদিকে কোন কার্য্যের জন্য যাইতে প্রবৃত্ত হইবেন ; উপযুক্ত স্থানে যাওয়া মাত্রই আপনার প্রারব্ধটি ফলীভূত হইল, একটি আছাড় খাইয়া দুঃখ পাইলেন। এই যে প্রথমে কর্ম্ম করিবার বাসনা, বাসনার উত্তেজনায় সেইদিকে যাইবার জন্য মনের উত্তেজনা, এবং সেইদিকে যাইতে প্রবৃত্তি, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পদস্খলনের উপযোগী যে অবস্থা বিশেষ, এই সকল ব্যাপারই প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে জাত হইয়া ঐ প্রারব্ধকেই পুষ্ট করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল আছাড়টি সম্পন্ন করাইল। এই সমস্ত কর্ম্মই পরমেশ্বরের অনুমোদনেই সম্পন্ন হয়, ইহা ঈশ্বরেরই বিধান। আর কতকগুলি বাসনা হইতে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এবং তাহার ফলও এই দেহেই ভোগ হয় ; ইহা প্রাক্তন প্রারব্ধের ভোগ নহে। এই মনুষ্য দেহে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল ঐ রকম আছাড়, রোগাদিও হয়। আবার কোন কোন স্থলে প্রারব্ধ কর্ম্মফলের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে এই দেহের ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলও যুগপৎ ভোগ হইয়া থাকে। শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা যে আকস্মিক বিপদাদি ও রোগাদি দূরীভূত হয়, তাহা এই দেহের ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যে ফল তাহাই দূরীভূত হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে রোগাদি তাহা শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি দ্বারাও নাশ হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগদ্বারাই নষ্ট হয়, "ভোগেনৈব ক্ষীয়তে।"

এখন বিবেচনা করুন, এই প্রকার কোন্‌টি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল রোগাদি, কোন্‌টি ইহ দেহে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল রোগাদি, তাহা সাধারণ মনুষ্য দূরে থাক, মহাজ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও জানিতে সমর্থ হন না। ইহা একমাত্র আর্ষ দৃষ্টিতেই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই শান্তিস্বস্ত্যয়ন দেবারাধনাদি করিলে ইহ দেহে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল রোগাদি ভোগের নিবৃত্তি অবশ্যই হইবে। আর কোন রোগাদি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অথবা ইহ দেহে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল ইহা না জানিয়া স্বস্ত্যয়নাদি আশ্রয় করিলে ঐ রোগাদি প্রারব্ধ জনিত হইলে তাহার নিবৃত্তি না হইলেও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি জনিত নূতন একটি শুভ অদৃষ্ট সৃষ্ট হইয়া ভাবী সুখপ্রদ ফল অবশ্যই প্রদান করিবে তাহাতে আর সন্দেহ

নাই। সুতরাং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি বৃথা নহে। আরও দেখুন, ঐ প্রকার শাস্ত্রবিহিত শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি বিধান করিয়া ঋষিগণ আমাদের প্রতি পরম করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ব্বার প্রারব্ধের ফল হইলেও শান্তিস্বস্ত্যয়ন দেবারাধনাদি করিলে মনে এমন একটি বল সঞ্চিত হয় এবং দেবারাধনাদিতে মন এমন ভাবে অভিনিবিষ্ট হয় যাহার ফলে ঐ প্রারব্ধের ফল দুঃখাদিতে তাদৃশ অভিনিবেশ না থাকায় দুঃখের লাঘবই হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবমতে প্রারব্ধখণ্ডন

এখন দ্বিতীয় মতের কথা সবিস্তার বলিতেছি। **শ্রীভগবদ্ভক্তি-মহিমাভিজ্ঞাগ্রণী বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্রজ্ঞানকুশলতাপূর্ণানুভবসিদ্ধমতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয়** এই প্রকারও দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মানুভবী অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও ভোগ বিনা ক্ষয় হয় না এমন যে দুর্ব্বার প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহাও স্বয়ংসিদ্ধা ভাগবতী ভক্তি দেবীর নামকীর্ত্তনাদি কোনও একটি অঙ্গ জীবে আবির্ভূত হইলে অনায়াসে অপসারিত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভগদ্ভক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে ভগবদ্‌ভক্তজনের **প্রারব্ধ খণ্ডন হয়**। তাদৃশ ভক্তির প্রারব্ধহারিত্ব গুণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। দেবহূতি কপিলদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির প্রভাবে শ্বপচ জাতিও সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) যজ্ঞ করিতে যোগ্য হয়", ইত্যাদি।* উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "মন্নিষ্ঠা ভক্তি শ্বপচকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করে", ইত্যাদি।† এই দুইটি শ্রীভাগবত বচন দ্বারা ভক্তির জাতিদোষহারিত্ব গুণ সূচিত হইল। জাতিদোষটি প্রারব্ধ জনিত; কারণনাশে কার্য্যনাশ এই ন্যায়ানুসারে কার্য্যস্থানীয় জাতিদোষের নাশ স্বীকার করায় কারণ যে প্রারব্ধ

* যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ৩য় স্কঃ, শ্রীমদ্ভাগবত

† ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১১শ স্কঃ, শ্রীমদ্ভাগবত।

তাহারও নাশ স্বীকার করা হইল। এই প্রারব্ধ পাপকর্ম্ম হেতু যে ব্যাধি প্রভৃতি তাহারও নাশ হয়। ইহা স্পষ্ট স্কন্দপুরাণ বাক্যে পাওয়া যায়,— **"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥"** অর্থাৎ "যাঁহার স্মরণ এবং নামকীর্ত্তন হইতে আধিবর্গ এবং ব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎই বিলয় প্রাপ্ত হয় আমি সেই অনন্তকে নমস্কার করি।" পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে, **"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং। ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥"** অর্থাৎ "অপ্রারব্ধফলক যে কর্ম্ম অর্থাৎ অবিদ্যাস্থানীয়, বীজত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে যে কূট নামক কর্ম্ম, প্রারব্ধরূপে দাঁড়াইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে যে বীজ নামক কর্ম্ম এবং সাক্ষাৎ অবশ্য ফলদাতা রূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম, হরিভক্তিরতমনা জনদিগের এই কর্ম্মসমূহ শতদলবেধের ন্যায় অতি শীঘ্রই ক্রমশঃ, অর্থাৎ প্রথম প্রারব্ধ, তাহার পর বীজ, তাহার পর কূট, তাহার পর অবিদ্যা, এই ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণে সুস্পষ্টই প্রারব্ধখণ্ডন সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

যে সকল প্রমাণ পূর্ব্বে প্রথমমতে বলা হইয়াছে যে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্" ইত্যাদি, উহা কর্ম্মপর এবং জ্ঞানপর, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদ্যুচিত কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন কর্ম্মাদির দ্বারা অথবা নির্ব্বিশেষ অভেদ জ্ঞানোপাসনার দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না, এই অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন সাধারণ জন বিষয়ে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্" ইত্যাদি প্রারব্ধ ফল অবশ্য ভোক্তব্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, বিশেষভাবে ভগবদ্ভজনরত ভক্তদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া উহা বলা হয় নাই। আর "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইত্যাদি গীতার ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে যে প্রারব্ধ ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয় তাহাও ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন অভেদোপাসনা জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ গীতার উক্ত শ্লোকে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" পদটি সাকল্যে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ যাবতীয় কর্ম্ম সমূহই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়, এই অর্থই মুখ্যরূপে নিঃসঙ্কোচে প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাই সুধী বৈষ্ণববৃন্দের অনুভব সিদ্ধ ব্যাখ্যা। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ সবিশেষ ভগবজ্জ্ঞান।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ভক্তির দ্বারা ভক্তের প্রারব্ধ খণ্ডিত

হয়, তাহা হইলে অনেক মহত্তম ভক্তের শরীরে প্রারব্ধ ফল রোগাদির ভোগ দেখা যায় কেন? উত্তর এই যে প্রারব্ধখণ্ডন সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবটি প্রারব্ধ খণ্ডনে সমর্থ হইলেও উহার খণ্ডন কিন্তু ভক্তি-উপাসক ভক্তের ইচ্ছা বশতঃই হয়। যদি ভক্তিসাধক ভক্ত ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে আর প্রারব্ধ খণ্ডন হয় না। আবার ভক্তভক্তিবশ ভগবান্‌ও কোন কোন ভক্ত বিশেষে তাঁহার প্রারব্ধ রাখিয়াই দেন। তাই আমরা অনেক স্থলে মহাভাগবতগণেরও তাদৃশ প্রারব্ধ ফল ভোগ দেখিতে পাই।

সাধারণ জন মনে করিবেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ভক্তি-উপাসক ভক্তগণ ইচ্ছা করিয়াই প্রারব্ধ রাখিয়া দেন। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাবতীয় কর্ম্ম-সাদ্‌গুণ্যে এমন কি জ্ঞানী জীবন্মুক্তের ব্রহ্মজ্ঞানেও যাহা দুর্ব্বার, নানাবিধ তীব্র রাশি রাশি দুঃখফলের হেতুভূত সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে সম্পন্ন হয় জানিয়াও এমন সুযোগ ছাড়িয়া দেয়? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ যে প্রারব্ধের ভীষণ তাড়নায় ছটফট করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে, অথচ নিষ্কৃতির এত সুলভ উপায় হাতে পাইয়াও ভক্তেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই তীব্র তাড়নাময় প্রারব্ধ হইতে নিষ্কৃতি চান না। ভক্ত ইচ্ছা করুন বা নাই করুন, ভক্তির অব্যাহতা স্বভাবসিদ্ধা শক্তির কার্য্য ত অবশ্য হওয়া চাই? অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভগবান্ ভক্তদুঃখহারী হইয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্তের নানাবিধ দুঃখপ্রচুর প্রারব্ধ রাখিয়া দেন। এই সকল যে আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য।"

ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্, ইঁহাদের অচিন্ত্য স্বভাব মহাশ্চর্য্যময়, সাধারণ বুদ্ধির সুদুর্ব্বোধ্য। মহামাধুর্য্যরসময়ী শুদ্ধা ভক্তির কোন অনির্ব্বচনীয় মাদকতা গুণ আছে; এই মাদকতা গুণের স্বভাব এই যে ভক্তি নিজ ভিন্ন এবং সাক্ষাৎ নিজ সম্বন্ধীয় বস্তু ভিন্ন যাবতীয় প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তু এবং তত্তৎ বস্তু-জাত সুখদুঃখাদির স্বতন্ত্র অনুভবের বিস্মারক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু, তদূর্দ্ধ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত বিস্মরণ করাইয়া কেবল মাত্র নিজের আশ্রয় ভক্ত, নিজের বিষয় ভগবান্ এবং নিজের (ভক্তির) স্বরূপের অনন্ত রস বিলাসের প্রতি মনের অভিনিবেশকে বর্দ্ধন করান এবং নিজরসে ভক্তের এবং ভগবানের মনকে উন্মত্ত করানই ভক্তিমাদকতার স্বভাব। অদ্ভুত কথা শুনুন—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁই॥

স্বীয় রসোন্মাদিনী প্রেমরসতরঙ্গিণী ভাগবতী ভক্তি নিজের অনন্ত বিলাস-রসতরঙ্গে নিজেও নাচেন, নিজের আশ্রয় ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবদুন্মুখ যাবতীয় মনোবৃত্তিকেও স্বীয় বিচিত্র রসবিলাসতরঙ্গাঘাতে নাচাইয়া তুলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসতরঙ্গরঙ্গবিলাসী ভগবান্ শ্রীহরিকেও ভক্ত ভক্তির নটনানুকূল তালে তালে অপূর্ব্ব নটন চাতুরীতে নর্ত্তন করাইয়া থাকেন। এই ভাগবতী ভক্তি কোনও ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের অনুগ্রহরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে কোনও ব্যক্তিতে যদি আবির্ভূতা হয়েন তাহা হইলে ঐ আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে অর্থাৎ যতটুকু যতটুকু পরিমাণে সেই ব্যক্তি সাধন করে ততটুকু ততটুকু পরিমাণে তাহার হৃদয় ক্রমশঃ অন্যাভিনিবেশ শূন্য হইয়া একমাত্র ভক্তিসম্বন্ধীয় বস্তু ভক্তিসাধনাদির মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। ভক্তি-রসমদিরা যতই পান করা যায় ততই শুদ্ধা ভক্তির উন্মাদনা বাড়িতে থাকে। এই উন্মাদনার প্রভাবে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল "হে ভগবন্! হে প্রভো! হে দীনদয়াল! তোমার নিকট কেবল ত্বদীয় শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী ভক্তি চাই, ভক্তিই চাই, আর কিছুই চাই না, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ কিছুই চাই না, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর," ইত্যাদি ভাবেই মনঃপ্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির সকল বৃত্তি শুদ্ধা ভক্তিতে সমর্পণ করিয়া তাহার উন্মাদনাতেই বিভোর হইয়া থাকে। তাদৃশ শুদ্ধ-ভক্তিরসোন্মত্ত ভক্তের প্রারব্ধাদিকর্ম্মজনিত ফলের নিবৃত্তির ইচ্ছা স্বতঃ আর উদয় হয় না। **"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতে হস্ত সদা ত্বয়ি॥"** ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ বাক্য। অর্থাৎ "হে নাথ, আমি সহস্র সহস্র যে সকল যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, অবিচ্যুতস্বরূপ তোমাতে সর্ব্বদা আমার যেন অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।" ইহাকেই শুদ্ধভক্তিরসোন্মাদনা বলে।

সন্দেহ উঠিতে পারে,—ভক্তজন না হয় ভক্তিরসোন্মাদনায় কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করেন, প্রারব্ধ ধ্বংস প্রার্থনা নাই করুন, কিন্তু ভক্তির ত ভক্তের প্রারব্ধ ধ্বংস করা উচিত? ভক্তি স্বয়ং কেন ভক্তের প্রারব্ধ ধ্বংস করেন না?

ইহার মধ্যে ভক্তিদেবীর বিচিত্র নটনচাতুর্য্যই প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তির আর একটি স্বভাব এই যে অন্যাভিনিবেশশূন্য ভক্তের প্রশস্ত হৃদয় পাইলে ভক্তি অশেষ বিশেষে নিজ নর্ত্তন চাতুরীই বাড়াইতে থাকেন, ভক্তের প্রারব্ধ রক্ষা করিয়া ভক্ত হৃদয়ের দৈন্যবেগের সাহায্যে উচ্ছ্বসিত স্বীয় নর্ত্তনবিলাস-চাতুরী বাড়াইয়া ভক্ত ভগবান্ উভয়কেই সন্তুষ্ট করেন। ভক্তির নর্ত্তনের তাৎপর্য্যই ভক্ত ভগবানের সুখ বর্দ্ধন করান, অর্থাৎ ভক্তের প্রারব্ধকর্ম্মজনিত সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে ভক্তহৃদয়ে দৈন্যবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রীভগবানে প্রপন্নতাই দৃঢ় হইতে থাকে। শ্রীভগবানে প্রপন্নতা যতই দৃঢ় হইয়া উঠে, ভক্তহৃদয়ে ভক্তি সাধন আকাঙ্ক্ষাও ততই বলবতী হইতে থাকে। এই ভক্তি-আকাঙ্ক্ষা ভক্তের প্রারব্ধজনিত যাবতীয় সুখদুঃখবিস্মারিকা। প্রারব্ধ অন্যের সম্বন্ধে যতই প্রবল আকার ধারণ করুক না কেন, ভক্তের হৃদয়স্থিত ভাগবতী ভক্তির নিকট প্রারব্ধ অতি দুর্ব্বল, **সুতরাং প্রারব্ধের ফলটি ভক্তহৃদয়স্থিত ভক্তির বিঘাতক না হইয়া প্রত্যুত দৈন্য উদ্ভব করাইয়া ভক্তির অনুকূলে ভক্তির বৃদ্ধির কারণই হইয়া পড়ে।** অহো কি মধুর, যে প্রারব্ধ অন্য সকলের নিকট প্রবল বিরোধ আচরণ করে তাহা ভক্তের নিকট তাঁহার হৃদয়স্থিত ভক্তির অনুগত হইয়া ভক্তিকেই বর্দ্ধন করিয়া তাঁহার অতিশয় অনুকূলতাই করে, ইহা ভক্তিসঙ্গেরই গুণ, অহো ভক্তি মহিমা! "অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥" এখন বলুন যদি কোনও বিরোধী শত্রু কোনও সময় কোনও স্থানের গুণে শরণাপন্ন হইয়া অনুকূলতাই আচরণ করে তাহা হইলে সজ্জন ব্যক্তি কি তাহাকে ধ্বংস করেন? অথবা তাহাকে নিজ অনুগত রাখিয়াই নিজের বিজয় গর্ব্বে নর্ত্তন করেন? তাই ভক্তহৃদয়স্থিত ভক্তি প্রারব্ধকে ধ্বংস না করিয়া তাহাকে নিজের বশে রাখিয়া নিজের মহিমোল্লাসই বিস্তার করিয়া থাকেন।

ভক্ত যে নিজ প্রারব্ধ ধ্বংসের ইচ্ছা করেন না তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। যথা—ভগবৎপাদপদ্মপ্রপন্ন ভক্ত সর্ব্বদাই মনে করেন, "আমার মঙ্গলামঙ্গলের যাবতীয় বিধান শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে। আমার মঙ্গল আমি যত না বুঝি, আমি যত না জানি, মদীয় সর্ব্বস্ব শ্রীভগবান্ই আমার মঙ্গলামঙ্গল ততোঽধিক জানেন; তাঁহার যে বিধানে আমার মঙ্গল হয় তাহাই তিনি বিধান

করিতেছেন এবং করিবেন। প্রাকৃতিক দুঃখের মধ্যে আমাকে রাখিয়া যদি মঙ্গল হয়, অথবা প্রাকৃতিক সুখের মধ্যে রাখিয়া যদি আমার মঙ্গল হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাই করিবেন। তাঁহার বিধিৎসার অনুবর্ত্তী হওয়াই আমার জীবাতু।" এই প্রকার মনে করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি করেন না, সুতরাং প্রারব্ধ ধ্বংসের ইচ্ছারও উদয় হয় না। তাঁহাদের যে প্রারব্ধের ফলভোগ দেখা যায় তাহা নাম মাত্র, "বিড়ালীদন্তস্পর্শ" ন্যায়ে বস্তুতঃ প্রারব্ধ জনিত সুখদুঃখে তাঁহারা অভিভূত হন না। যেমন বিড়ালী নিজ শাবকের গলদেশ দন্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, বিড়ালীর দন্ত যেমন নিজ শাবকের গলদেশকে স্ফুটন করিয়া দুঃখ দেয় না, সেই প্রকার ভক্তের ইচ্ছায় ভগবান্ স্বীয় ভক্তের প্রারব্ধ রাখিয়া দিলেও তাঁহাকে প্রারব্ধ জনিত দুঃখাদি দান করেন না। আর যে সকল ভক্ত বিশেষ কারণবশতঃ প্রারব্ধবিধ্বংস ইচ্ছা করেন, ভক্তি অনুসারে তাঁহাদের প্রারব্ধবিধ্বংস হয়, ইহাই বিদ্বদ্‌বৈষ্ণব-অনুভব।

যে সকল প্রাথমিক ভক্তিসাধক ভক্ত প্রারব্ধ জনিত সুখদুঃখকে ভক্তির বিঘাতক জানিয়া নির্ব্বিঘ্নে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ভগবচ্চরণে "হে ভগবন্, হে শরণাগতপালক, তোমার পাদপদ্ম ভজন বিঘাতক আমার সুখদুঃখাদিকে নাশ কর" এই প্রকারে সুখদুঃখাদির নিবৃত্তি প্রার্থনা করেন, ভগবদ্ভক্তি তাঁহাদেরই প্রারব্ধ নাশ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যদি বৈষ্ণবমতে প্রারব্ধখণ্ডন স্বীকৃত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রারব্ধ নাশ হইলে প্রারব্ধ জনিত এই বর্ত্তমান দেহও নাশ হইবে, "কারণ নাশ হইলে কার্য্যের নাশ হয়", এই নিয়মানুসারে কারণ প্রারব্ধ নাশ হইলে কার্য্যস্থানীয় দেহ নাশ অবশ্যই হইবে। সুতরাং দেহ বর্ত্তমানে প্রারব্ধ নাশ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

ইহার মধ্যেও ভক্তি এবং ভগবানের এক অচিন্ত্য রহস্য আছে। সৎ মহাপুরুষের পরম করুণার ফলে জীবে যখন ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন জীবের কায় ইন্দ্রিয় মন আদির ব্যাপারের সহিত তাদাত্ম্যরূপেই ভক্তির আবির্ভাব হয়। অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া দহন করে, সাধারণ লোকের চক্ষুতে জ্বলৎ লৌহ দগ্ধ করিতেছে ইহাই প্রতীতি হয়,

সেইরূপ সচ্চিদানন্দরূপিণী স্বয়ংপ্রকাশ ভক্তিও জড়ীয় দেহেন্দ্রিয় মন আদির সহিত তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করিয়া নিজ ব্যাপার ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চনাদি রূপে জীবের দেহেন্দ্রিয় মন আদির ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পান। তখন সাধারণ জ্ঞানে "আমি মুখে নাম করিতেছি, হস্তের দ্বারা অর্চ্চন করিতেছি, মনের দ্বারা স্মরণ করিতেছি" ইত্যাদি রূপে প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ যেমন লৌহ-তাদাত্ম্যাপন্ন অগ্নিই দহন করে, লৌহ দহন করে না, সেইরূপ দেহাদিতে তাদাত্ম্যাপন্না ভক্তিই স্বয়ং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ অর্চ্চনাদি ব্যাপার রূপে প্রকটিত হয়েন, বস্তুতঃ উহা জড় ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার নহে। * এই প্রকার মহৎকৃপানুসারিণী ভক্তির আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে অর্থাৎ যতটুকু যতটুকু পরিমাণে ভক্তি আবির্ভূত হইয়া নিজ শক্তি প্রকাশ করেন ততটুকু ততটুকু পরিমাণে সেই ভাগ্যবান্ ভক্তি-সাধকের প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয় মন আদির প্রাকৃতত্ব আংশিক ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্যশক্তি ভক্তির প্রভাবে সাধক ভক্তের ভক্তিসাধনার অনুকূল চিদানন্দ আকারও গঠিত হইতে থাকে। **ভক্ত-দেহাদির প্রাকৃতাংশ ভঙ্গ এবং অপ্রাকৃতাংশ গঠনরূপ কার্য্যটি স্পর্শমণি-ন্যায়ানুসারে অবিচিন্ত্য ভক্তিপ্রভাবেই সম্পন্ন হয়।** এই রহস্য ভগবান্ ভক্তের ভক্তিরহস্যবহির্মুখ জনের গোচরীভূত করেন না। এমন কি সেই ভক্তও এই রহস্য জানিতে পারেন না। ভক্তের সহিত ভগবানের ইহা এক লুকাচুরি ব্যাপার। এইরূপে ভক্তির পূর্ণাবির্ভাবদশায় প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তের দেহ মন আদি সর্ব্বাংশে প্রাকৃতবর্জ্জিত হইয়া অপ্রাকৃতময় হইয়া উঠে। ভক্তির আবির্ভাবের তারতম্যানুসারেই প্রারব্ধখণ্ডনেরও তারতম্য হয়। সাধকদেহে ভক্তির পূর্ণাবির্ভাব প্রেম পর্য্যন্তই হয়, ইহা প্রায়িক সাধারণ নিয়ম। ভক্তির পূর্ণাবির্ভাব প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তের দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত অপ্রাকৃত স্বরূপ হইলেও অস্মদাদি প্রাপঞ্চিক লোকের দৃষ্টিতে প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক দেহাদি সদৃশই প্রকাশ পায়। যেমন একখানি কাগজ বা কাপড় টানটান ভাবে রাখিয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিলেও অনেক সময়ে সত্য সম্পূর্ণ কাপড় বলিয়াই মনে হয় সেইরূপ **দগ্ধপ্রারব্ধ ভক্তশরীরও প্রারব্ধবান্ বলিয়া আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে**

---

* অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ পদ্মপুরাণ।

প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষের কৃপানুসারিণী ভাগবতী ভক্তিশক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে অনায়াসেই সর্ব্বকর্ম্মাদি বিধ্বংসন পূর্ব্বক পরমগতিপ্রাপ্তি লাভ হয়। যথা,—**বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ ভবিষ্যতি। তৎসর্ব্বং দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥** হরিভক্তিবিলাসাদি ধৃত লঘুভাগবত বচন।

কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, "যদি বৈষ্ণবমতে প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় স্বীকৃত হয় তাহা হইলে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একস্থানে বলিয়াছেন যে 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্', এই বাক্যের সামঞ্জস্য কি?"

শ্রীমহাপ্রভুর উক্ত বাক্যটি ছোটহরিদাস বর্জ্জন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে। যদ্যপি উহা ছোটহরিদাস প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তথাপি উহা বহিরঙ্গ এবং সামান্য কথামাত্র। পুরুষমাত্রই অর্থাৎ জীবমাত্রই নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এখানে পুমান্ পদটি সামান্য জীবমাত্রেরই বাচক। কিন্তু যাহারা বিশেষ ভগবদ্ভক্ত জীব তাহাদের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর এ উক্তি নহে। বস্তুতঃ হরিদাস ভক্ত হইলেও তাঁহাকে নিমিত্তাভাস করিয়া যেমন মহাপ্রভু জগতে সদ্‌বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং অন্তরে বিষয়লোলুপ বাহিরে বৈরাগ্যবেশধারী জনদিগকে মর্কট বৈরাগী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, এই প্রকার শুদ্ধভক্তিসাধক ভিন্ন সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোক্তব্য ইহাই জানাইয়াছেন। এই প্রকার অর্থ না করিয়া যদি উহার অর্থ ভক্ত অভক্ত সকলেরই কর্ম্মফলভোগ অনিবার্য্য এই প্রকার অর্থ করা যায় তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় সনাতনের প্রসঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর নিজ বাক্যেরই বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা,—

বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

ইত্যাদি পয়ার বিচার করিলে দেখা যায় শ্রীমহাপ্রভু ভক্তের প্রাকৃত প্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডন হয় ইহা স্বীকার করিতেছেন। দেহের প্রাকৃতত্ব কর্ম্ম

নিবন্ধনই হয়। ইহা অন্বয় ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দ্বারা সুনিশ্চিত। প্রারব্ধ কর্ম্ম নাই বলিয়াই ঈশ্বরের দেহ এবং তাঁহার নিত্যপরিকরদিগের দেহ প্রাকৃত নহে। আবার প্রারব্ধ কর্ম্ম আছে বলিয়াই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতিগ্রস্ত জীবের দেহ মাত্রই প্রাকৃত। এই অব্যভিচারী নিয়মে ভক্তের দেহের প্রাকৃতত্ব নিষেধপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন দ্বারা প্রারব্ধের খণ্ডনই শ্রীমহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। দেহে প্রাকৃতত্ব শব্দের অর্থ জড়সংঘাতত্ব। এই জড়সংঘাতত্বে প্রধান নিমিত্ত কারণই কর্ম্ম। প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যে দেহধারণ তাহাই জড়সংঘাতরূপ প্রাকৃত দেহ। এই দেহ অপ্রাকৃত হওয়া মানেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়া। নতুবা অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়াও ভক্তিসাধকেরও প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে এই প্রকার বাক্য "অয়ং বন্ধ্যাপুত্রঃ" এই কথার মত ব্যাঘাতদোষদুষ্ট হয়। উপরি উক্ত পয়ারে কথিত ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত বলিতে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদেহ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, কারণ 'দীক্ষাকালে' এই বাক্যটিতে সুস্পষ্ট সাধকভক্তপরই বুঝা যাইতেছে। আবার ভক্তিসাধক ভক্তের দেহত্যাগান্তে ভগবৎপ্রাপ্তিকালেই দেহ চিদানন্দময় হয় এ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে না, কেন না 'সেই কালে' 'সেই দেহ' এই দুইটি বাক্য থাকায় সে ব্যাখ্যাও নিরস্ত হইল। সুতরাং ভক্তিসাধক ভক্তের ভক্তিসাধন অনুসারেই তাহার প্রারব্ধ খণ্ডিত হইতে থাকে, ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানীর প্রারব্ধ খণ্ডন হয় না, আর ভগবদ্ভক্তিতে ভক্তের প্রারব্ধ খণ্ডিত হইতে পারে, এ বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের যুক্তিযুক্ত অনুভব কি প্রকার তাহা শ্রবণ করুন। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে প্রারব্ধ খণ্ডন হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে কেবল "অতদ্‌ব্যাবৃত্ত বিচার", অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত জড়ের ব্যাবর্ত্তজ্ঞান যাহাকে আত্মানাত্ম বিবেক বলা যায়, এই বিবেকের বলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীবতাদাত্ম্যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহাতে পরতত্ত্বের কোন বিশেষ গুণক্রিয়াদির উপাসনা নাই। সুতরাং সাধন অবস্থায় সাধককে আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্বের এমন কোন বিশেষ শক্তির উদয় হয় না যাহার ফলে দুর্ব্বার প্রারব্ধ খণ্ডন হইতে পারে। কিন্তু ভক্তি অঙ্গ সাধনে স্বপ্রকাশ ভক্তিশক্তির আবির্ভাবে প্রারব্ধ খণ্ডন হইতে পারে। **সচ্চিদানন্দ শক্তিবৃত্তির অনুশীলনের নামই**

ভক্তিসাধন। চিদানন্দ শক্তির বৃত্তি মায়াশক্তিবৃত্তিবিরোধিনী। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে সেইরূপ চিদানন্দ শক্তি বৃত্তির অনুশীলন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে যে ব্রহ্ম অবধারণ তাহা ত স্বপ্রকাশ চিদানন্দ স্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম ধ্যান ধারণাদির দ্বারাও ত জীবের মায়াশক্তির কার্য্য প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে? উত্তরে বলিব—না, উহা ঠিক কথা নহে। নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানধারণা জ্ঞানসাধনে অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ বস্তুর ধ্যান ধারণা হইতে পারে না। বিশেষ গুণক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুরই ধ্যান ধারণা হয়। কোন জ্ঞানমার্গের সাধন শাস্ত্রেও অন্বয় মুখে ব্রহ্মের ধ্যানধারণার ব্যবস্থা নাই, হইতেও পারে না, তাই জ্ঞানসাধনে ব্যতিরেকমুখে নেতি নেতির ব্যবস্থাই আছে। "অবাঙ্মনসো গোচরম্" ইত্যাদিই বলা হইয়াছে। আবার স্বপ্রকাশ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের যে স্বয়ং অভিব্যক্তি তাহাও জ্ঞানীর জ্ঞানসাধন কালে নহে। "অতদ্ব্যাবৃত্ত" অর্থাৎ এই দেহ আত্মা নহে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, প্রাণ আত্মা নহে, ইত্যাদিরূপে আত্মা ব্যতিরিক্ত জড়ের ব্যাবর্ত্তন রূপের মনন নিদিধ্যাসনই জ্ঞানের সাধন। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে চিত্তের বিষয়াকারতা রহিত হইলে সেই শুদ্ধ চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়; ততদূর সাধন পর্য্যন্ত কোনও চিদানন্দ শক্তির বিশেষ আবির্ভাবের উপযোগী কোনও অনুশীলন যে জ্ঞানসাধনে নাই উহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। তবে যৎকিঞ্চিৎ সাধন ভক্তির সাহায্য যাহা থাকে তাহা সেই অতদ্ব্যাবৃত্ত জ্ঞানটিই যাহাতে সুস্থির হয় তাহারই উপযোগী মাত্র, তদ্ভিন্ন ভক্তির কোন পৃথক্ শক্তির স্ফুরণ হয় না। তারপর শুদ্ধ জীবচৈতন্যতাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম-চৈতন্যের যে উদয় তাহাই শুদ্ধ চিন্মাত্র অবধারণ, তাহাই কৈবল্যজ্ঞান (শুদ্ধজীবচৈতন্যজ্ঞানকেও কৈবল্যজ্ঞান বলা যায় না)। তখনই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। প্রথম শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি এবং শুদ্ধজীবচৈতন্যের প্রকাশ পর্য্যন্ত অবস্থাকেও ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। এই সামান্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থাকালেও চিদানন্দশক্তির বৃত্তির কোনও অনুশীলন নাই, যাহার ফলে প্রারব্ধ খণ্ডন হইতে পারে। এই জন্যই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরও প্রারব্ধ খণ্ডন হয় না।

সন্দেহ হইতে পারে—শুদ্ধচিন্মাত্রাবধারণরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা শুধু প্রারব্ধ বলি কেন, বীজকূটাদি সঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাশ হইতে পারে না, কারণ কর্ম্ম-নাশোপযোগী চিদানন্দ শক্তির বৃত্তির কোন অনুশীলন ত ব্রহ্মজ্ঞানে নাই। তাহা হইলে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইত্যাদি বাক্যে যে প্রারব্ধ ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্মের নাশ স্বীকার করা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে?

এ সন্দেহের সমাধান সুস্পষ্ট। জীবের মায়াবৃত্তি অবিদ্যাজনিত বীজ-কূটাদি কর্ম্মসমূহের মূল কারণ পরতত্ত্বের জ্ঞানের অভাব। তাহারই নাম পরতত্ত্ববিমুখতা। যথা কথঞ্চিৎ পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ সাম্মুখ্য লাভ হইলে অজ্ঞান জনিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মের মূল অবিদ্যা পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে প্রারব্ধও ঐ প্রকার যথাকথঞ্চিৎ সামান্য জ্ঞানরূপ সাম্মুখ্য লাভেও ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে—না, তাহা নহে, কারণ প্রারব্ধটি আর সামান্য কর্ম্মের মধ্যে থাকিতেছে না; অবিদ্যাদোষে দুষ্ট জীব যে সকল বাসনা করে, সেই বাসনাগুলি চিত্তে আহিত হইয়া সংস্কার-রূপে অবস্থান করে, তাহাই সঞ্চিত কর্ম্ম, ইহা জীবেরই অজ্ঞানের কার্য্য; কিন্তু ইহার ফল অবশ্য ভোক্তব্যরূপে দাঁড়াইতেও পারে, নাও দাঁড়াইতে পারে; অর্থাৎ যদি উপযুক্ত বাসনা বা কর্ম্মের সাহায্য পায় তাহা হইলে ক্রমশঃ বাসনা সংস্কারগুলি প্রবৃদ্ধ হইয়া ফলভোগের যোগ্য হইয়া উঠিবে, তখনই ঈশ্বরের বিশেষ নিয়মে প্রারব্ধ নাম ধারণ করিয়া দাঁড়াইবে; নতুবা কেবলমাত্র কর্ম্ম-বাসনাগুলি সঞ্চিত অবস্থায় থাকিলেই যে অবশ্য ভোক্তব্যরূপে ফল প্রসব করিবেই এই প্রকার প্রারব্ধের তুল্য ঈশ্বরের বিশেষ অনুমোদন বা প্রেরণা শক্তি তখনও সঞ্চারিত হয় নাই; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মটি ফলপ্রদানে ঈশ্বরের প্রেরণা শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। তাই নিঃশক্তিক ব্রহ্মজ্ঞানে ঐশ্বরিক বিশেষ শক্তির কার্য্য ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু অচিন্ত্যশক্তি ভাগবতী ভক্তিতে ঐশ্বরিক কর্ম্মপ্রেরণাশক্তিও ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছায় অপসারিত হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই বিদ্বদ্‌বৈষ্ণবসাধকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সযুক্তিক অনুভব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত যোগবাশিষ্ঠ পাতঞ্জল দর্শন শ্রীমদ্-ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে গুরুতর প্রারব্ধ খণ্ডন স্বীকৃত হইয়াছে। **অনির্ব্বচনীয় সদ্‌গুরুকৃপায়, সাধুমহাপুরুষের স্বৈর কৃপায় প্রারব্ধ খণ্ডিত হয়।**

এস্থলে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য যে গৌণী ভক্তির (১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দ্বারা প্রারব্ধ বিধ্বস্ত হয় না। কেবলমাত্র তাদৃশ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ সাধুমহাপুরুষের কৃপাসঞ্চালিতা **শুদ্ধা নিষ্কামা ভক্তিই** প্রারব্ধাদি অশেষ কর্ম্ম বিধ্বংসিনী হইয়া থাকেন, আর প্রধানীভূতা ভক্তি (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ক্রমশঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাবস্থায় প্রারব্ধবিধ্বংসিনী হন। তাৎপর্য্য এই **নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তির আভাসমাত্রেই প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে পারে।**

নিষ্কামা ভক্তি

আমরা সাধারণ জ্ঞানে ভক্তি বলিতে যাহা বুঝি, সাধারণ লোক ব্যবহারে যাহা ভক্তি দেখি, বা যাহা ভক্তি বলিয়া আচরণ করি, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে—ভক্তি নিষ্কাম হয় কি প্রকারে? এই জগতে আমরা কেহ কাহারও নাম গুণের মহিমা গান করি, কেহ কাহারও সম্মান দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা পূজা করি, নানাপ্রকার তোষামোদ দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করিয়াই ভক্তি করিয়া থাকি। এই ভক্তির গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিলে দেখা যাইবে যে, কোথায়ও ধনসম্পত্তি, কোথায়ও অন্নবস্ত্রাদি, কোথায়ও আহার বিহারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদি, কোথায়ও বা যশঃ পূজা বাহবা প্রভৃতির মধ্যে কিছু না কিছু ভক্তির মূল্য আদায় করিয়াই থাকি। এই প্রকার দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থময় চেষ্টাকেই আমরা ভক্তি বলিয়া থাকি। যদি কোথায়ও আমার ঐ প্রকার ভক্তি করার মূল্য কোনও স্বার্থ না পাই তাহা হইলে ভক্তি করি না, বা স্বার্থমূল্যের প্রত্যাশায় ঐ প্রকার ভক্তি করিয়া যখন দেখি যে আমার বাসনানুযায়ী স্বার্থ কিছুই পাইতেছি না, তখন ঐ ভক্তি করাটাই বিষম ভুল বা গুরুতর অবিমৃষ্যতার কার্য্য করিয়াছি মনে করিয়া অতিশয় বিমর্ষ হই, এবং যাহাকে ঐ রকম ভক্তি করিয়াছি সে ব্যক্তি যে আমার এমন ভক্তির অপাত্র এবং অতিশয় অকৃতজ্ঞ ইহাই জানাইবার জন্য শতমুখ হইয়া তাহারই দুষ্কীর্ত্তি দুর্নাম প্রচার করিয়া থাকি। অথবা বাসনার প্রতিঘাতে শতবিক্ষত হৃদয়ের জ্বালায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বে যতটুক ভক্তি করিয়াছিলাম তাহার শতশত গুণ ঘৃণা দ্বেষ হিংসা অসূয়া প্রভৃতির দ্বারা

শতশত গুণ মূল্য আদায় করি। অবশেষে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আমার ভক্তির মূল্য আদায় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি,—হে ঈশ্বর তুমি দেখিও, লোকটা বড় অকৃতজ্ঞ, আমি এত কিছু ভক্তিশ্রদ্ধা প্রীতি করিলাম, আর সে আমাকে ফাঁকী দিলে। তুমি ইহার বিচার করিও। দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসপ্রাপ্ত জড়ীয় স্বার্থসুখলুব্ধ মায়াগ্রস্ত জীবের জাগতিক ভক্তির পরিচয় এইরূপেই। ইহার অধিক শুদ্ধা নিষ্কাম ভক্তি আছে, ইহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। বস্তুতঃ **নিষ্কামভক্তির উপলব্ধি তাদৃশ ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা ভিন্ন হয় না।**

ভক্তির স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে "নিষ্কামা ভক্তি" কিপ্রকারে সম্ভব তাহা বুঝা যাইবে। ভগবানের হ্লাদশক্তিমিলিত সম্বিৎশক্তির সারাংশই ভক্তি। সার বলিতে "ভগবদানুকূল্যাভিলাষবিশেষ", ইহা পূর্ব্বে বারম্বার বলিয়াছি। ভগবান্ ভিন্ন অন্যত্র তৃষ্ণাশূন্যা ভগবানে মাত্র তৃষ্ণার নামই ভগবদানুকূল্যাভিলাষবিশেষ। ভগবদ্ভক্তি বলিতে ভগবৎসেবাকেই বুঝায়, সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ে যে সেবা করিবার অভিলাষ সেই অভিলাষের উদ্দেশ্য ঐ ভগবৎসেবাই, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী ভগবৎসেবার যে প্রবৃত্তিটি তাহা একমাত্র ভগবৎসেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। ভগবৎসেবার প্রবৃত্তিটি ভগবৎসেবার দ্বারা অন্য কোনও স্বতন্ত্র নিজভোগ্য সুখ হউক এই প্রকার উদ্দেশ্যে নহে। **"সুখের সাধনে যে প্রবৃত্তি" তাহাই সকামা প্রবৃত্তি। আর "সুখে সাক্ষাৎ যে প্রবৃত্তি" তাহা নিষ্কামা প্রবৃত্তি।** মনে করুন, সুখের সাধন সুন্দরী তরুণী; সেই তরুণীর শব্দস্পর্শরূপাদি বিষয় সমূহে যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ তরুণীর স্বরশ্রবণ, তাহার অঙ্গস্পর্শন, রূপদর্শনাদি সেবাতে যে প্রবৃত্তি তাহা সকামা, কেননা তরুণীর শব্দস্পর্শরূপাদির সেবাজনিত সুখই উদ্দেশ্য। তরুণীর শব্দটি সাক্ষাৎ সুখ নহে; তাহার শব্দাদি হইতে সুখ একটি ভিন্ন বস্তু, শব্দস্পর্শরূপাদি সেই সুখের সাধন মাত্র, তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ। তাই এখানে সুখের জন্য সুখের সাধনে যে প্রবৃত্তি তাহা সকামা প্রবৃত্তি। কিন্তু যদি কেহ সাক্ষাৎ সুখকে সেবা করে তাহা হইলে সুখ ভিন্ন অন্য কোন ফল কামনা করিয়া সুখসেবার ইচ্ছা করে না; সুখের সেবার ফল সুখই, সুতরাং সুখে

প্রবৃত্তির অন্য কোনও ফল কামনা না থাকায় সুখে প্রবৃত্তিটি নিষ্কামাই। এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপরেই "নিষ্কামা ভক্তি" সিদ্ধ হয়। ভগবৎসেবাসুখটি সেবাজন্য পৃথক্ একটি সুখ নহে। ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তিটি সুখেই প্রবৃত্তি। এখানে সেবাই সুখ স্বরূপ, অন্য কোনও সুখোদ্দেশ্যে ভগবৎ-সেবা নহে, সুতরাং ভাগবতী শুদ্ধা ভক্তিতে যে প্রবৃত্তি তাহা নিষ্কামা প্রবৃত্তি। ভগবদ্ভক্তি করার অর্থই **ভগবজ্জ্ঞানানন্দসারে প্রবৃত্ত হওয়া।**

প্রশ্ন হইতে পারে—নিষ্কামভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা বলেন যে "সেবার দ্বারা ভগবানের সুখ হইলেই আমার (ভক্তের) সুখ," তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে সেবার দ্বারা আনন্দিত ভগবান্‌কে অনুভব করিয়া তজ্জাত সুখ ভক্ত অনুভব করেন, ইহা ত সুখকাম। অর্থাৎ ভগবানের সুখ অনুভব করিয়া, সেই অনুভবজনিত যে সুখ ভক্ত অনুভব করেন তাহা ত একটি ভিন্ন সুখ, কেননা সেবাজনিত ভগবৎসুখ, তারপর তাহার অনুভব, তারপর সেই অনুভবজনিত আবার একটি সুখ, সেই সুখের অনুভব করিয়া ভক্ত সুখী হয়েন। কোথায় প্রথম সেবা আর তারপর কার্য্যক্রমে বহুদূরে ভক্তের সুখ, ইহা একই সুখ কি প্রকারে হয়? এই সন্দেহ ত দুর্ব্বার বজ্রলেপের ন্যায় "নিষ্কামভক্তি" সিদ্ধান্তকে গাঢ়রূপে আবরণ করিতেছে, এই সন্দেহ অপসারণ হয় কি প্রকারে?

প্রকৃত ভক্তিরহস্যানভিজ্ঞ জনের ঐরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, বস্তুতঃ কিন্তু ভক্তির স্বরূপও ভক্তিশক্তির স্বভাব ধর্ম্মের বিচার করিলে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভগবান্ ভিন্ন অন্যত্র তৃষ্ণা শূন্যা ভগবানে মাত্র তৃষ্ণাস্বভাবা ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী সেবারূপা ভক্তির দ্বারা যখন ভগবান্ সুখী হন, তখন সেই ভগবৎসুখ অনুভব করিয়া **"আমি সুখী হইতেছি"** এই প্রকার ধীষণা (বুদ্ধিবৃত্তি) ভক্তের হৃদয়ে উদিত হয় না। ভগবানের সুখ দেখিয়া ভগবানের সুখপ্রদ সেবা ভুলিয়া "আমি সুখী" "অহো আমার সুখ" "এই আমি সুখী হইতেছি" ইত্যাদি **স্বতন্ত্র বিশিষ্ট সুখানুসন্ধানে ভক্তের হৃদয় ব্যস্ত হইয়া উঠে না।** এই প্রকার অনুভব ভক্তির বাধক। সেবার দ্বারা যদি সেব্য ভিন্ন পদার্থের অনুসন্ধান থাকে তবেই তাহা **সকাম হয়।** ভক্তের হৃদয়ে তাহা হয় না।

এখানে পুনশ্চ সন্দেহ হইতে পারে—যদি ভগবৎসুখে ভক্ত সুখী না হন তাহা হইলে ভক্ত সুখী হন কিসে? যদি ভগবানের সুখে সুখী না হইয়া

তদ্‌ভিন্ন কিছুতে সুখী হন তাহা হইলেও সকাম ভক্তিই হইল; আর যদি ভগবান্‌কে ভক্তি করিয়া ভক্ত কোনই সুখ অনুভব করেন না তাহা হইলে ভক্তি অপুরুষার্থই হইয়া পড়ে, **সুখই সকলের পুরুষার্থ।** সুতরাং "নিষ্কামভক্তি" সিদ্ধান্তে সন্দেহের বজ্রলেপ দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল, ইহার সমাধান কি প্রকারে হয়?

ইহার সমাধানে ভক্তিরসিকগণ বলেন যে ভগবৎ সেবারূপা ভক্তির দ্বারা **স্বয়ং সুখরূপ ভগবান্** সুখী হইতেছেন ("প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাৎ" —শ্রীভাগবত) এই অনুভবই প্রবল হয়। এবং ভগবানের সুখ অনুভব করিয়া "মৎসুখং স্যাৎ" আমার সুখ হয় বা হইতেছে ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিশেষ ভাবে নিজকে সুখী বলিয়া অনুসন্ধানটি ভক্তের হৃদয়ে উদিত না হইলেও, ভগবানের সুখোল্লাসের অনুভব হইতে স্বভাবতঃ অভ্যুদিত একটি স্বোল্লাস সুখ ভক্তহৃদয়ে উদিত হয়। ইহাকে ভক্তি জনিত **স্বরূপোল্লাস** বলা যায়। যেমন কোনও বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষমূলের উল্লাসে বৃক্ষের শাখাপল্লবও উল্লসিত হয়, সেই প্রকার ভক্তের ভক্তিসেবামৃতাভিষিঞ্চনে মূল পরমস্বরূপ ভগবানের উল্লাসেই তদাশ্রিত জীবস্বরূপও উল্লসিত হয়, ইহাই স্বরূপোল্লাস। ভগবৎ সেবা দ্বারা উল্লসিত ভগবানের সুখ অনুভব করিয়া ভক্তহৃদয়ে যে সুখরূপ স্বোল্লাস উদিত হয়, তাহা ভক্তিময় স্বোল্লাসই, অর্থাৎ ভগবদানুকূল্যতৃষ্ণাময় স্বোল্লাসই উদিত হয়। তাৎপর্য্যার্থ এই ভক্তি দ্বারা আনন্দিত শ্রীভগবানের সুখ অনুভব করিয়া সেই সুখেই উল্লসিত ভক্তহৃদয়ে অধিকতর **ভগবৎ-সেবার তৃষ্ণাই** জাগিয়া উঠে। ভগবৎসেবাজনিত ভগবৎসুখ, সেই সুখ অনুভব করিয়া ভক্তহৃদয়ে যে সুখ, তাহা পুনঃ **ভগবৎসেবাস্পৃহাময় স্বোল্লাস বিশেষ সুখ,** ইহা ভগবান্ ভগবানের সেবা ভিন্ন স্বতন্ত্র নিজ ভোগ্য কোনও অন্য সুখ নহে। এই প্রকার **সেবা স্বোল্লাস সুখই পরম পুরুষার্থ, ইহাই নিষ্কাম ভক্তি।** অচিন্ত্য ভাগবতী শক্তির এই পারম্পরিকা ধারা শাস্ত্র-প্রামাণিকী এবং ভক্তিরসিকবিদ্বদানুভবিকী। এতাদৃশী নিষ্কামা ভক্তির চরম নিদর্শন গোপিকাদিগের মহাশ্চর্য্যময় শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দনিষেবণানুসন্ধানে পাওয়া যায়। ইহা তাদৃশ ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মহতী কৃপা সাপেক্ষ।

রাধিকানাথপাদাব্জসেবনোৎসুকতৎপরঃ।
সুসূক্ষ্মামপি জানাতি ভক্তিং ভাগবতীং শ্রিয়ম্॥

সম্প্রদায় ভেদ
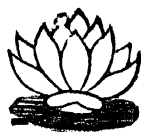
প্রশ্ন—হিন্দুধর্ম্মে এত সম্প্রদায় ভেদ কেন? শক্তি শিব সূর্য্য বিষ্ণু ইত্যাদি ভিন্ন উপাসনা কেন? ইহাতে পরস্পর সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়া সমাজের ক্ষতি হয় না কি?

উত্তর—হাঁ, আমাদের বুদ্ধির দোষে সমাজের গুরুতর ক্ষতিই হইতেছে। ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু উহা আমাদের বুদ্ধির দোষেই, সম্প্রদায় বিভেদের জন্য নহে। সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের মূলতাৎপর্য্যানভিজ্ঞেরাই পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্যাদির পরবশ হইয়া সমাজের ক্ষতিই করে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের রহস্যাভিজ্ঞদের দ্বারা তাদৃশ সম্প্রদায় ভেদেও কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—এই প্রকার বিভেদের তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের ইহাই ত গৌরব, যেহেতু ধর্ম্মের এত বিভেদ। সম্প্রদায় বিভাগের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের বিশালতা এবং হিন্দু ধার্ম্মিকগণের অপূর্ব্ব মনীষিতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মবিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গবেষণার ফলই এই প্রকার হিন্দুশাস্ত্রের উপাসনার ভেদ নির্ণয়। উপাসনা ভেদে উপাসকের ভেদ হয়, এবং উপাসকমণ্ডলীর পরস্পর বিভিন্ন উপসনা জনিতই সম্প্রদায়ও বিভিন্ন হইয়াছে। এই প্রকার পরস্পর বিভক্ত সম্প্রদায় সমূহই আবার একত্র গ্রথিত হওয়ায় এক মহাসম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে। বেদাদি আর্ষ শাস্ত্রানুগত সম্প্রদায় রহস্যটি

ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে জ্ঞাত হইলে আর্য্যধর্ম্মের রহস্যও অবগত হওয়া যায়। শাক্ত শৈব সৌর বৈষ্ণব এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিজ্ঞান পরিণামে সমষ্টি এক আর্য্যধর্ম্মের মহা জ্ঞানসাগরে মিলিত হয়। আপনারা শাক্ত শৈব সৌর বৈষ্ণব বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যত ভেদ দেখেন বস্তুতঃ কিন্তু উহারা পরস্পর অতটা বিভিন্ন নয়। পরস্পরের উপাসনার মধ্যে পরস্পরের উপাসনার অনুপ্রবেশ আছে। শাক্ত উপাসনার মধ্যে শৈব সৌর বৈষ্ণব উপাসনার অনেক অঙ্গের অনুপ্রবেশ আছে, এবং বৈষ্ণব উপাসনার মধ্যে ঐ প্রকার শাক্ত শৈব উপাসনার অঙ্গ প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং সেই সেই পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার প্রকারে ভেদ হইলেও প্রত্যেক সাধকেরই আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত এক পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেছি এই বোধ থাকে। যাহাতে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া পরস্পরের অতিশয় ক্ষতি হইতে পারে তাদৃশ পরস্পর অত্যন্ত নিরপেক্ষ ধর্ম্ম আর্য শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দুধর্ম্ম নহে। বেদই সকল প্রকার আর্য্যধর্ম্মশাখার মূল। ঐ বেদই আবার ব্যাখ্যাক্রম প্রাপ্ত হইয়া পুরাণেতিহাস তন্ত্রাদি নাম ধারণ করিয়া নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমষ্টিরূপে ঐ সকলের মূল একমাত্র বেদই। বেদ একই, এবং তত্ত্বতঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বের উপাসনা একই।

প্রশ্ন—যদি শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদির মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ থাকে এবং হিন্দুধর্ম্ম সকল পরস্পর নিরপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে একান্তী শৈব একনিষ্ঠ শাক্ত ঐকান্তিক বৈষ্ণব ইত্যাদি শাস্ত্র ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হয়? বিশেষতঃ ঐকান্তিক একনিষ্ঠ নৈষ্ঠিক প্রভৃতির ব্যবহার আপনাদের বৈষ্ণবের মধ্যেই বেশী শোনা যায়।

উত্তর—হাঁ, বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই ঐকান্তিক ভাবটি প্রবল দেখা যায়। ঐ ঐকান্তিকতাটি বর্জ্জনমূলক নহে, গ্রহণমূলক অথবা সমন্বয়মূলক, ইহা ভাল করিয়া বুঝা চাই। প্রথমতঃ শ্রীগুরূপদিষ্ট শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসকের মনটি নিষ্কলুষ একাগ্রতা অবলম্বন করে তখন নিজ ইষ্টে বিশ্বাত্মতা অনুভব হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিভূতেই নিজ ইষ্টের সত্তা অববোধ হইয়া ঐ বিশ্বাত্মতা জ্ঞান গাঢ় হইতে হইতে

শেষে একমাত্র ইষ্ট তন্ময়তাই লাভ হয়, তখনই ঐকান্তিক বলা যায়। ভাবের ঐকান্তিকতাই শ্রেষ্ঠ ঐকান্তিকতা। ঐকান্তিকতা দুই প্রকার, উপাসনাক্রিয়ার ঐকান্তিকতা আর উপাসনাক্রিয়ার দ্বারা সঞ্জাত ভাবের ঐকান্তিকতা। **উপাসকের মনোবৃত্তির উপর সর্ব্বভূতে ভগবদন্তর্যামিতা এবং ভগবানে সর্ব্ব জগতের আশ্রয়তা অনুভব জনিত যে ভগবত্তন্ময়তা আসে তাহাকেই ঐকান্তিক অবস্থা বলে।** ক্ষুদ্র মনের সঙ্কীর্ণতা ঐকান্তিকের নাম ধারণ করিয়া অজ্ঞ লোকের নিকট যাহা প্রকাশ পায় তাহাতেই পরস্পর সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন—মনের নিষ্কলুষ একাগ্রতা কাহাকে বলে ?

উত্তর—যে একাগ্রতার মধ্যে ক্ষুদ্র কাম্য ঐহিক পারলৌকিক সুখ বাসনার কলুষতার সম্পর্ক না থাকে, **মন কেবলমাত্র স্বীয় ইষ্ট-আরাধনা-সুখ-নিশ্চলতায় পূর্ণ থাকে, তাহাই মনের নিষ্কলুষ একাগ্রতা।** বৈষ্ণবদিগের উপাসনায় মনের এই নিষ্কলুষ একাগ্রতা অতি শীঘ্রই নিষ্পন্ন হয় বলিয়াই বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নৈষ্ঠিক ঐকান্তিক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও বেশী।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবদিগের উপাসনার মধ্যে তাদৃশ একাগ্রতা শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে, অন্যের উপাসনায় শীঘ্র হইবে না, ইহার কোনও কারণ আছে ?

উত্তর—হাঁ, শুদ্ধভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন উপাসনা এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিতমূর্ত্তি বিষ্ণু পদার্থের স্বভাবই ইহার কারণ।

প্রশ্ন—নিষ্কাম উপাসনায় মনের নিষ্কলুষ একাগ্রতা জন্মে, সকাম উপাসনায় জন্মে না কেন ?

উত্তর—মনের নিষ্কলুষ একাগ্রতার ফলে ইষ্টদেবতাতে বিশ্বাত্মতা বোধ আনয়ন করে। **সকাম উপাসনায় ইষ্টদেবতাতে বিশ্বাত্মতা অনুভব সঙ্কোচ করিয়া তুলে।** কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনাকল্মষই উক্ত অনুভবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রাকৃত ইহলোক পরলোকের সুখ কামনায় চিত্তে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

প্রশ্ন—যেমন শক্তি-উপাসক শিব-উপাসক প্রভৃতির উপাসনায় ক্ষুদ্র ইহলোক পরলোকের সুখ কামনা থাকিলে স্বীয় ইষ্টে বিশ্বাত্মতা অনুভবটি সঙ্কুচিত

হয়, সেই প্রকার কামনাপূর্ব্বক বিষ্ণু-উপাসনাতেও ইষ্টদেবতা বিষ্ণুতে বিশ্বাত্মতা বোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে ত ?

উত্তর—ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। যাগাদি কর্ম্মসাধনে কামনা বিশিষ্ট হইয়া সাধারণ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞানে যে বিষ্ণু-উপাসনা করা যায় তাহার ফলে বিষ্ণুতে বিশ্বাত্মতা জ্ঞানের সঙ্কোচ হয় বটে, কিন্তু কামনা বিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভক্তি অঙ্গ সাধনের দ্বারা বিষ্ণু আরাধনা করিলে বিষয়ভোগান্তে শ্রীভগবৎকরুণায়, অথবা ভগবৎকরুণায় বিষয় কামনা রহিত হইয়া, অন্তঃকরণে ভগবানের বিশ্বাত্মতা ভাব জাগিয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্তস্থল শ্রীধ্রুব মহাশয়, ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিতবিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং ভক্তি সাধনার অচিন্ত্য স্বভাব বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র নির্ঘোষ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—আমার মূল প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাই নাই। আমার প্রশ্ন হিন্দু-ধর্ম্মে এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কেন? এবং ইহাতে সমাজের ক্ষতি হয় না কি ?

উত্তর—আমি সংক্ষেপে বলিয়াছি যে উপাসকবর্গের উপাসনার বিভেদেই এই সম্প্রদায় বিভেদ।

প্রশ্ন—কেন ? সকলের জন্য এক উপাসনাই ত ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ? সকলেই আমরা এক ভগবানের। তা না হইয়া এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার ব্যবস্থাতেই যত সাম্প্রদায়িকতা এবং গোঁড়ামি বৃদ্ধি পাইয়া কেবল সমাজেরই ক্ষতি করিতেছে।

উত্তর—যথাতথা সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি ইত্যাদি ভাষা অজ্ঞ লোকেরাই অধিকাংশ প্রয়োগ করে। যাঁহারা অজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞাভিমানী, ধর্ম্মের একটি জগাখিঁচূড়ী বানাইয়া প্রকৃত শাস্ত্রবিহিত ব্যবহারকে গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া নাসা কুঞ্চন করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রীয় সম্প্রদায় ভেদে বিবাদ হইবার কিছুই নাই। দেখুন, সকলের জন্য এক উপাসনা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না, হইলে প্রকৃত উপাসনার রহস্যও থাকে না। উপাসক বলিতে উপাসনার অধিকারীকেই বুঝায়। অধিকারী আবার অধিকার্য্য বিষয়ে যোগ্যতা অনুসারেই হয়, অর্থাৎ যে যে বিষয়ে যোগ্য সে সেই বিষয়েই অধিকারী, যে বিষয়ে যাহার যোগ্যতা নাই, সে বিষয়ে সে অধিকারী নহে। এখন

ভাবুন, পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম গুণ স্বভাবসম্পন্ন পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির পক্ষে একরকম উপাসনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে অতি সাধারণভাবে যে সকল ধর্ম্মের উপাসনা হিন্দু শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য একই, যেমন সত্য দয়াদি, সাধারণভাবে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা প্রভৃতি। কিন্তু বিশেষভাবে উপাসনাটি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা কি একই রকম সম্ভব হয়? আপনার যোগ্যতা এবং আমার যোগ্যতা এবং অপর আর একজনের যোগ্যতা কি এক হইতে পারে? আপনার কর্ম্মগুণস্বভাবানুযায়ী মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহাদির গতি একপ্রকার, বুদ্ধিবল একপ্রকার; আবার আমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহাদির গতি এবং বুদ্ধিবল আমারই ভিন্ন কর্ম্মগুণ-স্বভাবানুযায়ী ভিন্ন প্রকার; আবার অন্য একজনের অন্যপ্রকার। এই প্রকারে পরস্পর বিভাগপ্রাপ্ত কর্ম্মগুণ স্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্যগণ যাহার যেমন যোগ্যতা তদনুসারে উপাসনার স্তরে যাহাতে অনায়াসে দাঁড়াইয়া উপাসনার ক্রমানুসারে ভগবত্তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা আত্মা মন প্রাণাদিকে কৃতার্থতার পথে উন্নীত করিতে পারে, বেদরহস্যজ্ঞ অধ্যাত্মতত্ত্ব গবেষণায় পারদর্শী ঋষিগণ শাস্ত্রে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। একজন সুশান্ত সাত্ত্বিকস্বভাব সুমেধা উত্তম বল চরিত্রবান্ ব্যক্তি নিজ যোগ্যতানুসারে সাধনার স্তরে আরূঢ় হইয়া বিনা আয়াসে স্বাভাবিক চেষ্টার অনুগত থাকিয়াই ভগবত্তত্ত্বানুশীলনে উৎকৃষ্ট ক্রমগতি লাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হিন্দু আর্য্যশাস্ত্রে যেমন সুগম, তেমনই আবার দুর্দ্দান্ত রজস্তমঃস্বভাব উগ্রপ্রকৃতিক দুর্মেধা অধম বল চরিত্রবান্ ব্যক্তিও নিজ যোগ্যতানুসারে উপাসনার স্তরে আরূঢ় হইয়া বিনা আয়াসে নিজ স্বাভাবিক চেষ্টার অনুগত থাকিয়াই ভগবত্তত্ত্বানুশীলনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও হিন্দু আর্য্য শাস্ত্রে সুগম। হিন্দু আর্য্য শাস্ত্রের ইহাই এক প্রধান গৌরব। এই জন্যই সম্প্রদায় বিভেদ দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোনও অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হউক না কেন, অর্থাৎ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হউক, আবার যতদূর অধম অপেক্ষা অধমতর হউক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গীয় স্বভাব বিশিষ্ট হউক,

অথবা অতি নিকৃষ্ট নারকীয় স্বভাব বিশিষ্ট হউক, বিশাল পরমোদার হিন্দু আর্য্যশাস্ত্র তাহার স্বভাবগুণানুসারে সাধন পথ আবিষ্কার করিয়া সর্ব্ববিধ মনুষ্যের পরম উপকারই করিয়াছেন। এই প্রকার পরমার্ষ দৃষ্টি প্রসূত বেদানুগত ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাসম্প্রদায় বিভাগটি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ক্ষতিজনক নহে।

প্রশ্ন—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণ এই সমস্ত উপাসনার বিভাগ নিজ নিজ কল্পনা অনুসারেই করিয়াছেন। ঈশ্বর ত একই, কালী শিব বিষ্ণু ইত্যাদি মূর্ত্তি তাঁহাদের কল্পনাই বলিতে হইবে। আপনারাও ত বলেন, "ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।"

উত্তর—কল্পনা কল্পনা বলিয়া চিৎকার করা যত সহজ কল্পনা শব্দের অর্থ করা তত সহজ নহে। কল্পনা শব্দের অর্থ যদি 'নিশ্চয়' বলেন তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই, কেননা মহর্ষিগণ বনের ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সত্যের তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া আপনাদের মত মিথ্যা কাল্পনিক কতকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন এইরূপ ধারণা আমার নাই। বাক্যের সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা কঠোর মৌনব্রতাবলম্বী তাঁহাদিগকে মিথ্যা কাল্পনিক গল্পরচয়িতা বলা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর নাই। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াই সত্যপদার্থের অনুসন্ধান আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা। তত্ত্বতঃ একই পরমেশ্বর সাধক ব্যক্তি-সমূহের হিত বিধানের জন্য নিজের অনন্তরূপ কল্পনা অর্থাৎ প্রকট করিয়া থাকেন; ইহাই "ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।" এই রূপকল্পনার কর্ত্তা ব্রহ্মই; ব্রহ্ম সত্য হইলে তাঁহার কল্পনাও সত্য; অজ্ঞ লোকেরা কল্পনা বলিয়া চিৎকার করুক, "ব্রহ্মণঃ" কর্ত্তায় ষষ্ঠী যষ্টি ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চয়ই থামাইবে। তিনি এক হইয়াও বহুমূর্ত্তি, আবার বহু মূর্ত্তিতে তিনি একই, ইহাই ঈশ্বরের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। ভাবিয়া দেখুন, যিনি এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি অনন্ত জীবের অনন্ত কর্ম্মের ফলপ্রদাতা, সেই ভগবান্ নিজ সৃষ্ট অনন্ত গুণ কর্ম্ম স্বভাব বিশিষ্ট জীবনিচয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, ইহা কি সম্ভব? বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ যেমন নিজের মায়াশক্তি দ্বারা জীবের কাল কর্ম্ম গুণ স্বভাবাদির পরিচালক

হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করিতেছেন, অনাদি কর্ম্মচক্রে অনাদিকাল হইতে ভ্রাম্যমান জীবগণের স্বীয় গুণকর্ম্মস্বভাবানুযায়ী ফল প্রদান করিতেছেন, তেমনই আবার নিজ স্বরূপশক্তির দ্বারা শক্তি শিবাদি নিজ রূপ সমূহ প্রকটন পূর্ব্বক জীবের স্বভাবকর্ম্মগুণানুসারে সহজ উপাসনার যোগ্য উপাস্যমূর্ত্তি হইয়া মায়াকর্ম্মচক্র হইতে নিষ্কৃতি বিধান করিতেছেন। যদি ঐ জীবসমূহের নিজ নিজ কর্ম্মগুণস্বভাবানুকূল উপাসনার যোগ্য সহায়ক, এবং সেই সেই কর্ম্মগুণস্বভাবানুকূল ভগবদ্ভাবোদ্বোধক কোন আলম্বন স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটনের বিধান সর্ব্বসমর্থ পরমকরুণ পরমেশ্বরে না থাকে, তাহা হইলে পরমেশ্বর তত্ত্বে পূর্ণতার হানিজ্ঞান উপাসনার রহস্যানুসন্ধিৎসু মনীষী জনের মনে অবশ্যই উদয় হইবে। সেই সেই কর্ম্মস্বভাবগুণানুযায়ী উপাস্যমূর্ত্তিই শক্তি শিব সূর্য্য বিষ্ণু ইত্যাদি এক পরমেশ্বরেরই বিশেষ বিশেষ রূপ।

প্রশ্ন—কেন পরমেশ্বর ত অন্তর্যামিরূপে অনন্ত জীবের অনন্ত কর্ম্মের প্রেরক এবং ফলদাতা রূপে ত আছেনই, সেই অন্তর্যামী ফলদাতা রূপে জীবের উপাসনার ফল দিতে ত পারেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ণতাহানির সম্ভব কোথায়? অন্তর্যামী পরমেশ্বর রূপে জীবের উপাস্য হওয়া কি অসম্ভব? একবার অন্তর্যামী কর্ম্মপ্রেরক কর্ম্মফলদাতা রূপে পরমেশ্বর আছেন, আবার শক্তি শিব ইত্যাদি উপাস্য রূপে পরমেশ্বর আছেন, এই প্রকার ঘেরাল করিয়া গৌরব স্বীকার করি কেন? সহজেই ত কার্য্য সিদ্ধ হয়।

উত্তর—সহজে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া একটা ন্যাড়ামুড়া ফল পাওয়া অপেক্ষা একটু ঘেরাল করিয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ, যদি উত্তম রসাল ফল পাওয়া যা[illegible] ফলে চমৎকারিতার আধিক্যে গৌরবটি দূষণ হয় না, বরং ভূষণ[illegible] এখন দেখুন, অন্তর্যামী পরমেশ্বর রূপে জীবের যে কর্ম্মপ্রেরণা এ[illegible] প্রদান তাহা সাধারণ কার্য্য। পরমেশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা উপাস[illegible] সাধারণ জীব সমূহের সাধারণ মায়িক কর্ম্মের ফল প্রদান ক[illegible] এই প্রকার পরমেশ্বরের সাধারণ কৃপা থাকিলেও জীবের [illegible] নিবৃত্তি নাই। পরমেশ্বর যখন জীবের উপাস্যত[illegible] কর্ম্মফলপ্রদাতা হন তখনই কর্ম্মচক্র নিবর্ত্তিত হয়। স[illegible]

জীবের সাধারণ কর্ম্মফলদাতা হইয়া পরমেশ্বর যখন জীবের উপাসনার উপাস্যবিশেষ হইয়া দাঁড়ান তখন উপাসনা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ফলদাতা রূপে জীবের পরম কল্যাণই বিধান করিয়া থাকেন। শক্তি শিব আদি এক পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই নানাবিধ আবির্ভাব।

প্রশ্ন—কেন, পরমাত্মরূপে পরমেশ্বর কি জীবের উপাস্য হইতে পারেন না? তার জন্য আবার শক্তি শিব আদি রূপ পরিগ্রহের সার্থকতা কি?

উত্তর—কর্ম্মগুণাদির প্রেরক শুদ্ধ অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর উপাস্য হইতে পারেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মপ্রবর্ত্তক মাত্র শুদ্ধ অন্তর্যামী ভাবে পরমেশ্বরের উপাসনার যোগ্যতাও যাহাদের নাই এতাদৃশ গুরুতর প্রাকৃত হীনকর্ম্মরত প্রবলরজস্তমঃপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবের সেই রজস্তমঃ-স্বভাবের দ্বার দিয়া যাহাতে উপাসনার সাহায্য হয় এবং সেই স্বভাবের দ্বার দিয়াই অন্তর্যামিভগবদ্ভাব উদয় হইতে পারে তাহারই বিধানের নিমিত্ত উপাসনার আলম্বনই কালী দুর্গা প্রভৃতি শক্তি এবং শিব ইত্যাদি ইহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরমানুগ্রহময় শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাহাদের স্বভাবানুযায়ী উপাস্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তীব্র রজস্তমঃ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্বভাবানুযায়ী সাধনই সুকর হয় এবং তাহার দ্বারাই ক্রমশঃ তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইলে মঙ্গলপথ আবিষ্কৃত হইতে থাকে। "রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।" শুদ্ধ কেবলমাত্র কর্ম্মপ্রেরক বা কর্ম্মফলপ্রদাতা রূপে পরমেশ্বরের উপাসনা তাহাদের পক্ষে এতাদৃশ সুকর নহে। ইহাই হিন্দু আর্য্যধর্ম্মে উপাসনায় সম্প্রদায়বিভেদের কারণ। মনুষ্যমাত্রেরই পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্ববিধ যোগ্যতাই হাতে ক্রমশঃ শুদ্ধ শ্রীভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে তাহারই ত ঔদার্য্যের নিদর্শন এবং পরমর্ষি সকলের অধ্যাত্মবিজ্ঞান গবেষণার দর্শন সম্প্রদায়বিভেদে লুক্কায়িত আছে।

বুঝিলাম যে ভগবান্ জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই স্বভাবানুযায়ী সাধনের সৌকর্য্য যাহাতে হয় তদুপায়ীভূত শক্তি শিব ইত্যাদি মূর্ত্তি সকল নিজস্বরূপশক্তিবলেই প্রকাশ ও বুঝিলাম যে সেই সেই উপাস্য শক্তি শিব ইত্যাদি

ভগবানেরই স্বরূপ। সেই সকল ভগবৎস্বরূপগণ জীবের নিজ নিজ স্বভাব যোগ্যতানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানাভাবে উপাসিত হয়েন। পরস্পর এই পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার সৌকর্য্যের জন্যই আমাদের একই মহাব্যাপক আর্য্যধর্ম্ম নানা সাম্প্রদায়িক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তবে পরস্পর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় কেন?

উত্তর—প্রথমেই বলিয়াছি ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ লোকদিগের মূঢ়তার ফলেই ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনভজনের মধ্যেও পরস্পরের বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। তাহারা ধর্ম্মের ভান করিয়া অতি হীন হিংসাদ্বেষাদি কদর্য্য মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করে, একই আর্য্যহিন্দুধর্ম্মের অনুগামী হইয়াও বৈষ্ণবে শাক্তে, শৈবে বৈষ্ণবে পরস্পর খুনাখুনি করে। তাহারা মুখে বলে—"আমি ভগবানের উপাসনা করি।" কিন্তু আমার মনে হয় তাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়াই মনে মনে হিংসা দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়াই **হঠকারিতারই উপাসনা করে।** তাহারা মনে করে না, "আমি যে ভগবানের উপাসনা করিতেছি সেই ভগবান্ হীন স্বার্থলোলুপতা নিষ্ঠুরতা অসত্যপরায়ণতা ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতিতে সন্তুষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজীবের অন্তরেই আছেন, তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার, তিনি সর্ব্ব-উপাস্য; উপাসকের যোগ্যতানুসারে নানাবিধ উপাসনায় নানাবিধরূপে নানাবিধ ভাবে আমারই উপাস্য তিনি উপাসিত হইতেছেন।" হায় মূঢ়, তুমি যেভাবে যেরূপে ভগবানের উপাসনা কর তাহাই ভগবানের উপাসনা, অন্যে যেভাবে যেরূপে উপাসনা করে তাহা ভগবানের উপাসনা নহে ইহাই কি তুমি মনে কর? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কি তোমার [illegible] নহেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের কালকর্ম্মগুণ স্বভাবাদির [illegible] তোমার ভগবান্ নহেন? তোমার ভগবান্‌কে কি তুমি জি[illegible] যে আমি ভিন্ন অন্যে যাহা উপাসনা করে তাহা ভগবানে[illegible] অন্যের হৃদয়ে অন্যপ্রকার উপাসনায় উপাসকের [illegible] ব্যাকুলতায় তাহার উপাস্যের যে সাড়া সে পা[illegible] ভগবানের দেওয়া সাড়া নহে ইহাই কি তোমার [illegible] দিয়াছেন? হায় ভ্রান্তমনা জীব! [illegible]

মাৎসর্য্য গর্ব্ব অভিমানাদি প্রবল হইতেও প্রবলতর হইতে থাকে তাহা হইলে দুর্ব্বল হইয়া ইহারা তোমার শান্তি বিধান করিবে কবে? হতভাগা চিরবঞ্চিত ভ্রান্ত মন! তুমি একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর, তুমি কি সত্যই ভগবানের উপাসনা করিতেছ, না উপরে **ভগবদুপাসনার নাম দিয়া তার আড়ালে পরের উৎকর্ষাসহন, হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতা প্রভৃতি অতি কদর্য্য বৃত্তি সমূহের উপাসনা করিতেছ।**

অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মের আচার ব্যবহার লইয়াও পরস্পরের মধ্যে গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় ধর্ম্মের প্রকৃত আচার বিষয়ক জ্ঞানের অভাবেই এই গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি হয়। যদি কোনও একটি ধর্ম্মাচরণ রক্ষা করিতে যাইয়া তদপেক্ষা আর একটি গুরুতর মূল্যবান্ ধর্ম্মের আচারের মস্তক পদাঘাত দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে হয় তাহা হইলে উহা ধর্ম্মাচরণের পরিবর্ত্তে গুরুতর অধর্ম্মই হইবে। অনেক স্থলে ধর্ম্মের আচার ঠিক ধর্ম্মের পুষ্টিবিধান না করিয়া নিজের **হঠকারিতারই পুষ্টিবিধান করে। এই প্রকার হঠকারী ব্যক্তিরাই প্রকৃত গোঁড়া।** যাহার যে প্রকার উপাসনার অনুকূল শাস্ত্র সদাচার তাহা অন্যের কোনও শাস্ত্রীয় সদাচারের উপর কোন গুরুতর আঘাত না করিয়া নিজ নিজ যথাযোগ্য কর্ত্তব্যবোধে প্রতিপালিত হইলে আর কোনও বিরোধের সৃষ্টি হয় না। এবং ঐ আচার ব্যবহারগুলির মধ্যে আবার **অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ** জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন—পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের পরস্পর আচারের পার্থক্য থাকাতেই ত বিরোধের সৃষ্টি। একের আচার অন্যের বিরুদ্ধ এমনও ত আছে?

হাঁ, আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পরস্পর হিংসা দ্বেষ কেন হইবে?
 ... কোনও একটি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার যদি তাহার শাস্ত্রীয় অধিকারে
 ...র উপাসনার অনুকূলই হয়, আর তাহা যদি আমার শাস্ত্রীয়
 ...র উপাসনার প্রকৃত প্রতিকূলই হয়, তাহা হইলেও
 ...দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া একটা গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি
 ...হ? ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞান থাকিলে, ধর্ম্ম বলিয়া
 ... এবং ধর্ম্মে প্রকৃত বিবেক লাভ হইলে, যতই

বিরোধ আসুক না কেন সমস্তই ধার্ম্মিক হৃদয়ে ধর্ম্মের বলেই সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। নিজের আচরণকারীকে ধারণ পোষণ করে বলিয়াই তাহার নাম ধর্ম্ম, এবং যাবতীয় ধর্ম্মের মূল একমাত্র **ভগবৎপরিতোষণই।** ভগবৎপরিতোষণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মের অঙ্গ উপাঙ্গ স্থানীয় আচারাদি প্রতিপালন করেন তাঁহাদের হৃদয়ে হিংসাদ্বেষাদি প্রবল হইতে পারে না। ধর্ম্ম আচরণের ফলে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্য গর্ব্বাদি কলুষিত ভাব সকল নির্ম্মূল হইয়া যায়। **সর্ব্বভূতে ভগবদন্তর্যামিতা জ্ঞানে সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ লাভ করাই ভগবৎ-পরিতোষণ। চেতনমাত্রেই শ্রীভগবানের বিশেষ সত্তা অবস্থান করিতেছে, এই জ্ঞানে সর্ব্বত্র মৈত্রী ব্যবহার করাই ভগবৎ-পরিতোষণ।**

যে স্থলে অন্যের বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় আচারের সহিত নিজের আচারের বিরোধ উপস্থিত হয় সে স্থলে অতি ধীরতার সহিত অপরের প্রতি যাহাতে হিংসাদির উদয় না হয়, অথচ নিজের যোগ্য আচারটি বিনয় নম্রতা সৌজন্য প্রভৃতির সহিত প্রতিপালিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় আচারের বিরোধী অন্যের আচারের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভগবৎপাদপদ্মই স্মরণ করিবেন। আমাদের দুর্দ্দৈবে অনেক সময় ধর্ম্মের ভানে নিজদিগের বৃথা দম্ভাদি প্রকাশ করিয়া থাকি। উত্তেজনার বশে ক্ষুদ্র আচারকেও অতি গুরুতর আচার বলিয়া মনে করি এবং তাহার রক্ষণ হঠতায় উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মের মর্ম্মস্থলে আঘাত করি। যেম
করুন, কোন ভট্টাচার্য্য স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনাদিতে যা
পথিমধ্যে কোন দরিদ্র ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কাতরতার সহি
প্রার্থনা করিল। তিনি তখন উত্তেজনার বশে ক
শুনাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাক্রোধ প্রকাশ করিলে
কাতরতার সহিত তাঁহার পদ ধারণ করিয়া ভি
অস্নাত অপবিত্র ভিক্ষুকের স্পর্শে নিজেকে
নাসাকুঞ্চন ও ক্রোধে মুখবিকৃতি প্রকটন
জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,

পথের কণ্টক পথ হইতে দূরে অপসারণ করিয়া দিলেন। বলুন, ইহাই কি শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে নিজের পবিত্রতা রক্ষার সদাচার ?

এই প্রকার শাক্তবৈষ্ণবের স্বীয় স্বীয় সাধনোচিত পরস্পর বিরোধী কতকগুলি আচার ব্যবহারের মর্ম্মকে অবগত না হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল মাত্র সেই সেই আচারের হঠকারিতা প্রকটন করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করিয়া তুলে এবং হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া সমাজের ক্ষতিই করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—আপনাদের বৈষ্ণবেরা যে অন্য দেবতার পূজাদি করেন না এবং অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন না, অন্য দেবতার উপাসককে খুব ঘৃণা করেন, ইহাতে কি সামাজিক বিবাদের সৃষ্টি হয় না ?

উত্তর—অন্য দেবতার উপাসককে ঘৃণা করা ত দূরে থাকুক, প্রকৃত বৈষ্ণব ব্যক্তি অতি সামান্য জীবকে ও ঘৃণা করিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ কি বলেন একবার শুনুন—

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

জীব মাত্রকেই যখন কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জ্ঞান করিতে হইবে এবং যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে, তৃণাদপি সাধনটি যাঁহাদের হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে গলার হারের মত রক্ষা করিতে হইবে ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের আদেশ, তখন সেই বৈষ্ণব যদি তাঁহারই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই অংশ কলা বিভূতি স্বরূপ অন্যান্য দেবতার উপাসককে সত্যই ঘৃণা করেন, তাহা হইলে ।হাদের বৈষ্ণবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের মতবিরুদ্ধই হইবে। ইহা শৎ সেবাপরাধের মধ্যে একটি গুরুতর অপরাধই। বৈষ্ণবেরা অন্য াসাদ গ্রহণ করেন না বা অন্য দেবতার পূজা করেন না এই সত্য নহে, আংশিক সত্য। শাস্ত্রদর্শী সাধক বৈষ্ণবগণ গবদংশ শক্তি প্রভৃতির অর্চ্চন করেন এবং প্রসাদও াহারা অন্যের (বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য জনের) পূজিত ত কুণ্ঠিত হয়েন ইহা সত্য। ইহার মধ্যে

া, যত সাম্প্রদায়িক বিবাদের স্রষ্টা।

উত্তর—রহস্যগুলি বিবাদ সৃষ্টি করে না। রহস্যানভিজ্ঞ বিজ্ঞাভিমানী হতভাগ্যেরাই নিজ নিজ হঠকারিতার দ্বারা বিবাদের সৃষ্টি করে। শুনুন, একটু বুঝিতেও চেষ্টা করুন, আর্য্যশাস্ত্রীয় ভগবদুপাসনাটি গলাবাজি হল্লাগল্লা নহে, দলপাকাপাকির জন্যও নহে, বা উপাসনার আড়াল দিয়া পরস্পর পরস্পরের দম্ভ মাৎসর্য্য হিংসা দ্বেষাদিকে সার্থক করার জন্যও নহে, কেবলমাত্র জীবের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন আত্মার পরম কৃতার্থতার জন্য। এই দেহাদির মধ্যে মূল যে আত্মা একমাত্র তাহার কৃতার্থতার আনুকূল্যের ভাগ যাহাতে যত বেশী বিচক্ষণ উপাসকগণ তাহারই পুষ্টি বিধানের জন্য তত বেশী চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং তদনুপাতে অন্যের পুষ্টি বিধানের চেষ্টা যথাসম্ভব ক্রমেই করিয়া থাকেন। ইহাই হইল ধর্ম্মের অঙ্গ উপাঙ্গের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ জ্ঞান। ফল কথা উপাসকগণ নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের অঙ্গ উপাঙ্গ স্থানীয় আচার ব্যবহারগুলির আচরণে কোথায় কি ভাবে নিজের দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনের কতটুকু পরিমাণ হিত, কতটুকু পরিমাণ অহিত সাধিত হইতেছে, এবং তাহারা কি পরিমাণে আত্মার উন্নতি সাধন করিতেছে বা অবনতি বিধান করিতেছে ইহার প্রতি সুনিপুণ দৃষ্টি করিবেন। ইহার নামই ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ জ্ঞান। মনে করুন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"
প্রথমতঃ শরীর রক্ষা না করিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না; কথাটি সত্য
এই সত্যের পরিণাম কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখি
শরীর রক্ষা, শরীর রক্ষা করিয়া যাঁহারা কেবল শরীরের উ
তৎপর হইয়া উঠেন, তাঁহাদের ভাল ভাল পুষ্টিকর
নিরন্তর শরীরের মার্জ্জন ঘর্ষণ, স্নান শৌচ ইত্যাদি
হইয়া পড়ে। এদিকে কিন্তু "খলু ধর্ম্মসাধনং"
"শরীরমাদ্যং শরীরমাদ্যং" চলিতে থাকে। শ
বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, স্নিগ্ধ পুষ্টিকর
বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ অ
কাল অতিবাহিত হইতে থাকে।
হইতে থাকে। দৈবাৎ ে
মনোদুঃখ ক্রোধ প্রভৃতি, শ

মনের চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। ক্রমশঃ গর্হিত কার্য্য করিয়াও শরীর রক্ষার জন্য চিত্ত ধাবিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ কিন্তু আত্মকৃতার্থতার আনুকূল্যে দেহ অপেক্ষা মনের সহায়তার মূল্য অধিক। অথচ সেই মূল্যবান্ মনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শাস্ত্রবিহিত যথাযোগ্য দেহরক্ষণ ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইত্যাদি ধর্ম্মের নামে কেবল দেহরক্ষণে তৎপর হওয়ায় মনেরই সর্ব্বনাশ করা হইল। এখানে মনের স্বচ্ছতা, সাধনভজনে মনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় যে আচরণে তাহাই অন্তরঙ্গ। মনের আনুকূল্যে তদপেক্ষা অল্প মূল্যবান্ সাধনোপযোগী দেহের রক্ষণ করাই বহিরঙ্গ আচরণ।

যেমন মনে করুন শারীরিক পবিত্রতার জন্যই স্নানাদি বাহ্যিক শৌচকার্য্য। সেই স্নানটি একদিন কোনক্রমে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইল, অথবা স্নাত ব্যক্তিকে দৈহিক অপবিত্র কোন ব্যক্তি স্পর্শ করিল। তিনি নিজের দৈহিক পবিত্রতা মহিমায় অন্ধ হইয়া গুরুতর ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন, ক্রমশঃ ক্রোধ ঘৃণা দ্বেষ হিংসার প্রবল চাপ মনের উপরে চাপাইয়া মনকেই গুরুতর ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন। ঐ ক্রোধ ঘৃণা দ্বেষ হিংসার সংস্কারগুলি মনে আহিত হইয়া থাকিল; কালে ইহারাই আবার ভয়ঙ্কর ...রিগ্রহ করিয়া সকল সাধনভজনকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে। ... দৈহিক পবিত্রতা হইতে মনের পবিত্রতাই অন্তরঙ্গ। সদ্‌গুরুর ...ত ধর্ম্মরহস্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে এবং সাধক নিপুণতার ...র্ম্মবিষয়ক হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে ধর্ম্মাচরণের ...ঙ্গ কোন্‌টি বহিরঙ্গ ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। সুতরাং ...স্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারের হঠতারই প্রাবল্য ...দরও সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র নিজের দেহেন্দ্রিয় ... সহায়করূপে গৌণমুখ্যভাবে লক্ষ্যের বিষয় ...াগ্যতানুসারে ঐ নিজের দেহেন্দ্রিয় মনঃ- ...বর্গ স্বজনবান্ধবাদিও লক্ষ্যের বিষয় ...ই আত্মকৃতার্থতার সহায়ক হয়। ... উপদেশ পাইয়া ধর্ম্মানুযায়ী

আচরণে এমন একটা উৎকটতা সৃষ্টি করিলেন, যথা মস্তকমুণ্ডন, প্রকাণ্ড শিখা, বড় বড় রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালা, সুদীর্ঘ স্থুল তিলক চিহ্ন ধারণ, হবিষ্যান্নগ্রহণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, কম্বলাসন, কম্বলশয্যা ব্যবহার, স্বহস্তে রন্ধন ইত্যাদি প্রকাণ্ড আচার প্রচার করিতে লাগিলেন, অথচ যথাযোগ্য গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিতা, অর্থোপার্জ্জনাদিতে শিথিলতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহাতে আপনার স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা গৃহপরিবারবর্গ আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকিল। আপনারও কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া বৈরাগ্যমার্গে সাধনভজন করিবার যোগ্যতা নাই, ইচ্ছাও নাই, ভোগবিলাসের ভাব, স্ত্রী পুত্রাদিতে প্রিয়তা মনে বেশ প্রবলই আছে। কামক্রোধলোভাদির বেগ সহনে অক্ষমতা লইয়া নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর মত কতকগুলি বাহ্যিক আচারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বোপরি অলসতা প্রবল আকার ধারণ করিল। ফলে দিন রাত গৃহপরিবারের সঙ্গে সজ্ঘর্ষণ হইতে থাকিল। মনে অশান্তি আগুণ জ্বলিতে লাগিল, ভোগপিপাসা প্রবলই রহিল, কিন্তু ভোগের উপযোগী গৃহপরিবারবর্গের ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণে শিথিল দেহমন অলসতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে ক্রমশঃ ক্রোধ দ্বেষ হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া কেবল পরের দোষ দর্শন পূর্ব্বক পরের প্রতিকূল সমালোচনা এবং নিজের হা হুতাশ ভিন্ন আপনার ধর্ম্মাচরণে অধিক কি আশা করিতে পারেন? কোন কোন ধার্ম্মিকদিগের এই প্রকার দুরবস্থার কারণ অধিকার যোগ্যতা, ধর্ম্মাচরণের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভেদ প্রভৃতির জ্ঞানের অভাবই।

প্রশ্ন—আমার মূল প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও প[illegible] নাই। বৈষ্ণবেরা অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন না কেন?

উত্তর—বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবভিন্ন জন কর্ত্তৃক অ[illegible] শিব সূর্য্যাদি এমন কি শ্রীবিষ্ণুরও প্রসাদ গ্রহণ করিতে [illegible]হা বস্তুতঃ দেবতাবিদ্বেষ অথবা সেই সেই দেবোপাসকের বিদ্বেষ বশতঃ নহে, বা অন্য দেবের প্রতি হেয় বুদ্ধিতেও নহে। তবে যদি কোন অজ্ঞ বৈষ্ণবাভিমানী উদ্ধত ব্যক্তির আচরণে ঐরূপ বিদ্বেষভাব বা হেয় বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেটি তাহার গুরুতর অপরাধ। কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির আচরণে তাহা সম্ভব

হয় না। তাদৃশ প্রসাদ গ্রহণে কুণ্ঠার কারণ শুনুন। বৈষ্ণবজনেরা শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিতবিগ্রহ বিষ্ণুর উপাসনা করেন। তাঁহাদের ভাব এবং উপাসনা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। অন্য দেবোপাসকগণ তাঁহাদের স্বভাব অনুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। উপাসকের মানসিক ভাব এবং সাধন ক্রিয়ার শক্তি তন্নিবেদিত দেবতার প্রসাদীয় বস্তুতে সংক্রামিত হয়; সাধকের সাধনানুযায়ী সেই সেই দেবতারও ভাবশক্তি ঐ দেবভোগ্য বস্তুতে আহিত হয়। ঐ প্রসাদ ঐ দেবোপাসকের মনঃপ্রাণের উন্নতিবিধায়ক ভোগ্য হইলেও ঐ ভাব এবং শক্তি যাঁহাদের সাধন পথে মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয়াদির শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিরোধী তাঁহারা সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। বৈষ্ণবেরা যে শক্তি শিব সূর্য্যাদির অর্চ্চনা করেন তাহা সাধারণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী শাক্ত শৈব সৌর প্রভৃতি উপাসকের অর্চ্চনা হইতে অনেক স্বতন্ত্র, এবং বৈষ্ণবগণ ঐ সকল শ্রীভগবৎ শক্তি অংশ বিভূতি প্রভৃতিকে যে ভাবে যে ধ্যানে যে মন্ত্রে যে শক্তিতে এবং যে ফলের জন্য যে তত্ত্বজ্ঞানে আরাধনা করেন, বৈষ্ণবেতর সাধক সকলের ভাব ধ্যান মন্ত্র শক্তি ফল এবং তত্ত্বজ্ঞান তাহার বহু অংশে গুরুতর বিরোধী। মনে করুন, একজন সাধক রজস্তমঃস্বভাবে বিভোর হইয়া সেই প্রকার দ্রব্য মদ্য মাংসাদি দ্বারা "হুং ফট্ দহ দহ ছিন্ধি ছিন্ধি মারয় মারয়" ইত্যাদি আভিচারিক মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবৎ শক্তির রজস্তমোঘোরা চামুণ্ডা কালিকাদি মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন। তাদৃশ মন্ত্রাদি এবং দেবভাব দেবশক্তি এবং সাধকের ভাব এবং সেই দ্রব্যাদি একজন নিরন্তর বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী নিষ্কাম ভাগবতী ভক্তির দ্বারা ভাবিতাত্মা শ্রীবিষ্ণু-আরাধক বৈ[illegible] সাধনোচিত মনঃপ্রাণের কত বিরোধী। স্বীয় উপাসনার বিরো[illegible] তাহা অন্যের উপাসনার অনুকূল হইলেও অধিকারী বিশেষে [illegible] করুন, উপাসনা, উপাস্য এবং উপাসকের ভেদের কারণ অধিকারী বিশেষের যোগ্যতাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্বে স্বে হধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (১১শ স্কঃ শ্রীমদ্ ভাগবত), স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ (শ্রীগীতা) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণও অনুসন্ধান করুন।

প্রশ্ন—কথাটি ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে, আর একটু বিশদভাবে বলুন।

উত্তর—সাধনরাজ্যে খুব রহস্যপূর্ণ কথা বিশেষভাবে মন দিয়া না শুনিলে এবং বারংবার না শুনিলে সহজে ধারণা করা যাইবে না। সাধকের ভাবানুযায়ী দেবতার ভাবও প্রকাশ পায় এবং দেবতার ভাবপ্রকাশেও সাধকের ভাব উজ্জ্বল হয়। ইহাই সাধ্যসাধন সম্বন্ধ। সাধকের নিজ আরাধ্যদেবতার প্রসন্নতালাভের নিমিত্ত সাধকের ভাবানুযায়ী সাধনোচিত সেই সেই ভাবানুকূল উপাস্যদেবতার যে যে বস্তু প্রিয় তাহাই সেই সেই দেবতার প্রীত্যুদ্দেশে অর্পণ করা হয়। ঐ বস্তুতে সাধকের সাধনানুকূল সাধনভাবের এক জাতীয় শক্তি সংক্রমিত হইয়াই সেই বস্তুতে দেবতার প্রীতি আকর্ষণ করে এবং দেবতাও প্রসন্ন হইয়া তাদৃশ ভাবময় দৃষ্টিতে ঐ বস্তুকে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রসন্নতাই ঐ বস্তুর উপর ন্যস্ত করেন। ধ্যান-মন্ত্রাদির সাহায্যে এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়। ইহাকেই বলে ভোগ দেওয়া। সুতরাং দেবতাকে নিবেদিত বস্তুটি সাধকের ভাবশক্তি এবং দেবতার প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ প্রসন্নতা ভরা বস্তুটিই তখন প্রসাদ নাম ধারণ করে—"প্রসাদস্তু প্রসন্নতা।" দেবতার প্রসাদের আধার বস্তুটি প্রসাদময় হওয়ায় অভিন্নোপচারে ঐ বস্তুটিকেও প্রসাদ বলা যায়—বাহুল্যেন ব্যপদেশঃ। এখন দেখুন চামুণ্ডা কালিকা আদি ক্রোধাদি জিঘাংসাভাবাভিব্যঞ্জিকা রজস্তমঃপ্রধানা মূর্ত্তি উপাস্যা, মদ্য মাংসাদি চঞ্চলবলবীর্য্যাদিবর্দ্ধক রজস্তমোভাবপোষক বস্তু, মন্ত্রাদি ধ্যানাদি উপাসনা অভিচারভাবদ্যোতক, সাধকও তত্তৎ প্রিয় স্বভাব সম্পন্ন, এরূপ স্থলে প্রসাদটিও ঐ ঐ ভাব এবং শক্তির প্রসন্নতাতেই পরিপূর্ণ। সুতরাং উহা বৈষ্ণবের গ্রহণ যোগ্য হয় না।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবদিগকে ত ঐ সকল মদ্য মাংসাদি প্রসাদ দেওয়া হয় না। অন্য নিরামিষ প্রসাদ ত তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন। সাত্ত্বিক ভাবেও ত অন্য দেবতার অর্চ্চনা হয়।

উত্তর—তা হয় না। ভাবের ঘরে চুরি খাটে না। ছাগের পরিবর্ত্তে কুমড়ো করিয়া সাত্ত্বিক করিলে ত সাত্ত্বিক হয় না, খড়্গ পূজায় কিন্তু "দহ দহ মারয় মারয়" বলিতেই হয় এবং ধ্যানমন্ত্র প্রভৃতিও সেই রাজসিক তামসিক ভাবে পরিপূর্ণ,

কেবল বস্তু অংশ সাত্ত্বিক হইলেও অন্যান্য অংশে প্রবল রজস্তমোভাব এবং শক্তি থাকায় অন্য উপাসকগণের অন্যান্য উপাসনা প্রায়ই সাত্ত্বিকী হয় না।

প্রশ্ন—আচ্ছা, যদি অন্য উপাসক বিষ্ণু পূজা করেন সেই বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণেও বৈষ্ণবরা কুণ্ঠিত হয়েন কেন ?

উত্তর—অন্য উপাসকের বিষ্ণুপূজাও বৈষ্ণব ভাবোচিত হয় না। শাস্ত্রের শাসনে মাত্র নিরামিষাদি ভোগ দিলেও তাহাদের নিজ স্বভাব স্থায়িভাবে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় নয়, কেবলমাত্র সাময়িক বিষ্ণুপূজাতে সেই প্রসাদাদিতে বিষ্ণুভাবশক্তির বিশেষ কোনও প্রসন্নতা আছে বলিয়া বৈষ্ণবেরা মনে করেন না। এই কারণেই তাঁহারা তাদৃশ বিষ্ণুপ্রসাদ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হন

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের সার মর্ম্ম এই যে যাঁহারা নিজ মনঃপ্রাণাদিকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে উদ্ভাসিত করিয়া শমদমাদি সংযমের প্রতি এবং যথাযোগ্য বৈরাগ্য তপস্যাদির প্রতি নিরন্তর লক্ষ্য রাখিয়া দাম্ভিকতা বর্জ্জন পূর্ব্বক বিনয় নম্রতার সহিত নিজের সাত্ত্বিকতার ক্ষতি হয় বলিয়াই তাদৃশ প্রসাদ গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের কোন অপরাধ হয় না। তবে যাহারা কেবল বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র বৈষ্ণবাভিমানী, শমদমাদি সংযম যথাযোগ্য ত্যাগ ব্রত নিয়মাদিতে নিষ্ঠারহিত, মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু মৎস্যাহারী, যথেচ্ছবিহারী, তাহারা যদি ঐ প্রকার নৈষ্ঠিক ব্রতের নাম করিয়া তাদৃশ দেব নির্ম্মাল্যাদি প্রসাদ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহা সুধীজনের দৃষ্টিতে রুতর ঔদ্ধত্য বলিয়াই পরিগণিত এবং তাহা অপরাধই বটে। আবার যদি কেহ মালাতিলকের প্রচুর আড়ম্বর করে, নিরামিষ আহার করে, তৈলাভ্যঙ্গাদি বর্জ্জন করে, বাহিরে বৈরাগীর মত শুষ্ক রুক্ষ বেশ ধারণ করে, অথচ কৃষ্ণের সংসার বলিয়া নানা প্রকার ছলনা বঞ্চনা নিষ্ঠুরতাদির ব্যবহার দ্বারা অর্থাদি উপার্জ্জনে রত, বিষয় কর্ম্মাদিতে গুরুতর ক্রোধ দ্বেষ হিংসাদি রজস্তমঃস্বভাব সম্পন্ন, পশু পক্ষী হিংসা করে না, কিন্তু লাভ যশঃ অর্থাদি নিজ স্বার্থের জন্য লোকের প্রতি বিদ্বেষ হিংসা বহ্নি জ্বালাইয়া সজ্জন সমুদয়ের হৃদয়কেও ছারখার করিতে দক্ষ, দয়াদাক্ষিণ্যাদি শূন্য ; কেবল বড় বড় মালা তিলক ধারণ ও নিরামিষ ভোজনরূপ বৈষ্ণবতার দম্ভে "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই পাষণ্ড পাষণ্ড" ইত্যাদি

রবে দিক্ মাতাইয়া "শাক্তের বাড়ী হরির লুট্, কি সর্ব্বনাশ! জগতে আর বৈষ্ণবতা থাকিল না" বলিয়া নাসা কুঞ্চন মুখ বিকৃতি করিয়া হাতের হরিনামের মালার ঝুলিটি ঝাঁকরাইয়া এই প্রকার দেবহেলেন পূর্ব্বক গুরুতর ঔদ্ধত্য সহকারে উপযুক্ত সদাচারের সহিতে অর্চ্চিত অন্য দেবতার নিরামিষ প্রসাদও যদি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুধী সমাজের দৃষ্টিতেও ভণ্ড নাম পাইবার যোগ্যতা এবং দেবতার নিকটে অপরাধই উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহা আমার ব্যক্তিগত অনুভব।

আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাস প্রকৃত ভগবৎপরায়ণ বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারে, নিয়ম নিষ্ঠায়, বিনয় নম্রতার সহিত ভগবদৈকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া বৈষ্ণবের যথাযোগ্য পরম সাত্ত্বিক ব্রত নিয়মের বিঘাতক অন্য জনের অর্চ্চিত অন্য দেবতার প্রসাদ ত্যাগটি বিজ্ঞ অন্যোপাসকগণও অনুমোদন করিবেন। যেমন তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারস্থ যতিব্রতপরায়ণা বিধবা-দিগের সাত্ত্বিক নিয়মের অনুবর্ত্তিতা অনুমোদন করেন, তেমন বৈষ্ণবদিগেরও সাত্ত্বিক নিয়মের অনুবর্ত্তিতা তাঁহারা অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর পরস্পর পরস্পরের সাধন ভজনের প্রতি সহানুভূতি দৃষ্টি সম্পন্ন হইলে বিবাদ হইতে পারে না, কেবল নিজ নিজ ব্যক্তিগত আচারের হঠতা করিতে গেলেই বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্ট হইয়া সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলে। এতাদৃশ পরস্পর আচার বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মার্গাবলম্বী সাধকগণ যদি "ক্ষমাগুণ" সম্পন্ন হয়েন তাহা হইলেও পরস্পরের মধ্যে আচার লইয়া বিরোধ হইতে পারে না; মনে রাখা উচিৎ যে সকল সম্প্রদায়ই এক শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবেরা নিজে যে অন্য দেবতার অর্চ্চনা করেন সেই প্রসাদাদি গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চনা ভিন্ন প্রণালীর কি? তাহার তাৎপর্য্যই বা কি?

উত্তর—বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণ সাধারণ স্মার্ত্তাদির ন্যায় মায়িক উপাসনা করেন না। সাধারণ স্মার্ত্তগণের উপাসনা মায়িক বলিয়াছি বলিয়া "গোঁড়া গোঁড়া" "সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী" ইত্যাদি বলিয়া নাসাকুঞ্চনেই উদারতার বন্যায় ভাসিবেন না। একটু স্থির ধীর হইয়া শ্রবণ করুন

"উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা" এই কথাটির তাৎপর্য্য অতি গভীর। "পরব্রহ্ম" পরতত্ত্বটি এক অখণ্ডতত্ত্ব হইলেও তাঁহার আবির্ভাব বা প্রকটন উপাসকের উপাসনার ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। "সত্ত্ব রজঃ তমঃ" এই তিনটি ভাবের মধ্যে যে ভাবটি উপাসনার অঙ্গসমূহের মধ্যে প্রবল হইতে থাকে, উপাসকের হৃদয়ে স্থিত সেই ভাবের সহিত তাহা মিলিত হইয়া উপাস্যের আবির্ভাবের যোগ্য একটি ভাবশক্তির সৃষ্টি করে। সেই ভাবশক্তিই শ্রীভগবত্তত্ত্বটিকে উপাসকের নিকট আবির্ভাব করায়। অতএব দেখা যাইতেছে ঐ ভাবশক্তিই সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিনপ্রকার ভেদে একই পরব্রহ্ম পদার্থকে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক উপরাগযুক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য লীলাদি বিশিষ্ট করিয়া উপাসকের নিকটেই আবির্ভাব করায়। **বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশুদ্ধভক্তিমার্গে বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনাটি কিন্তু সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক নহে। উহা গুণাতীত চিদুপাসনা, উহা তুরীয় শক্তির কার্য্য।** সাধারণ স্মার্ত্তক্রিয়াবিহিত দেবদেবীর যাহা উপাসনা তাহা গুণাতীতা ত নহেই, এমন কি সাত্ত্বিকী উপাসনাও বলা যায় না। উহা রজস্তমোবহুলা উপাসনা, কোথাও রজস্তমোভাবের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও সাত্ত্বিকপ্রায়া উপাসনা মাত্র।

প্রশ্ন—পরব্রহ্ম ত একই অখণ্ড অদ্বিতীয় তত্ত্ব। উপাসনামার্গের ভেদ হউক, যাহার যেমন যোগ্যতা সে সেরূপই উপাসনা করুক, উপাস্য ব্রহ্ম ত একই; পথ ভিন্ন ভিন্ন হউক, সকলেই ত একস্থানেই পৌঁছিবে? সকলের প্রাপ্য ত একই ব্রহ্ম?

উত্তর—ইহা ত সাধারণ কথা, সর্ব্বত্র উপাস্যরূপে এক ব্রহ্মেরই আবির্ভাব ইহা কোন্ আর্য্যধর্ম্মানুযায়ী সাধক ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? কিন্তু অনন্তাবির্ভাবময় ব্রহ্ম ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ নন যে ঘটপটের ন্যায় যে ভাবে ধরুন না কেন এক আকারেই সকলের নিকট প্রকাশ পাইবেন। ব্রহ্মে যে অনন্তরূপ অনন্তগুণ অনন্তস্বরূপ বিদ্যমান, তাঁহার এই আনন্ত্য কিসের জন্য? সকল উপাসকই যদি একই স্বরূপে একই রূপে

একই গুণে একই ক্রিয়ায় বিশিষ্ট একই ব্রহ্মকে পাইবে তবে আর ব্রহ্মের অনন্ততা কি ? বস্তুতঃ তাহা নহে ; একই অখণ্ডানন্তানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপে রূপে গুণে অনন্ত উপাসকের উপাসনার তারতম্যানুসারেই প্রাপ্য হন। একই অখণ্ডজ্ঞানানন্দ পরতত্ত্ব শক্তিশিবগণেশাদি উপাস্য মূর্ত্তি-সমূহে শুদ্ধ বিশেষ্যরূপে একই পরব্রহ্ম ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রূপগুণলীলাকার্য্যাদি বিশেষণের বৈশিষ্ট্য ভেদে বিশিষ্টাংশে পরস্পরে ভিন্নই। অনন্ত বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রাপ্তি সকল সাধকের কখনই একপ্রকার নহে। প্রকার ভেদেই প্রকারীর ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

ব্রহ্ম প্রাপ্তিটি কি তাহাও বিচার করা উচিত,—ঘটিবাটির মত ব্রহ্মকে পাওয়া নয়, "অন্তর্ব্বহিরনুভবময় সাক্ষাৎকারই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।" ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ বলিতে হাঁটিয়া (বা গাড়ী ঘোড়ায়) যাওয়ার পথ নহে যে সেই দশদিকের দশ পথে হাঁটিয়া যাইয়া ব্রহ্মের বাড়ীতে আমরা ভোজ ব্যাপারে যোগ দিলাম। পথ বলিতে সাধনপথ, যে পথে অনুভবময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নিহিত আছে তাহাই সাধনপথ। অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের অনন্ত সাধনপথে অনন্ত যোগ্যতা নিহিত আছে ; যাহার যেমন কর্ম্ম স্বভাব গুণানুসারে অধিকার, তিনি সেই অধিকারানুসারে সাধনপথে ব্রহ্মানুভবের যোগ্যতা সাধনের তারতম্যানুসারেই অর্জ্জন করিয়া অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবটি নিজের সাধনশক্তি অনুসারেই লাভ করিবেন। খুব ভাল করিয়া বুঝা চাই। এই সাধনপথটি কি ? ইহা কি মানুষের কল্পিত, অথবা ব্রহ্মেরই কল্পিত ? মানুষের কল্পিত হইলে অনিত্য কল্পনামাত্রই হইবে, সত্য ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইবে না ; মায়াবদ্ধ অজ্ঞানগ্রস্ত জীবের মায়িক কল্পনা অন্ধকারটি অনন্তস্বপ্রকাশকিরণমালী পরব্রহ্মে স্পৃষ্ট হইতে পারে না। বস্তুতঃ সাধনপথটি মনুষ্যকল্পিত নহে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বীয়াভিব্যক্তি শক্তির অমৃতময়ী ধারার নামই ভগবৎসাধনপথ। ভগবত্তত্ত্ব-প্রকাশিকা ভগবৎশক্তিই সাধুগুরুর কৃপার দ্বার দিয়া আগমন পূর্ব্বক ভগবৎ জ্ঞান ভক্তির সাধনমার্গরূপ ধারণ করেন। এই শক্তির আবির্ভাবতারতম্যেই সাধনের তারতম্য হয়। আবার সাধনের তারতম্যানুসারে একই পরতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্য হয়, আবার

পরতত্ত্বের আবির্ভাবকালেও সাধকের সাধনশক্তির তারতম্যানুসারেই আনন্দাস্বাদনেরও তারতম্য হয়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজোগুণে ব্রহ্মা, তমোগুণে রুদ্র, একই পরব্রহ্মই ত ত্রিবিধ, তবে ভেদ কেন ?

উত্তর—পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি তাহাতেই আপনার প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে। পূর্ব্বের কথাগুলি ভাল করিয়া অনুশীলন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরেও কিছু বলিতেছি। সত্ত্বগুণটি প্রকাশক এবং উদাসীন, স্বয়ং মহাপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে সেই সত্ত্বের উপরাগ সম্ভব হয় না। কিন্তু রজোগুণের ধর্ম্ম বিক্ষেপ এবং তমোগুণের ধর্ম্ম আবরণ, এই বিক্ষেপের উপকারিত্ব এবং আবরণের অপকারিত্ব ধর্ম্ম বলে সচ্চিদানন্দের আনন্দাংশে রজঃ তমঃ উপরাগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দকে বিক্ষিপ্ত বা আবৃত করিয়া তুলে। সত্ত্বগুণটির উপরাগ শক্তি না থাকায় পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপটি সত্ত্বগুণের সামীপ্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও গুণাতীতই থাকেন, গুণানুগত হইয়া প্রকট হয়েন না। সুতরাং বিষ্ণু স্বরূপটি সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা হইলেও নির্গুণ তুরীয় স্বরূপেই আবির্ভূত হয়েন। কিন্তু রজোগুণ বা তমোগুণের অধিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আবির্ভাবে রজস্তমোগুণের উপরাগ থাকায় বিষ্ণুতুল্য তুরীয়াবির্ভাব হয় না। ইহাই বিষ্ণু উপাসনার অসাধারণতা। কথাগুলি ভাল করিয়া একটু ভাবুন।

প্রশ্ন—আপনি একস্থলে বলিয়াছেন শক্তিশিবাদি ভগবানের পৃথক্ পৃথক্ আবির্ভাবসমূহ একই ভগবৎস্বরূপশক্তির দ্বারায়ই সম্পন্ন হয়। যদি একই স্বরূপশক্তির কার্য্য সমস্ত তাহা হইলে আবার স্মার্ত্তদিগের উপাসনা মায়িক কেমন করিয়া হয় ?

উত্তর—প্রথমতঃ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দ্বারায় এই সকল শক্তিশিবাদি মূর্ত্তি প্রকটিত হইলেও শুদ্ধস্বরূপতত্ত্বের কার্য্য শুদ্ধভগবজ্জ্ঞান শুদ্ধভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যখন রজস্তমোভাবের দ্বার দিয়া জগতের মায়িক সম্বন্ধে উপাসকের উপাস্য হইয়া প্রকট হন তখন ঐ একই শক্তি-শিবাদি মায়িক রূপই প্রকটন করেন এবং উপাসকের মায়িক ধর্ম্ম অর্থ কামাদি বাসনা পূর্ণ করেন। ইহাই মায়িক উপাসনা।

প্রশ্ন—তাহা হইলে বৈষ্ণবদিগের শক্তিশিবাদি উপাসনা কি প্রকার একটু বিস্তার করিয়া বলুন।

উত্তর—এ বিষয়ে বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে প্রধানভাবে দুইটি পথ আছে। একটি পথ এই যে শ্রীবিষ্ণু উপাসনা পূর্ব্বক পশ্চাতে শিব শক্তি সূর্য্য প্রভৃতিকেই পরম ভগবান্ বিষ্ণুরই এক এক অঙ্গ মনে করিয়া অর্চ্চনাদি করেন, এবং তাহা শুদ্ধ স্বরূপশক্তিময় শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনার অঙ্গার্চ্চন দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই তাৎপর্য্য। ঐ প্রকার অর্চ্চনাদিতে ভগবজ্জ্ঞান বা শুদ্ধভগবদ্‌ভক্তির কোনও হানি হয় না, ববং শ্রীভগবদ্ভক্তির পুষ্টিই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পথটি এই যে বৈকুণ্ঠাদিভগবল্লোকে ঐ শক্তিশিবাদি ভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাসমূর্ত্তি সকল নিত্যই আছেন, ঐ সকল মূর্ত্তির অর্চ্চনাদি সপরিকর ভগবদুপাসনার অন্তর্গতই। এই বৈকুণ্ঠাদিতে যে সকল শক্তি শিবাদি বিগ্রহ নিত্যই বিরাজমান আছেন, তাঁহারা চিদানন্দশক্তির মূর্ত্তিই, আর তাঁহাদের ছায়ারূপা অংশমূর্ত্তিই এই প্রাকৃতজগতে ধর্ম্মার্থকামদায়ী শক্তিশিবগণেশাদি। বৈষ্ণবদিগের নিত্য দুর্গাপূজার ব্যবস্থা শুনুন—"সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রসাধক তাঁহারা মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তি দুর্গাকে শক্তি শক্তিমানে অভিন্নবোধে অর্চ্চনা করেন। "যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ", "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতা" ইত্যাদি ; "ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরস-বল্লভা॥" ইত্যাদি। বৈকুণ্ঠস্থ ঈশান কোণাবরণ রূপে যে ভগবান্ সদাশিব আছেন সেই সদাশিব বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ভগবদংশরূপ মহাবিষ্ণুর অভিন্নরূপেই পূজিত হয়েন। এইরূপে গুণাতীত শুদ্ধভক্তি ভাবে শুদ্ধ ভগবৎসন্তোষরূপ শুদ্ধ প্রীতিতাৎপর্য্যে তদুচিত ধ্যান ধারণা মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুপূজোপহারাদি দ্বারা বৈষ্ণবগণ যে দুর্গাশিবাদির অর্চ্চন করেন, সেই প্রসাদাদিও তাঁহারা গ্রহণ করেন।

আবার কোনও কোনও বৈষ্ণবগণের মধ্যে সেই সেই শক্তিশিবাদি দেবমূর্ত্তিতে অন্তর্যামী শ্রীবিষ্ণুরই অর্চ্চনা করার পদ্ধতি দেখা যায়।

সাধনে 'সাবধান' শতক

১। **সত্য কথা বলিবে এবং সত্য ব্যবহার করিবে।** যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থলালসায় সত্যের অপলাপ করে, সাধনমার্গে তাহারা আঁধারেই থাকে। সত্যই সাধনপথের আলোক।

২। **সত্য কথা বলাও ভাল নহে, সত্য কথার ফলে যদি অপরের গুরুতর ক্ষতি হয়।**

৩। **মিথ্যা কথা বলিও না, মিথ্যা ব্যবহার করিও না।** বাহিরে সরলতা দেখাইয়া অন্তরে কুটিলতা রাখিও না। সাধনপথে মিথ্যা এবং কপটতা গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি করে।

৪। **মিথ্যা কথা বলাও ভাল, যদি মিথ্যা বলায় অপরের প্রকৃত উপকার হয়।**

৫। **পরের দোষ দেখিও না, দেখিলেও গ্রহণ করিও না।** মনের উপর দোষের ছাপ পড়িয়া যাইবে। ক্রমশঃ ইষ্টচিন্তা জপ অর্চ্চনাদি সাধনকালে ঐ দোষের ছবিগুলি তোমার মানসপটে উদিত হইয়া তোমার সাধনের বিঘ্ন জন্মাইবে।

৬। **পরের দোষ দেখা ভাল, গ্রহণ করাও ভাল, যদি নিজের কিছু উপকার করিতে পার।** অর্থাৎ ঐ দোষগুলি দেখিয়া দুষ্টকার্য্যের পরিণামফল সর্ব্বনাশকর এই বিচার করিয়া নিজে দুষ্টকার্য্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য পরের দোষ দেখ; কিন্তু তাহাকে দোষী জ্ঞানে ব্যক্তিগত হেয় বুদ্ধিতে তাহার দোষ দেখিও না।

৭। **পরের দোষ দেখা বড় পাপ মনে করিও।** পরের দোষ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিও। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দোষকারী ব্যক্তির মঙ্গল প্রার্থনা করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

৮। **পরের দোষ কীর্ত্তন করিও না,** উহা নিন্দারূপ মহাপাপ।

৯। **অপরের কুৎসা গাইও না,** বরং অপরের নিকট নিজের কুৎসা গান করিও, তাহাতে আত্মশোধন হইবে।

১০। **পরের দোষও বলিও,** তাহার ব্যথায় প্রকৃত ব্যথিত হইয়া তাহার হিতের জন্য বলিও, ব্যথার ভান দেখাইয়া হিতের নাম করিয়া পরনিন্দাকে মুখরোচক করিও না।

১১। **কাহারও প্রতি হিংসা করিও না।** অপরকে পীড়ন করার নামই হিংসা। হিংসা থাকিলে কোন ধর্ম্ম হয় না।

১২। **অপরকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া নিজেকে সুখী করিতে চেষ্টা করিও না।** নিজে কোন না কোন দিন তদপেক্ষা অধিক বিপদে পড়িবে। পরের দুঃখে যাহাদের দুঃখ হয় না সাধনমার্গ তাহাদের সুদূর।

১৩। **প্রকৃত বিনয়ী হইও,** কিন্তু খোষামোদ তোষামোদ শিখিও না।

১৪। **ক্ষমাশীল হইও।** যাহারা অপরের অন্যায়কে ক্ষমা করিতে পারে না, তাহাদের নিজের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাওয়া ঈশ্বরকে উপহাস করা মাত্র।

১৫। **প্রকৃত ক্ষমা শিখিও,** ক্ষমার নামে অন্যায় কর্ম্মের প্রশ্রয় দিও না।

১৬। **সজ্জনকে আদর করিও,** অসজ্জনকেও ব্যক্তিগত ভাবে ঘৃণা করিও না।

১৭। **"আমি মানুষ, মানুষই হইব",** ইহা সতত স্মরণ রাখিও।

১৮। **ভাল হইও,** ব্যবহারে বা সাধনমার্গে ফাঁকি দিয়া লোকের নিকট ভাল নাম কিনিও না, নিজের কাছে নিজেই খাঁটি ভাল হইতে চেষ্টা করিও।

১৯। **কাহাকেও নীচে টানিয়া আনিও না,** অপরকে উঁচুতে রাখিতে চেষ্টা করিও, অপরের প্রতি উচ্চভাব পোষণ করিও।

২০। **নিজের মন কদাচিৎ অসাধুপথে অগ্রসর হইলেও অপরকে অসাধুপথে টানিয়া আনিও না,** নিজে যতটা ভাল হইতে পার না পার, পরের মন্দ করিও না।

২১। **নিজের বাহ্য অন্তর পবিত্র রাখিও,** কেবল ছুৎমার্গী হইও না। অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া কোলে টানিয়া লইও, অস্পৃশ্য বলিয়া কেবল ঘৃণা করিও না।

২২। **দুষ্ট মন কিঞ্চিৎ শিষ্ট হইলেও বিশ্বাস করিও না।**

২৩। **নিজেকে বিশ্বাস করিও ;** যাহারা নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া স্থির হইয়া সাধন করে তাহাদেরই সাধনটি সিদ্ধ হয়। কাল কর্ম্ম (অদৃষ্ট) ঈশ্বরের বিধান মনে করিয়া রোগ শোক মান যশ প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাতে স্থির ধীর থাকার নামই নিজেকে বিশ্বাস করা। যাহারা যত হা হুতাশ করে তাহারাই তত বেশী দুঃখ পায়। কাল কর্ম্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।

২৪। **নিজের দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করিও না।** ঈশ্বরের বিধান ভুলিয়া কেবল দেহেন্দ্রিয়াদির কৃতির প্রতি বিশ্বাস করাই অন্ধ বিশ্বাস।

২৫। **স্বাধীনচেতা হইও,** কিন্তু উদ্ধত, অহঙ্কারী, যথেচ্ছাচারী হইও না ; লক্ষ্য রাখিও স্বাধীনতার নামে যেন কঠোরতা প্রকাশ না পায়।

২৬। **নিজে সাধু হইয়া অপর দোষী ব্যক্তিকেও সাধু দেখিতে চেষ্টা করিবে।**

২৭। **হরিবোলা সংসার করিও**, হরিভোলা সংসার করিও না। হরিকে ভুলিয়ে দেয় যে সংসার তাহা ত্যাগ করিও, সর্ব্বদা প্রাণে হরিকে বোলায় যে সংসার তাহাই করিও।

২৮। **মনে রাখিও ভগবান্ আমাদিগকে যেমন সংসার দিয়াছেন তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মধ্য দিয়া নিজকেও দিয়াছেন।** ভগবান্‌কে ঠেলিয়া ফেলিয়া সংসারকে সার মনে করিয়া বাছিয়া লইও না, ভগবান্‌কেই সার মনে করিয়া লইতে সাবধান থাকিও। ভগবানের দেওয়া সংসার, সংসার পাইয়া ভগবান্‌কে ভুলিও না।

২৯। **রোগ পুষিয়া রাখিও না।** অনেক রোগী আছে, তাহারা রোগে দুঃখ পাইয়াও রোগ পুষিয়া রাখিতে চায়। যেমন শিশু বালকদের পক্ক স্ফোটক দিন রাত টাটাইতেছে, তাহারা উহু উহু করিয়া দিন রাত কাৎরাইতেছে, কিন্তু টিপ দিয়া গলিয়ে দিতে চায় না, কাহাকেও হাত দিতে দেয় না, দুঃখ পাইতেছে, তবুও রোগ ভাল করিতে দেয় না। হরিভোলা সংসাররোগীও দুঃখ তাপ বেশ পায়, দিন রাত হায় হায় করে, তবুও সাধুগুরুর উপদেশ লয় না, হরিপদে শরণ লইয়া সংসারের উপর একটু টিপ দিয়া তাহার গলদ বাহির করিতে চায় না।

৩০। **গৃহে থাক বা বৈরাগী হও, সাধনের মাপকাঠি রাখিও।** গৃহে থাকিয়া শুদ্ধ বৈরাগীর মাপকাঠিতে সাধন মাপিতে যাইও না, বৈরাগী হইয়া গৃহীর মাপকাঠি লইও না।

৩১। **বৈরাগ্য শিখিও, কেবল বৈরাগীর সাজ লইও না।** সাংসারিক সর্ব্ব অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া কেবল শ্রীভগবদ্ভজনে আসক্তি রাখিয়া তদ্ভিন্ন জাগতিক যাবতীয় পদার্থে অবস্তু জ্ঞানে ভালমন্দ কোন ভাবে আসক্তি না রাখার নামই বৈরাগ্য।

৩২। **নিজকে ভগবৎ দাস বলিয়া গৌরব অনুভব কর,** গর্ব্ব করিও না।

৩৩। **অন্তরে নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় কর,** বাহিরে অলস অকর্ম্মা হইও না।

৩৪। **ভজনের নামে পরের গলগ্রহ হইও না,** বরং পার ত অপরকে গলগ্রহ করিয়া ভজন করিও।

৩৫। **নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথোপযুক্ত সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্মাদি করিবে।** গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরের গলগ্রহ হইও না।

৩৬। **সাম্প্রদায়িক দল পাকাইয়া পরস্পর সাধকের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিবে না।**

৩৭। **কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি হিংসা দ্বেষ করিও না।**

৩৮। **কোনও ধর্ম্মমত বা কোনও সাধনমতের উপর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উক্তি করিও না** বা হাসি বিদ্রূপ করিও না।

৩৯। **সকল ধর্ম্মমতকে নিজের ইষ্টদেবতারই ভিন্ন ভিন্ন সাধনমত বলিয়া মনে করিবে।**

৪০। **সাধু শাস্ত্র সম্মত নিজ সাধন মতে দৃঢ় থাক,** অপরের শাস্ত্র সাধন মতে আঘাত দিও না।

৪১। **কোনও সৎমহাপুরুষের শিষ্য বলিয়া নিজের গর্ব্ব প্রকাশ করিও না,** সদ্‌গুরুর মর্য্যাদা পালন করিও।

৪২। **সৎ মহাপুরুষ যাহাকে কৃপা করেন বা ভালবাসেন তাহার প্রতিকূলতা আচরণ করিও না**; উহা প্রকারান্তরে সেই সৎমহাপুরুষের প্রতিকূলতা করাই হয়। সাধুসঙ্গ করিও; "সাধু ঘেঁসা" "সব জান্তা," "হাম বড়া" দেখাইতেই সাধুর সঙ্গ নহে। মনে রাখিও, সাধু চরিত্র, সাধু ব্যবহার, সাধুভাষনাদি সাধুশিক্ষা লাভের জন্যই, সর্ব্বোপরি সর্ব্বসদ্‌গুণগণসেবিতচরণা ভগবচ্চরণাবলম্বনা শ্রীভক্তি লাভের জন্যই সাধুসঙ্গ।

৪৩। **সাধু মহাত্মাদিগকে নিজ গুরুর প্রতিনিধিই মনে করিয়া গুরুবৎ ভক্তি করিও।**

৪৪। **সাধুগুরুই ভগবানের আলোক।** জীব এবং ভগবানের মধ্যে যে গাঢ় আঁধার পড়িয়া আছে, সাধু গুরুর আলোক পড়িলে ঐ আঁধার আর থাকে না।

৪৫। **সাধু গুরুই সাধন পথের চৌকিদার।** কাম ক্রোধাদি দুর্ব্বাসনা দস্যু বাট্‌পাড়্‌ যখন সাধনপথে হানা দেয় তখন সাধু গুরুর নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপার শরণাপন্ন হইবে, তাঁহাদিগকে ধ্যান করিবে, তাঁহাদের চরণোদ্দেশে নিজের সাধন পথের বিঘ্ন নিবেদন করিবে।

৪৬। **সাধু গুরু দর্শন মাত্রেই কায়িক বাচিক মানসিক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।** কায়িক প্রণাম—ভূমিষ্ঠ প্রণাম; বাচিক প্রণাম—"জয় জয়" শব্দ, "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ বা মহিমাদি কীর্ত্তন; মানসিক প্রণাম—শ্রদ্ধা-প্রীতি-আনন্দযুক্ত মনে প্রণাম।

৪৭। **সাধু গুরু দর্শন করিতে যাইতে হইলে রিক্ত হস্তে দর্শনে না যাইয়া কিছু উপায়ন লইয়া যাইবে।** অভাবে দুটি পুষ্প হস্তেও যাইবে।

৪৮। **সাধু গুরু সমীপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না,** বা অন্য নানাবিধ বাচালতাও করিবে না; ভগবদালাপ যাহাতে হয় এমন প্রশ্নাদি করিবে, অথবা তাঁহাদের কোন সেবাকার্য্য করিবে। বিষয় কথা বা অন্য চর্চ্চা করিবে না, এ বিষয়ে খুব সাবধান হইবে।

৪৯। **সাধু গুরু সমীপে অপর কর্ত্তৃক শাস্ত্রীয় প্রশ্ন বা সাধনাদি প্রশ্নের উত্তর দিবে না।** নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলে, তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া উত্তর দিবে।

৫০। **সাধু গুরু সমীপে অন্য কর্ত্তৃক অন্যায় বা ন্যায়রূপে আক্রান্ত হইলেও তাহার প্রতি আক্রমণ করিবে না।**

৫১। **সাধুগুরু সমীপে কোনও ভজনের অর্থাৎ নাম মালা জপাদির আগ্রহ দেখাইয়া জপাদি করিবে না.** সাধু গুরুর সেবা কার্য্যের সময় অন্য কোনও ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টা করিবে না। যেমন "দক্ষিণ হস্তে নামের মালা জপ, আর বামহস্তে গুরুর চরণ সম্বাহন বা বীজনাদি সেবন" বা "দক্ষিণ হস্তে নামের মালা, বাম হস্তে সাধু গুরুর চরণ ধূলি গ্রহণ," ইত্যাদি ধৃষ্টতাময় ভজনের ভান দেখাইবে না। মনে মনে ভগবন্নাম জপ স্মরণাদি করিবে।

৫২। **সাধু গুরু সমীপে দৈন্য * আচরণ করিবে।** দৈন্যের কাপট্য নহে, সত্য দৈন্য করিবে, কাতরতা জানাইয়া কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে।

৫৩। **নিষ্কপট দৈন্য দেখিলে মহাপুরুষগণ কৃপার্দ্র হইয়া বাঞ্ছিত ফল দান করেন।**

৫৪। **কপট দৈন্য দেখিলে সাধু গুরু দুঃখই পান,** দৈন্য বিরোধী ঔদ্ধত্য দেখিলে উপেক্ষা করেন।

৫৫। **গয়ায় মরিয়া ভূত হইও না**; সকল দেশের ভূত গয়ায় উদ্ধার হয়, গয়ার ভূতের বড়ই বিপদ। সকল কপটতা সাধু গুরুর কৃপায় নাশ পায়। সাধুগুরুর নিকট কাপট্যে বড়ই সর্ব্বনাশ হয়।

৫৬। **ভজনে অন্তরায় শূন্য হইলেই ভজন সিদ্ধ হয়।** অপরাধই অন্তরায়; সর্ব্ববিধ অপরাধের মুলকারণ কাপট্য। কাপট্য শূন্য ভজনই আশু সিদ্ধ হয়।

৫৭। **সাধু মহাপুরুষের বা সদ্‌গুরুর আজ্ঞা কদাচিৎ ভক্তির অনুপযোগী হইলেও প্রতিপালন করিবে।** পুনঃ পুনঃ যদি ভক্তিবিরোধী আজ্ঞা করেন তবে চরণে পড়িয়া কান্দিবে, এবং কাতর প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া আজ্ঞা প্রত্যাহার করাইবে। প্রৌঢ়িবাদ করিয়া নিজের শুদ্ধভক্তি জ্ঞান গর্ব্বের ধ্বজা উড়াইয়া পাণ্ডিত্যখ্যাপক শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বক দোষ দেখাইতে যাইবে না, অথবা অন্য কোনও প্রকার ধূর্ত্ততা (চালাকি) আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। সাবধান, সাধনপথে সাধুগুরুতে বিশেষ সাবধান থাকা চাই।

৫৮। **ভগবন্নামাদি আশ্রয়কারী সাধুব্যক্তিতে শাস্ত্রবিরোধী প্রবল**

---

* শ্রীপাদ গ্রন্থকার কৃত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে "দৈন্যম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আচরণ দেখিলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না, কোন প্রকার প্রতিকূলতা আচরণ করিবে না, যথোচিত নমস্কারাদি করিবে, অতিথি হইলে সামর্থ্যানুসারে আতিথ্য করিবে, কিন্তু ভজনাদি শিক্ষার জন্য তাদৃশ সাধুর সঙ্গ করিবে না।

৫৯। **সাধু ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি হীনকুলোৎপন্ন হইলেও যথাযোগ্য সম্মান শ্রদ্ধাদি করিবে,** হীনবুদ্ধি করিবে না।

৬০। **সর্ব্বভূতে দয়া এবং সৌহৃদ ভাব হৃদয়ে সতত দৃঢ় রাখিবে,** এইটি ভজন পথের জীবনসম্বল। নিজের ভজন সুস্থির এবং নির্ব্বিঘ্ন করিতে হইলে "দয়া" "সৌহার্দ্দ্য" দৃঢ় হওয়া চাই। কাহারও প্রতি নির্দ্দয়ভাব হৃদয়ে আসা মাত্রই ভক্তিদেবী অস্থির হইয়া উঠেন। দয়াসৌহৃদহীন হৃদয়ে ঐকান্তিকী ভক্তির স্থান নাই। যিনি সর্ব্বভূতে সুহৃৎ তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ভক্ত তিনি সর্ব্বভূতে সুহৃত্তর হইবেন। যিনি ঐকান্তিক ভক্ত তিনি সর্ব্বভূতে সুহৃত্তম হন।

৬১। **ভক্তির সাধন ভগবৎ শ্রবণকীর্ত্তন অর্চ্চনাদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত জীবিকার উপায় করিবে না।** ইহাতে গুরুতর অপরাধের ফলে পাতিত্যদোষগ্রস্ত হইতে হয়।

৬২। **ভগবৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদির স্থলে সাক্ষাৎ ভগবদাবির্ভাব স্থল মনে করিয়া সর্ব্বথা মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।** সে স্থলে অন্যের সহিত তাদৃশ গ্রাম্য আলাপাদি করিবে না, হাসি বিদ্রূপ বিবাদাদি করিবে না। সেই স্থলটিকে ভজনের স্থল বলিয়া সতত গৌরব রক্ষা করিয়া পাঠ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবে। সাবধান, সামান্য স্থলের মত ব্যবহার করিলে ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির প্রকৃত ফল লাভ হইবে না।

৬৩। **ভগবৎ কথা পাঠাদি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া ইতর রসিকতা করিবে না।** ভগবৎ কথা কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদর্চ্চন মনে করিয়া সংযত হইবে, কোন প্রকার প্রাকৃত চাপল্য প্রকাশ করিবে না।

৬৪। **ভগবল্লীলারসকে সামান্য জাগতিক হেয় রসের তুল্য মূল্য করিও না,** খুব সাবধান।

৬৫। **নিজকে অধম ভাবিও না,** অর্থাৎ নিজের পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মাদি স্মরণ করিয়া নিজকে অধম মনে করিয়া সাধনে শিথিলতা আনিবে না। অবসন্ন হইয়া "সাধন করিয়া আর কি হইবে? কিছুই হইবে না" মনে করিয়া সাধন পরিত্যাগ করা, এবং কোনও সাধু মহাপুরুষ কোন প্রকার সাধনের উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইলে, তখন "আজ্ঞে আমরা বিষয়ী, আজ্ঞে আমরা সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মে রত, আজ্ঞে আমরা দুরাচার, আমাদের দ্বারা কি সাধন ভজন সম্ভব?" ইত্যাদি ভাবে নিজকে অধম দুরাচার প্রতিপন্ন করিয়া সাধু মহাত্মাদিগের সদুপদেশ হইতে সরিয়া পড়া, এইরূপ অবসাদ বা কপটতার সহিত নিজকে অধম দুরাচার মনে করা পাপ।

৬৬। **নিজকে অধম মনে করিও,** অর্থাৎ নিজের প্রকৃত অধমাবস্থা কি তাহা স্মরণ করিও, এবং সেই অধমাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ব্যাকুল আগ্রহে সাধু-গুরু-শ্রীভগবদুদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিও, "মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।" বস্তুতঃ অনাদি কাল হইতে ভগবদ্‌বিস্মৃতির ফলে মায়ার সত্ত্বরজস্তমোগুণে সৃষ্ট মায়িক এই জড় দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণে "অহং" (আমি) অভিমান পূর্ব্বক জন্মজন্মান্তর অনন্ত তাপে সন্তপ্ত জীবের ভগবদ্‌ভক্তি-শূন্য এই জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির ভাল মন্দ সকল কর্ম্মই অধম। নিজকে এই প্রকার অধম মনে করিয়া নিষ্কৃতি লাভের জন্য সাধু গুরু শ্রীভগবানের নিকট নিজের অধম অবস্থা জানাইবে।

৬৭। **নিজকে উত্তম মনে করিও না।** বিষয়ভোগে নিরত দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্ট সুখ তর্পণে অভিনিবিষ্ট থাকিয়াও "আমি কি করি? আত্মা কিছু করে না। আমি অধম কিসের?" ইত্যাদি ফাঁকা ব্রহ্মজ্ঞানের বুলি আওড়াইয়া মিথ্যা দাম্ভিকতা প্রকটন করিয়া নিজকে উত্তম মনে করিবে না। উহা গুরুতর আত্মবঞ্চনা।

৬৮। **নিজকে উত্তম মনে করিবে,** অর্থাৎ "আমি দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি, সদ্‌গুরুর স্নেহকৃপা পাইয়াছি, যাহাতে সেই কৃপার ফলস্বরূপ ভগবদ্ভজনে কৃতার্থ হইয়া সদ্‌গুরুর সৎকৃপার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় তাহাই আমি করিব; আমি শুদ্ধ চিদানন্দ আত্মস্বরূপ, ভগবদ্ভক্তিরসে অভিষিক্ত হওয়াই আমার পূর্ণতা, ভাগবতীয় মহাসদ্‌গুণে ভূষিত সচ্চিদানন্দ দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রীতিময়ী সেবা লাভ করাই আমার স্বরূপের কৃতার্থতা; ভগবৎপ্রীতিময় সেবানন্দই আমার পরম বৈভব," ইত্যাদি স্মরণ করার নামই নিজকে উত্তম মনে করা, দম্ভ প্রকাশ করা নহে।

৬৯। **সর্ব্বাবস্থাতেই ভগবৎশরণাগতিভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে।**

৭০। **আচার প্রচার দুই করিবে,** অর্থাৎ যেমন নিজে সাধুগুরূপদিষ্ট হইয়া সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তেমনই দম্ভমাৎসর্য্য বা অর্থাদি লালসাশূন্য হইয়া অপরকেও সদ্ধর্ম্মাচরণে যথোচিৎ উপদেশ দিবে।

৭১। **আগে গুরু কর, পরে গুরু হইও।** নিজের গুরুতে ঠিক থাক, নিজে গুরুর প্রকৃত অনুসেবক হও, গুরুভক্তিনৈষ্ঠিক হও, তার পর গুরু সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিলে পরে অপরের গুরু হইতে বাসনা করিও। নতুবা নিজের গুরুতে সেবা, আনুগত্য, নিষ্কপট নিষ্ঠা নাই, নিজের গুরুর নিকট নানাপ্রকার ধূর্ত্ততা—"আজ্ঞে পারি না", "আমি কি দিব?" "কি সেবা করিব?" "আমি অযোগ্য, অধম," ইত্যাদি ছলনাময় শুষ্ক দৈন্যের ধূলি ঝাড়িয়া অন্যের নিকট গুরু অভিমানে সেবা অর্থ যশ আদি গ্রহণে সিংহপ্রতাপী হইও না; হইলে, তোমার অন্তরে অন্তর্দ্রষ্টা পরমাত্মা ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন।

৭২। **সদ্ধর্ম্মের প্রচার করা গুরুরই কার্য্য করা,** ইহাও একপ্রকার গুরুসেবা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া, শ্রীগুরুরই আজ্ঞা মনে করিয়া

অপরের মঙ্গলার্থে ভক্তিধর্ম্মের উপদেশ করেন, এবং শ্রীগুরুর মহিমাই প্রকাশ করেন, সেই ভাগ্যবানেরাই শ্রীগুরুর পরমকৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হয়েন। আর যাঁহারা গুরুর মহিমা প্রকাশের ছল করিয়া উপদেশাদি দ্বারা শিষ্য অর্থ যশ আদি উপার্জ্জন করেন তাঁহারা আর শ্রীগুরু হইতে বেশী কিছু পান না। আর যাহারা গুরুর মহিমাগুণাদি গোপন করিয়া উপদেশাদির ছলে নিজকেই প্রকাশ করিতে ব্যস্ত থাকে, পরমার্থ রাজ্য হইতে তাহারা অধঃপতিত হয়; তাহাদের উক্ত উপদেশদানাদি হীন চৌরবৎ কার্য্য।

৭৩। **ভাবের বাতি (বর্ত্তিকা) বাহিরে প্রকাশ করিও না,** বাতি নিবিয়া যাইবে। হৃদয়াভ্যন্তর আলো কর।

৭৪। **ভাবের নামে 'বেভাবে' যাইও না,** অর্থাৎ যেমন সংকীর্ত্তনাদি স্থলে ভাব হইল (দশা লাগিল), আর অমনই গড়াগড়ির হিড়িকে তুলসীদলন, হাত পা ছোড়ার দাপটে তত্রত্য স্থির ধীর সাধু সজ্জনের অঙ্গে পদঘাতন, মুষ্টি প্রহরণ, লম্ফঝম্ফের বেগে মৃদঙ্গভঞ্জন, বিকট "হো" "হো" ভৈরব নাদে বালক বালিকাদিগের হৃৎকম্প উৎপাদন, গায়ক বাদকগণকে লণ্ডভণ্ড করণ ইত্যাদি চলিল, এইরূপে ভাবের দোহাই দিয়া গুরুতর অপরাধের ভার মাথায় তুলিও না।

৭৫। **ভগবানের নাম বা শ্রীগুরুর নাম করিয়া কোনও শপথ কখনও করিও না।**

৭৬। **তীর্থস্থলে নিতান্ত বিপন্ন না হইলে দান গ্রহণ করিবে না।**

৭৭। **শক্তিসামর্থ্যে বা উপযুক্ত আশ্রম অঙ্গীকার ভিন্ন ভিক্ষান্ন খাইবে না।**

৭৮। **স্বোপার্জ্জিত ধনের দশমাংশ, অভাবে বিংশতিতমাংশ সাধুগুরুর আনুকূল্যে ব্যয় করিবে।**

৭৯। **গৃহস্থ হও বা উদাসীন হও যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।**

৮০। **ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, অভাবে প্রাতঃকালে, গুরূপদিষ্ট জপ অর্চ্চনাদি সাধন কিছুটা অবশ্য করিবে।**

৮১। **জপ এবং অর্চ্চনের একটা নিয়ম রাখিয়া প্রত্যহ নিয়ম পালনে তৎপর হইবে।**

৮২। **প্রত্যহ শ্রীগীতা ভাগবতের কিয়দংশ পাঠ করিবে। অভাবে স্তবপাঠ, উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিবে। প্রত্যহ গুরু বন্দনার স্তোত্রাদি পাঠ অবশ্য করিবে।**

৮৩। **প্রাথমিক ধ্যান ধারণাদির শিক্ষা গভীর রাত্রিতে করিবে।**

৮৪। **ধ্যান শিক্ষা বা নিয়মিত জপাদি শয্যাস্থিত হইয়া করিবে**

না, বিশেষতঃ গৃহাশ্রমী সাধক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, পারিলে আচমন পূর্ব্বক ধ্যানে বসিবে।

৮৫। **রাত্রি পরিহিত বসনে জপ অর্চ্চনাদি নিয়মিত সাধন করিবে না**; ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বা প্রাতঃকালে স্নান সহ্য না হইলে রাত্রি বাসঃ পরিত্যাগ করিয়া জপাদি করিবে।

৮৬। **শয়ন ভোজনের ঘর হইতে পৃথক্ ঘরে সাধন করিবে।** সম্ভব না হইলে ঘরের একদিক বস্ত্রাদি দ্বারা ঘেরয়া করিয়া লইবে।

৮৭। **সম্ভবমত নিয়ম করিয়া প্রত্যহ মৌনাবলম্বন করিবে।** অভাবে একাদশী তিথিতে মৌনাবলম্বন করিবে। কিন্তু শ্রীগুরু সমীপে বা মহত্তম ভগবদ্ভক্ত সমীপে মৌনী হইবে না।

৮৮। **একাদশী তিথিতে উপবাস এবং বিশেষ ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।**

৮৯। **দ্বাদশীর পারণ ঠিক সময় মত করিবে।** দ্বাদশীতে দিবা নিদ্রা ত্যাগ করিবে।

৯০। **গৃহস্থাশ্রমী সাধক প্রত্যহ পিতা মাতার পাদোদক গ্রহণ করিবে।**

৯১। **সদ্গুরূপদিষ্ট হইয়া নববিধ ভক্তি যাজন করিবে।**

৯২। **ভগবন্নামরূপগুণলীলাদির শ্রবণ অধিকারানুসারে করিবে।**

৯৩। **ভগবন্নামরূপগুণলীলাদির কীর্ত্তন অধিকারানুসারে করিবে।**

৯৪। **মনের দ্বারা ভগবন্নামরূপগুণলীলাদির অনুসন্ধান করাই স্মরণ।**

৯৫। **ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন স্পর্শন পরিক্রমণ অনুব্রজন ইত্যাদি লক্ষণ পরিচর্য্যার নামই পাদসেবন।**

৯৬। **শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণময় উপাসনাটি আগম শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি বিধি প্রাপ্ত হইলেই অর্চ্চন হয়।**

৯৭। **দণ্ডবৎ প্রণাম লক্ষণ নমস্কারই বন্দন।**

৯৮। **"আমি ভগবদ্দাস" এই প্রকার অভিমান পোষণই দাস্য।**

৯৯। **ভগবৎ হিতাশংসনময় বন্ধুভাবের নাম সখ্য।**

১০০। **মনঃপ্রাণ দেহ দৈহিকাদি সমস্তের সর্ব্বতোভাবে সমর্পণের নামই আত্মনিবেদন।**

"ভক্তিময় অবতার" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের কতিপয় পরমোপদেশের প্রতি ভগবদ্ভক্তি-

সাধকদিগের সতত লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এস্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ উট্টঙ্কন করিতেছি, যথা—"সকল সাধনশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে** লইলে নাম পায় প্রেমধন॥" নিরপরাধচিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত মুখ্য ফল লাভ হয় না। ভগবৎসাধনভক্তির পরম মুখ্য ফল শ্রীভগবৎপ্রেম ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি সাধনে চিত্তের অবিদ্যা মলিনতা অপসারণ পূর্ব্বক উদয় প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমোদয়ের মহান্ বিঘ্ন অপরাধ; এই অপরাধরূপ বিঘ্ন বর্ত্তমানে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধনেও প্রেমোদয় হয় না। তাই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অপরাধের বিচার প্রবল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও অনেক সময়ে লোক দেখান বিচার মাত্র। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে "অপরাধ" ভাষা ব্যবহারের প্রচলন অত্যধিক। এমন কি অনেক স্থলে যেন বৈষ্ণবতা রক্ষার একটা বিধির মত ঐ রকম দুই চারিটি ফাঁকা কথা বলিয়াও নিজের ভক্তত্ব বা বৈষ্ণবত্ব রক্ষা করিতে হয়, ইহা আমার দৈবহত জীবনে বহুশঃ অনুভূত। তাই এ স্থলে কিছু বলিতে চাই। অপরাধ বলিতে শাস্ত্রে যে দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ এবং দশবিধ নামাপরাধ সাক্ষাৎ ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, ইহা ভিন্নও শাস্ত্র বিগর্হিত **সাধারণ পাপকর্ম্মগুলিও** পরিণামে গুরুতর সেবাপরাধে নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। যেমন মনে করুন, "গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করা গুরুতর নামাপরাধ" এইটুকু মাত্র শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, সুতরাং গুরু মনুষ্য নহেন ইহা লোকের নিকট খুব বলি। কিন্তু গুরুর সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে বেশ মানুষের সহিত ব্যবহারের মত সমস্তই চলিতেছে। গুরুর প্রতি "হাঁ" "না" বিধি নিষেধ, বাদ প্রতিবাদ, নিতান্ত লজ্জাকর ব্যবহার ধরা পড়িয়া লজ্জিত হওয়ার ভয়ে গুরুর নিকট সত্যের গোপন, মিথ্যার আশ্রয় ইত্যাদি সবই করিতেছি, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক সময় অতি সাধারণ মনুষ্যবৎ ব্যবহার প্রায়শঃ করিতেছি, কিন্তু মুখে বলি গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করা নামাপরাধ। যেমন মনে করুন, দানব্রত-হোমাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের মহিমার সমতা জ্ঞান করিলে গুরুতর নামাপরাধ হয়। কিন্তু মালার ঝোলায় হাত রাখিয়া এক আধ বার "হরে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে তরকারীর বাজারে যাই এবং দোকানীর নিকট স্বচ্ছন্দে মিথ্যা বলি,—অমুক জায়গায় খুব সস্তা বিক্রি হচ্ছে, ওহে তুমি ত ভক্ত মানুষ, তাই তোমার নিকট আসি,—ইত্যাদি বলিয়া কলাটি মূলাটি যাহা কিছু ফাঁকি দিয়া লইতে পারি নামাবলীতে বা বহির্বাসে বান্ধিয়া লই। এই প্রকার সাধারণ শাস্ত্রবিগর্হিত পাপকর্ম্মগুলিও গুরুতর নামাপরাধে বা সেবাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। এই প্রকার অপরাধ গুলি **চোরাবালির মত** সাধনতরীকে রসাতলে নেয়। আমি ত বৈষ্ণব, "অপরাধ" "অপরাধ" বলিয়া খুব চিৎকার ত করি, তবে এতাদৃশ ব্যবহারগুলির প্রতি অপরাধ বলিয়া ভীত হইয়া কেন বিরত হইতে চেষ্টা করি না? ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় প্রকৃত সৎ শিক্ষার অভাব। প্রথমতঃ অনেকে সত্য শৌচ দয়া

ক্ষমা অনসূয়া অহিংসা সারল্য সৌহার্দ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ উপার্জ্জনের প্রকৃত সৎশিক্ষা পায় না। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, এমনও অনেক ক্ষেত্র আছে যে একটু সামান্য লিখা পড়া।শিক্ষা, বা সাধারণ ভদ্রোচিত উঠা বসা ভদ্রোচিত ভাষণ আলাপনাদি ভদ্রব্যবহারোচিত শিক্ষারও প্রচুর অভাব, অথচ দৈবাৎ কোনও সাধু পুরুষের যৎকিঞ্চিৎ কৃপার আভাস মাত্র ভগবন্নাম মন্ত্রাদি লাভ করিয়া সামান্যভাবে তিলক মালা ধারণ বা একটু পূজা আহ্নিকের পদ্ধতি বা সাধন বিষয়ে দুই চারিটি অতি বাহ্যিক আচার, যথা, প্রাতঃস্নান, তৈলবর্জ্জন, অধিকাংশ সময়ে লোমজাত বস্ত্র পরিধান, ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া জীবনের যাবতীয় শিক্ষার সমাবর্ত্তন মনে করি, এবং শীঘ্র শীঘ্রই অপরকে প্রাতঃস্নান তৈলবর্জ্জন ইত্যাদির মহিমা দেখাইয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইবার জন্য বাবাজী গোঁসাইজী স্বামীজী ইত্যাদি খ্যাতি লাভের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পড়ি। প্রত্যুত প্রকৃত শিখা পড়া শিক্ষার দ্বারা সৎশাস্ত্রানুশীলনে খড়্গ হস্ত হই, "বিদ্যার গৌরব নাই চৈতন্যের হাটে," "যেজন গৌরাঙ্গ করে সার,...চৌদ্দ বিদ্যা করতলে তার," ইত্যাদি বাক্যের কদর্থ গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাধনশিক্ষা সমাপন করিয়া থাকি। আবার সত্য দয়া ক্ষমা সারল্য সৌহৃদ্য প্রভৃতির প্রতিও "কর্ম্মকাণ্ড" "শুষ্ক জ্ঞানকাণ্ড" জ্ঞানে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা ভাব পোষণ করিয়া শুদ্ধ ভক্তি মার্গের বা রাগানুগা ভক্তি মার্গের বা অষ্টকালীয় লীলার দুই চারিটি কথা যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়া শুদ্ধ ভক্ত বা রাগানুগা সাধক রূপে অতি শীঘ্র খ্যাত হইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি। ফলতঃ যাহা হইবার তাহাই হয়। সংস্কারে মজ্জাগত হিংসা নিন্দা অসূয়া মিথ্যা দম্ভ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দুঃস্বভাবগুলি মালার ঝোলার আড়ালে থাকিয়া বিকট হুঙ্কারে গর্জ্জন করিতেই থাকে। সৎশিক্ষার অভাবে প্রত্যুত কুশিক্ষার সংস্কার প্রভাবে অভ্যস্ত অতিশয় অভদ্রোচিত চলা বসা বাগ্‌বাচালতা প্রভৃতিও তিলকমুদ্রার ছাপ পাইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হইতে থাকে। ততোঽধিক দুঃখের বিষয় ইহাই যে যদিও বা কিঞ্চিৎ লিখাপড়া শিক্ষা করি তাহাও লাভ যশঃ পূজা অর্থাদি প্রাপ্তির লালসায় করি এবং যথেচ্ছ চরিতার্থতা যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহাতেই আমার বিদ্যাশিক্ষার সফলতা মনে করি। বস্তুতঃ প্রকৃত জীবন গঠন করিয়া প্রকৃত আত্মকৃতার্থতার জন্য লিখাপড়া শিক্ষা করি না, সুতরাং সত্য দয়া ক্ষমা সারল্যাদিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া সাধনমার্গে যে অগ্রসর হইব তাহাও হইয়া উঠে না, বরং ঐ জাতীয় বিদ্যার দ্বারা যাহা কিছু শাস্ত্রানুশীলনাদি হয়, তাহাতেও অর্থ যশঃ পূজাদির হীনবাসনার প্রাবল্যে হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব পরশ্রীকাতরতা মিথ্যা শঠতা প্রভৃতি ভাগবতগীতাদি সৎশাস্ত্রের আড়ালে থাকিয়া তাণ্ডবনৃত্যই করিতে থাকে, ফলতঃ **ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি।** ভক্তিপথে তখন আর সুগতি না হইয়া অপরাধরূপ বিগতিই হইতে থাকে। তখন অপরাধগুলি গুরুতর আকার ধারণ করিলেও তাহার প্রতিকারের প্রকৃত উপায়ের দিকে না যাইয়া বাহ্যিক বৈষ্ণবতা জমাইবার উদ্দেশে কাণ্ডে অকাণ্ডে "অপরাধ" "অপরাধ" ভাষা দুই চার বার অবশ্য বলিবই; না বলিলে বৈষ্ণবতাই

জমাট বান্ধিবে না। বৈষ্ণব বেশের সহচর ঐ ভাষা বলাই চাই। বৈষ্ণবীয় রূঢ়ি ভাষার ন্যায় মুখে "অপরাধ" "অপরাধ" শব্দ উচ্চারণ করিলেও প্রকৃত অপরাধ কোথায়, অপরাধ কেন হয়, অপরাধ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পথ কি, ইহার বিচার করি না, এবং অপরাধ নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা করি না। বিচার করিলে দেখা যায় যে লোকশাস্ত্রবিগর্হিত মিথ্যাভাষণ, পরহিংসন, পরদ্রব্য পরস্ত্রী অপহরণ প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্মগুলি যাহা সাধারণ পাপকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যখন অনুষ্ঠিত হইয়া আবার কাপট্যের আড়ালে আশ্রয় লাভ করে, বিশেষতঃ ভজনভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া কাপট্যকে আশ্রয় করে, তখন ঐ অপকর্ম্মগুলি আর সাধারণ না থাকিয়া **গুরুতর অপরাধ** স্বরূপ হইয়াই দাঁড়ায়। যখন ঐ অপকর্ম্মগুলির আচরণ করিয়াও আমি লোকের নিকট নিন্দিত না হই, লোকের চক্ষে আমার বৈষ্ণবতার ঠাট বজায় থাকুক, এই প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন তাহার জন্য মনের মধ্যে অসদ্ভাবে এক প্রকার চেষ্টা প্রকাশ পায়, যাহার ফলে আমার বাক্যে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর আজুহাত প্রকাশ পাইবে, এবং আমার শারীরিক গতি ঢং ঢাং আটোপযুক্ত চোখমুখাদির ভঙ্গী ইত্যাদি এমনই প্রকটিত হইতে থাকিবে যাহার দ্বারা আমার ঐ অপকর্ম্মগুলি যেন অপকর্ম্মই নহে, উহা করা ঠিকই হইয়াছে, ঐরূপ করাটি দোষ নহে (বিশেষতঃ যদি নামের মালার ঝুলী হাতে থাকে, বা ভাগবতের পুঁথি সঙ্গে থাকে তবে ত কথাই নাই) ইহাই প্রতিপাদনপূর্ব্বক আমার অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মের উপর **কাপট্যের এক গাঢ় আবরণ দিয়া** তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভাগ্যবান্ সদ্ব্যক্তির হৃদয়ে ঐরূপ অসৎ চেষ্টা উদিত হয় না। তাঁহাদের কর্ত্তৃক কোনও সময়ে যথা কথঞ্চিৎ অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অন্যায় বলিয়া মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। মিথ্যা হিংসা চৌর্য্যাদি সাধারণ পাপকর্ম্মগুলিই অসৎ হৃদয়ে **কাপট্যের** আড়ালে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যখন সাধুগুরু ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে, অর্থাৎ সাধুগুরুর নিকট মিথ্যাভাষণ, প্রৌঢ়িবাদ, কটূক্তি, ঔদ্ধত্য, ঝগড়াবিবাদ, নিন্দা হিংসাদি করিয়া নিতান্ত অন্য সজ্জনের চক্ষে যখন ধরা পড়িয়া নিন্দিত হইবার আশঙ্কা হয়, তখন কতকগুলি কপট দৈন্যের আড়ালে নিজকে রক্ষা করে। যেমন করজোড়, ঈষৎ কুব্জ হওয়া, জিহ্বাগ্রদংশনাদি শারীরিক দৈন্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে "আজ্ঞে সে কি? আমি কি এমন করিতে পারি?" ইত্যাদি বলি; আবার সময়ান্তরে বা "আজ্ঞে, অপরাধ ক্ষমা করিবেন" ইত্যাদি মৌখিক বৈষ্ণবীয় ভাষা ব্যবহার করি। ক্রমশঃ চিত্ত এতাদৃশ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া স্বভাব কাপট্যে নিপুণতম হইয়া উঠে। শেষে বৈষ্ণবীয় তিলকমালা ধারণ করিয়া, মালাঝুলী ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ ভগবদর্চ্চাবিগ্রহ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই কপট দৈন্য ব্যক্ত হইতে থাকে। কিন্তু অপরাধে প্রকৃত ভয় আমার ততটা নাই যতটা ভয় আছে আমার লাভ যশ পূজা অর্থাদির হানিতে। সুতরাং

অপরাধের কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য সচেষ্ট হই না। যখন যাহা অপরাধ আচরণ করি, তাহা দীর্ঘসময় স্মরণ রাখিয়া সন্তপ্ত হই না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা সৎমহাপুরুষের নিকট নিষ্কপট ভাবে দেহেন্দ্রিয় মনের দুশ্চেষ্টা ব্যক্ত করিয়া প্রতীকারের উপায় শিক্ষা করি না। অথচ যখন সাধু গুরু ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে যাই তখন এই মৌখিক বুলি আওড়াই, "অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" মনে প্রাণে দম্ভ অভিমান কার্কশ্যাদি বেশ বজায় রাখিয়া, "আজ্ঞে, আমি বড় অপরাধী, আজ্ঞে, অপরাধ ক্ষমা করিবেন" ইত্যাদি দুই চারি বার বলিয়া বৈষ্ণবতার জমাট বান্ধিয়া লই। তারপর বেশ হিংসা দ্বেষ অবজ্ঞা ঔদ্ধত্য গর্ব্ব কৌটিল্যাদি ব্যবহার করি। বস্তুতঃ নিরপরাধ হইতে হইলে সদ্গুরুর শাসনে কিছুকাল থাকিয়া হৃদয়ে সৎসংস্কার উপার্জ্জনের উপযুক্ত সৎশিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভগবদ্‌ভক্তিসাধকের মহদ্‌গুণের কথা শুনুন,—

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্রী, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। সব কহা নাহি যায় মাত্র দিগ্‌ দরশন ॥"

হায়, এই সমস্ত মহদ্‌গুণের প্রতি লক্ষ্য নাই, যৎকিঞ্চিৎ ভক্ত্যাভাস স্পর্শ হওয়া মাত্রই, শুদ্ধভক্তি রাগভক্তির দুই চারিটি বুলি শিখিয়া, 'কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়', 'যম নিয়মাদি বুলে তার সঙ্গ' ইত্যাদি বড় বড় উচ্চাধিকারী সম্বন্ধীয় বাক্যের আড়ালে থাকিয়া ভক্তির ভানে বহু গুরুতর অপরাধ সঞ্চয় করিতে থাকি। তাই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের সাবধানোক্তি —"নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেমধন।"

হাঁ, সত্যই কৃষ্ণভক্তি করিলে আর কিছু করিতে হয় না, জ্ঞান কর্ম্মের সকল সার কৃষ্ণভক্তিতে আছে, ইহা পরম সত্য। কিন্তু সমস্ত দিবানিশির মধ্যে এক আধ বার মালার ঝুলিটি লইয়া একটু টানাটানি করিয়া অবশেষে যাবতীয় সময় বিরুদ্ধ বহির্ম্মুখতা ভরা কর্ম্মে অতিবাহিত করিব, আর মুখে বলিব "কৃষ্ণভক্তি" করিলেই সর্ব্ব সিদ্ধ হয়! হায়, হায়, কৃষ্ণ ভক্তি করিলে ত হইবে? কৃষ্ণভক্তির নাম দিয়া নিজ স্বার্থের দোকান খুলিয়া ক্রোধ দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য পরনিন্দা গর্ব্বাদির ছড়াছড়ি করিলে কি কৃষ্ণভক্তি হইল? অথবা মালা তিলক, বিগ্রহ ভাগবতাদি দ্বারা ব্যবসা চালাইলেই কৃষ্ণভক্তি হইল? ইহা ভাবা উচিত। কৃষ্ণভক্তি কি পরিমাণ করিতেছি, আর ভক্তির বিরোধী আচরণ গোপনে গোপনে বা সাক্ষাতে কি পরিমাণ করিতেছি, এই অনুসন্ধান রাখিয়া সদ্গুরুর শিক্ষা শাসনের অধীন হইয়া প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকৃত্যের চরমফল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতিফল পাওয়া যায়। হায়, "মঙ্গলং মঙ্গলানাং," পরম মঙ্গল ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াও আমার দেহেন্দ্রিয় মনের কদর্য্য বৃত্তি অপসারিত হইতেছে না, সাধু গুরু মুখে শাস্ত্রাদি শ্রবণে এবং নিজেও যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইয়াও সাবধান হইত পারিতেছি না; ইহাই আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যও নহে, অনাদিকাল

হইতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হতভাগ্য জীবের অনাদি নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম সংস্কারে দূষিত চিত্তের বিকারে পুঞ্জীভূত অপরাধে সমাচ্ছন্ন দেহেন্দ্রিয় মনের কদর্য্যবৃত্তিগুলি সহজে অপসারিত হয় না। প্রচুর তীব্র অপরাধ দুষ্ট চিত্ত সাধুগুরুর প্রবল কৃপা শক্তিতে শোধিত হয়। দুঃখের বিষয় তাদৃশ কৃপালাভের উপযুক্ত চেষ্টায় তৎপর হই না। সাধুগুরুর নিকট হইতে যেন তেন প্রকারেণ একটু নাম মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, অথবা শ্রীমদ্ভাগবতাদির যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করার পরিপাটি শিক্ষা করিয়া (তাহাও অনেকস্থলে নিষ্কপটে নহে) প্রচুর কৃপা পাইয়াছি মনে করিয়া অভিমান করি, এবং কৌশলময় আচার ব্যবহার বাগাড়ম্বরে লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া নিজেই মহাপুরুষ হইয়া পড়ি, এবং ফাঁকাবুলি দুই চারিবার "কৃপা" "কৃপা" শব্দও উচ্চারণ করি। ইহাও এক প্রকার বৈষ্ণবীয় পরিভাষা বা রূঢ়ি শব্দের মত ব্যবহার করিয়া থাকি। সাধুগুরু দেখিলে ইহা বলিতেই হইবে (কাতর প্রার্থনা নহে)। "কৃপা করুন", "কৃপা রাখিবেন", "কৃপা ভিন্ন ত কিছু হবার উপায় নাই", ইত্যাদি বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া পড়ি। হায়রে আমার কৃপা প্রার্থনার প্রণালী! যাদৃশী মহৎকরুণা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ববিঘ্ননাশকরী পরমা ভক্তি শক্তি পাইতে পারি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখি না। মহাপুরুষদিগকে দর্শনাদি করিতে যাই বটে, মুখে বলি বটে, "বাবা, কিছু উপদেশ করুন, কৃপা করুন", কিন্তু প্রকৃত কৃপা কোথায়, কি ভাবে তাহা পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করি না। মহৎসন্নিধানে বা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সমীপে কিছু **দীর্ঘ কাল অবস্থান করিয়া সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হই না।** নিষ্কপট সেবার দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত সন্তোষ বিধান করিয়া **কাতর প্রাণে কৃপার ভিখারী হই না।** সর্ব্বোপরি তাঁহাদের **শাসনাজ্ঞার** অধীন হইয়া উপদেশ প্রতিপালন করি না, কিন্তু মুখে বলি "একটু কৃপা করিবেন।" বলিতে হয় বলি, বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়াছি, তাই বৈষ্ণবীয় ভাষা বলি, "একটু কৃপা টৃপা কর্‌বেন", চখেমুখে চঞ্চল গুপ্ত মৃদুহাসির রেখাপাত করিয়া বলি, "একটু কৃপা রাখ্‌বেন।"

বস্তুতঃ কিন্তু **নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনের মূল একমাত্র মহাপুরুষের মহতী করুণাই।** প্রকৃত মহৎ করুণা লাভ করিতে পারিলে নিরপরাধে ভগবদ্ভজনে কৃতকৃতার্থ হওয়া যায়। নিরপরাধে নামসাধনের পরমোপায় শ্রীমহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে; দুর্দ্দৈব আমার! সদ্গুরুর নিকট শিক্ষার অভাবে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের সার্থকতা আমি মালাতিলক ধারণ করিয়া এবং নামের ঝুলী হাতে লইয়া প্রকৃত বিষয়স্বার্থের জন্য বিষয়ী লোকের তোষামোদ খোসামোদ চাটুকারিতায় সম্পন্ন করি। কিন্তু তাহা ত নহে। সত্য দয়া সারল্যাদি সদ্গুণে উত্তম হইয়া এবং শাস্ত্রার্থাদি জ্ঞানে, শাস্ত্রীয় সদাচারাদি পালনে, ভগবদ্ভক্তি সাধনে "উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।" "তরোরিব সহিষ্ণুণা" ইহার অর্থ—"তরু যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়॥ এইমত বৈষ্ণব কারে

কিছু না মাগিবে। অযাচক বৃত্তি কিম্বা ফলমূল খাবে ॥" "অমানিনা" ইহার অর্থ উদরাদি ভরণের জন্য হতমান হওয়া নহে। "উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।" "মানদেন" ইহার অর্থ—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" বস্তুতঃ শ্লোকের অভিপ্রায় বিচার করিলে দেখা যায়, সর্ব্বাবস্থাতে অবিক্লবমতি হইয়া, গর্ব্বরহিত ক্ষান্তিপরায়ণ নিস্পৃহ অভিমানশূন্য এবং সর্ব্বত্র সমসৌহৃদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম করিবে। ইহাই প্রকৃত **দৈন্য, এই দৈন্যই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।** ইহা সদ্গুরুর শিক্ষায় আচরিত হইলে "নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেমধন" এই মহাবাক্য সফল হয়।

ভগবদ্ভক্তিসাধনের সার রহস্য শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে আমরা পাই—

"সাধুসঙ্গ (১), নামকীর্ত্তন (২), ভাগবতশ্রবণ (৩)।
মথুরামণ্ডলে বাস (৪), শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন (৫) ॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥

১। **সাধুসঙ্গ**; পূর্ব্বে (৩৪ পৃঃ) সৎসঙ্গের কথা কিছু বলিয়াছি, এখানে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি। বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ ভজন বিষয়ক সৎসঙ্গ করিতে হইলে নিজের সাধন সমান জাতীয় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট যে সাধু এবং যিনি স্নেহশীল এবং যিনি নিজাপেক্ষা সাধনে শ্রেষ্ঠ তাঁহার সঙ্গেই স্বীয় ভজন রহস্য আলাপ করিবে। তদ্ভিন্ন সাধু মহাপুরুষদিগের দর্শন প্রণাম স্তব সেবনাদি করিবে ও সাধারণ ভক্তির উপদেশাদি গ্রহণ করিবে।

২। **নামকীর্ত্তন**; নিজের সাধ্য এবং সাধনের ভাবের পরমানুকূল অর্থাৎ স্বীয় ভক্তিরসের ভাবোদ্বোধক ভগবানের নামকীর্ত্তন করিবে। ইহাকেই স্বাভীষ্ট নামকীর্ত্তন বলে।

৩। **ভাগবত শ্রবণ**; শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও সামান্য কিছু বলিতেছি। ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রতিনিধি মনে করেন, তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে পূজা করেন। পরম ভাগ্যবান্ ভক্তের এই ভক্তিরহস্য সাধারণের জ্ঞানগোচর না হইলেও সাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞানে নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবততুল্য পরমার্থ শাস্ত্র দ্বিতীয় নাই। ইহার সর্ব্বাবয়বেই উৎকৃষ্ট ভাগবত পারমহংস্য জ্ঞানামৃত যেন উচ্ছলিত হইতেছে। "যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।" আহা কি সুন্দর! পরম পূত গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনে ত্রিবেণী ধারার ন্যায় "যত্র জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিস্কৃতম।" সর্ব্বোপরি বিশুদ্ধ ভগবদ্রসমাধ্বীকের মাদকতা ভরা "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" এমন শাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। আবার তেমনই "বিদ্যা ভাগবতাবধি।" সর্ব্বো-পরি ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধি। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত মহিমা। এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ একটি প্রধান ভক্তিসাধন। এই শ্রবণটি মহৎ-মুখনিঃসৃত ভাগবত শ্রবণ হওয়া চাই। বক্তা দ্বিবিধ, এক সরাগ বক্তা, আর নীরাগ বক্তা।

নীরাগ ভগবদ্রসবেত্তা বক্তার মুখ নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই পরম ভক্তিসাধন। "সরাগো লোলুপঃ কামী", যাহারা ধন যশঃ পূজা লোকসংগ্রহাদির তীব্র লালসায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যবসায়ী পাঠক, তাহারা সরাগ বক্তা; অন্তরে লুক্কায়িত ধন যশ আদির কামনা সাফল্যের জন্য ভক্ত সাজিয়া শ্রীভাগবত পাঠ করা তাহাদের একটি বাণিজ্য ব্যাপার বিশেষ। শাস্ত্র বলেন "তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ", সেই ছদ্মভক্ত সরাগবক্তার উপদেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না। আপাততঃ তাহাদের বক্তৃতায় ভাষার বিন্যাস, প্রাকৃতলোকতোষকর গল্প রচনা এবং ভাবভঙ্গী প্রকটনের চাতুর্য্যে সাধারণ জন আকৃষ্ট হইলেও এবং তাহা বাহ্যিক শ্রবণে দর্শনে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখকর হইলেও রজস্তমোপহা ভাগবতী ভক্তিলাভের সম্ভাবনা সুদূর। তাই অর্থাদিতে নিস্পৃহ কামক্রোধাদি-রহিত নীরাগ ভগবদ্ভক্তোত্তম বক্তার মুখনিঃসৃত ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণের বিধি। এতাদৃশ নীরাগ বক্তার কুলশীলাচারাদির বিচার না করিয়া গুরুজ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবে এবং শ্রবণ করিবে। তাই বলিয়া আপনি গৃহস্থ ব্যক্তি, ধন অর্থ আছে, সৎ অসৎ নানাবিধ কর্ম্মে নিজের ঐন্দ্রিয়িক সুখ কৌতুকাদির নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করেন, স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথা অযথা অর্থ ব্যয় করেন, নিজের নাম যশ আদির লোভে জানিয়া শুনিয়াও অপকর্ম্মকারী ব্যক্তিদেরও অর্থাদির দ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন, অন্যায় কর্ম্ম করিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য অর্থ ব্যয় করেন, অথচ "পয়সা খরচ করিয়া ভাগবতপাঠ! য়্যাঃ, টাকা দিয়া ভাগবত শ্রবণ! রাম! রাম!" বলিয়া চমকিয়া উঠিবেন, তাহা চলিবে না। মনে রাখিবেন শ্রবণার্থী হইয় **গুরুজ্ঞানে বক্তাকে সেবা করিতে হইবে।** একটু পাখার বাতাস বা একটু পায়ে হাত বুলাইয়াই সেবার কার্য্য সারিয়া সরিয়া পড়িবেন না। যথাযোগ্য অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক মহৎসেবার আনুকূল্য করিয়া সদসৎ নানাবিধভাবে উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া চিত্তশোধন এবং ত্যাগ ব্রত শিক্ষা করিবেন। নতুবা বিত্তশাঠ্য মহাপরাধ সৃষ্ট হইবে। দেখুন তাদৃশ কদর্য্য মনোবৃত্তি দৃঢ় রাখিয়া শ্রবণ করিলেও চিত্তশুদ্ধি সুদূর হইয়া পড়িবে। ভক্তিসাধনই বলুন বা জ্ঞানকর্ম্মসাধনই বলুন, সকল আচরণের মধ্যে সাধকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে **নিজের দেহেন্দ্রিয়মনের কদর্য্যবৃত্তি কতটুকু পরিমাণে অপসারিত হইল, বিষয়প্রপঞ্চানুরক্তি কতটুকু কমিল, দেহেন্দ্রিয় মনের ঔদার্য্য সারল্যাদি কতটুকু বর্দ্ধিত হইল।** ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন আচরণ করিলে **সাধন নির্ব্বিঘ্ন হয়, সাধন ফলও সুলভ হয়।**

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচুর প্রচলিত, আমিও প্রচুর শ্রবণ করিয়াছি করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত ফল প্রচুর পাওয়া ত দূরে হস্ত, স্বল্পও পাইতেছি বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় **প্রধান দুইটি বিষয়ে** ভুলই ইহার প্রধান কারণ। একটি—**শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ,**

দ্বিতীয়—ভাগবত-বক্তা শ্রেষ্ঠ শ্রবণগুরু। এই দুইটি মূল বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়াও বিজ্ঞের অভিমানের ভার লইয়াই শ্রবণে যাই। "কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়," "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥" ইত্যাদি পড়িয়া বেশ জানি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কৃষ্ণের তুল্য। আর ইহাও জানি যে "বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুং। পূজয়েদ্ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ সঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥" শ্লোক দুইটির অর্থও বেশ জানি। "ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্‌জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাস্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে ধর্ম্ম জ্ঞান ও বিবেক রহিত জীবের নিমিত্ত এই (শ্রীমদ্ভাগবত) পুরাণ সূর্য্য (তৎপ্রতিনিধিরূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।" ভাগবত বক্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে "জ্ঞানবক্তা বৈষ্ণবকে যিনি বিষ্ণু তুল্য গুরু বলিয়া জানেন এবং বাক্য মনঃ শরীরের দ্বারা তাঁহাকে পূজা করেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই বৈষ্ণব।" ইহা ত জানি, সুতরাং আমি বিজ্ঞ; তবে ভাগবত শ্রবণে যখন যাই তখন ভুলিয়া যাই, বা তদুচিত আচরণ করি না, তাই অজ্ঞই বটি। শুধু অজ্ঞ হইলেও শোধরাইতে পারিতাম, কিন্তু এ যে বিজ্ঞতার ছাপামুদ্রায় মুদ্রিত অজ্ঞতা, **সুতরাং জ্ঞানবল-দুর্ব্বিদগ্ধতা রূপ গুরুতর অপরাধ।** মনে করুন যে স্থলে তাদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়, সেই স্থলের মহিমা কি? ভাগবতপাঠগৃহ দেবসভা, সাক্ষাদ্‌ভগবন্মন্দির, যে স্থলে অলক্ষিতভাবে দেবগণ ঋষিগণ বৈকুণ্ঠীয় পার্ষদগণ আগমন করেন, ইহা সপারিষদ ভগবদাবির্ভাব স্থল। যখন ভাগবত শ্রবণ করিতে যাই তখন এই স্থানের মর্য্যাদারক্ষণোচিত সম্ভ্রম গৌরব কতটা রক্ষা করি? স্থানের মাহাত্ম্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তাহার যথা যোগ্য গৌরব মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উঠা বসা আলাপ ব্যবহারাদি করি কি? অবশ্য প্রথমতঃ বৈষ্ণবতা ব্যবহারে জায়গাটিতে যেমন তেমন ভাবে একটা দণ্ডবৎ প্রণাম করি বটে, কিন্তু তারপর তত্রত্য আগত পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত প্রাকৃত কুশলবার্ত্তাদি, পুত্র কন্যাদি গৃহপরিবারের কুশলাকুশল বার্ত্তা, হাট বাজারের কথা, পাট ব্যবসায়ের আলাপ, সোণা রূপার দরের সংবাদ-বার্ত্তা, কোম্পানী কাগজের দরের উঠা নামার কথা, তাহাতেও কুলাইয়া উঠে না, তখন খবরের কাগজের সংবাদের আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে তত্তদ্‌রসোদ্গারজনিত উচ্চ মধ্য নানা প্রকার চপল হাস্য কলরোল, বিদ্রূপাত্মক বাক্যব্যবহারাদি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের উপক্রম উপসংহার করি। ইহার মধ্যেও পরচর্চ্চা পরহিংসা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কামক্রোধাদি সুযোগ বুঝিয়া উদিত হইয়া পড়ে। হায় ইহাই আমার শ্রীমদ্ভাগবতের মর্য্যাদা রক্ষণ! যাঁহার মুখে পাঠ শ্রবণ করি তাঁহাকে "গুরু" করিয়াও শ্রবণ করি না, তাঁহার প্রতি অনেক সময়ে পরোক্ষে অপরোক্ষে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাষা ব্যবহার ও প্রতিকূলভাব পোষণ করিয়া থাকি। প্রত্যহ পাঠ শ্রবণে যাই; "কি হে, কোথায় গিয়েছিলে?" জিজ্ঞাসা করিলে বলি—অমুক গোঁসাই (বা অমুক বাবাজী) পাঠ করে, আর ত কোথাও এখন পাঠ কীর্ত্তন নিকটে পাই না, অন্যত্র শুনিবার ত আর সুবিধা নাই, একটু পাঠে গিয়াছিলাম, একটু শ্রবণ ত চাই। "কেমন শুনলে?" "তা মন্দ নয়, তবে কি

না..." ইত্যাদি রূপে পাঠকের ও পাঠের পরিচয় দিয়া আমার শ্রবণাঙ্গ ভক্তিসাধনের সাফল্য করি। এইরূপ যে শ্রবণ তাহার দ্বারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ বিশেষ হয়। প্রকৃত শ্রীভাগবত শ্রবণ বিধি শ্রীমদ্‌গুরুপাদপদ্মে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার আসনের নাম ব্যাসাসন, ইহা তাকিয়া ঠেস দিয়া আরামে বসিবার ব্যাস (বিস্তারাকার) আসন নহে, ইহা শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান-ভক্তিশক্তির আবেশাবতার ভগবান্ বেদব্যাসের অধিষ্ঠানের আসন, তাই ইহার নাম ব্যাসাসন, তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত **তাঁহারই শক্তি আবির্ভাবের আসন স্থান।** ঐ আসনে যিনি উপবিষ্ট হইয়া অন্যাভিনিবেশ শূন্য হইয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ ভক্তিরসে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবৎ কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি **ব্যাস শুকের প্রতিনিধি।** তাঁহাতে ব্যাসের শুকের শক্তির আবির্ভাব মনে করিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে আছে "বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।" এই প্রকার ভাবনা দ্বারা তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি পূর্ব্বক এবং শান্ত দান্ত অনন্যচেতা হইয়া ভগবৎ কথাকে কায়িক বাচিক মানসিক সৎকারপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। কায়িক সৎকার দণ্ডবৎ প্রণাম, অঞ্জলি বন্ধাদি; বাচিক সৎকার অনুমোদন সূচক "জয় জয়" "ধন্য ধন্য" এবং ভগবন্নাম উচ্চারণ প্রভৃতি; মানসিক সৎকার আস্তিক্য বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাবধারণের চেষ্টা ইত্যাদি। এইরূপে **সাবহিত** হইয়া শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ দ্বারাই অচিরে ভক্তি সাধনের পরম ফল পাওয়া যায়।

শ্রবণের মার্গ দুই প্রকার, একটি বিচারপ্রধান মার্গ, অপরটি রুচিপ্রধান মার্গ। লীলাগুণ চরিতাদি বিষয়ক ভগবৎ কথাতে যৎকিঞ্চিৎ রুচি প্রকাশ পাইলেও যাহাদের ভজন প্রবৃত্তি জাত হয় নাই এবং ভগদ্বিষয়ক অসম্ভব বিপরীত ভাবনা এবং নিজাত্মবিষয়ক অসম্ভব বিপরীত ভাবনার প্রাবল্যে প্রবল সন্দেহ বর্ত্তমান, তাহাদের পক্ষে অনেক স্থলে বিচারপ্রধান মার্গই শ্রেয়ঃ। প্রথমতঃ শাস্ত্রের উপক্রম এবং উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই ছয়টি শাস্ত্রার্থাবধারণের নিয়ামক। এই ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থের অবধারণ পূর্ব্বক **শ্রবণ করিবে।** পশ্চাৎ অসম্ভব ভাবনা বিপরীত ভাবনা নিরসনের নিমিত্ত অবধারিত অর্থের বিচাররূপ **মনন করিবে।** এই প্রকার শ্রবণ মনন দ্বারা ভগবান্ এবং সাধন ভজন মুক্তি আদি জ্ঞেয় গত অসম্ভব ভাবনা দূরীভূত হয়। এই জ্ঞানের পশ্চাৎ শ্রদ্ধার উদয়, অর্থাৎ শ্রবণ মনন দ্বারা ভজন-ভজনীয় বিষয়াদি জ্ঞান দৃঢ় হইলে প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ সৎসঙ্গে ভগবৎ কথাদিতে যে কিঞ্চিৎ রুচি জাত হইয়াছিল, সেই রুচিটি মনন দ্বারা স্থিরীকৃত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা সমুল্লসিত হয়। ফলে ভজন পথে প্রবৃত্তির উদয় করায়। তারপরই নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই বিচারপ্রধান মার্গের শ্রবণ। এ স্থলে একটি কথা বলি,—অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা অনেক সাধু মহাত্মাদিগের নিকট তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করেন। তাঁহারা তৎকালিক যথাযোগ্য উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট বা নিরস্ত হইলেও সময়ান্তরে ঐ একই সন্দেহ তাঁহাদের মনে উদিত হয়, আবার প্রশ্ন করেন, উত্তর পান, ভুলিয়া

যান, আবার সন্দেহ, সন্দেহ তাঁহাদের ভঙ্গই হয় না। ইহার কারণ প্রকৃত ভাবে **অর্থাবধারণ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন না,** বা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাবধারণ করিলেও পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ সেই অবধারিত সিদ্ধান্তটি বিচার করিয়া **মনন করেন না।** অর্থাবধারণপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ মনন করিলে আর তাদৃশ সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার অনেক জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করেন যেন উকিলের জেরা, একটির পর একটি প্রশ্ন,—যথাযোগ্য উত্তর পান, তথাপি পশ্চাতে সেই সন্দেহ তিমির,—মনন করেন না। আবার অনেক জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা নিজকে খ্যাত (আমি জানি বলিয়া নিজকে জাহির) করিবার ইচ্ছা। কতক জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসার ছলে এলোমেলো তর্কই আরম্ভ করেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছুই নাই ; সাধু মহাপুরুষগণ ইঁহাদিগকে ক্ষমা করুন। **বৈধী ভক্তি সাধনে প্রায়শঃ বিচারপ্রধান মার্গের শ্রবণ অনুকূল হয়।**

রুচিপ্রধান মার্গের শ্রবণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রথমতঃ সৎসঙ্গে ভগবল্লীলাগুণাদি কথাতে যাঁহাদের রুচি জাত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা বড় থাকে না, দৈবাৎ ভজনীয় বিষয়ে দৃঢ়তার জন্য ভজনীয় তত্ত্বানুকূল বিচার কচিৎ প্রয়োজন হয়। তাঁহারা তাদৃশ লীলা কথা শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট হইয়াই ভজনে জাতশ্রদ্ধ হয়েন। সুতরাং শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা থাকে না। বিশেষতঃ যাঁহারা বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রীতি লক্ষণ ভক্তিই পুরুষার্থ জ্ঞানে শ্রবণেচ্ছু, তাঁহাদিগের পক্ষে **রুচিপ্রধানমার্গই** পরম শ্রেয়ঃ। রাগানুগভক্তি-সাধনে রুচিমার্গের শ্রবণই শ্রেয়ঃ ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু এই উভয় বিধ শ্রবণ মার্গেই শ্রবণার্থী ব্যক্তি যাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে শ্রবণ গুরু করিয়াই শ্রবণ করিবেন, ইহাই বিধি।

আর ভজনের বিশেষ অন্তরঙ্গ যে ভাগবত শ্রবণ তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ," ভাগবতপ্রীতিরসিক ব্যক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদন করিবে। এস্থলেও স্বীয় প্রীতিরসের সমান জাতীয় প্রীতিরসিক ভক্তের সঙ্গে যে ভাগবতের অর্থের আস্বাদরূপ শ্রবণ, অর্থাৎ যে জাতীয় শ্রবণে শ্রবণীয় বিষয়গুলি রসাকারে উদয় প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদিত হয় এমন যে শ্রবণ তাদৃশভাবে ভাগবত শ্রবণই পরমান্তরঙ্গ ভজন। ভগবৎপ্রীতিই রস। ভগবৎপ্রীতিরসই যাঁহাদের পরম পুরুষার্থ তাদৃশ রসবেত্তা ভগবদ্ভক্ত সমূহের সহিতই ভগবৎ এবং ভাগবত কথাময় শ্রীমদ্ভাগবত রস আস্বাদন করিবেন। এই ভাগবত রসাস্বাদনে ভগবল্লীলা কথার বক্তা এবং শ্রোতা যথাযোগ্য হইলেই রসোদয় হয়। বিশেষতঃ রাগানুগীয় ভক্তিসাধক ব্যক্তি শুদ্ধ ভগবন্মাধুর্য্যপরায়ণ এবং সিদ্ধদেহে ভগবল্লীলা-পরিকরান্তঃপাতিতাভিমানী ভগবৎপ্রীতিরসিক ব্যক্তিদিগের সহিতই শ্রীমদ্ভাগবত কথাকে রসরূপে আস্বাদন করিবেন। যে সকল ভক্তহৃদয়ে ভাগবতী প্রীতিটি বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ ভাব-সমূহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং বিরুদ্ধ ক্রোধাদিভাব এবং অবিরুদ্ধ হাস্যাদি ভাবসহকেম্

নিজের বশে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং পুষ্টিলাভ করিয়া স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে "বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, সঞ্চারীকে" অতি ঝটিতি প্রকটিত করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন যোগ্য রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ ভগবৎ প্রীতিরসিক ভক্তদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত কথা রসাস্বাদনই পরমান্তরঙ্গ সাধন।

৪। **মথুরামণ্ডলে বাস** ; ইহা একটি পরমান্তরঙ্গ ভক্তিসাধন। "তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা।" অর্থাৎ স্বীয় ভাবের অভীষ্ট ভগবৎকথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। ইহাই প্রকৃত ব্রজবাস সাধন। "পরমানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরা স্পর্শমাত্রতঃ"—মথুরার স্পর্শমাত্রই পরমানন্দময়ী ভগবৎপ্রীতির সিদ্ধি হয়। কিন্তু এস্থলেও "নিরপরাধচিত্ত ব্যক্তির" পক্ষেই বুঝিতে হইবে ; সাপরাধচিত্ত ব্যক্তির শ্রীমথুরার সেবা করিলে অচিরে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া প্রেমভক্তি লাভ হয়। শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস বলিতে **মুখ্যভাবে ব্রজে বাসই** বুঝিতে হইবে। মথুরার সেবা যথা—"শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥" মথুরামহিমাদি শ্রবণ, মথুরার নাম মহিমাদি স্মরণ, কীর্ত্তন, মথুরা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, দূর হইতে মথুরার দর্শন, মথুরার সমীপে গমন, মথুরার স্পর্শন, নিজাশ্রয়রূপে মথুরাকে বরণ, সম্মার্জ্জন বা জলাদি দ্বারা প্রোক্ষণাদি সংস্কার করিলে, মথুরা মানুষ মাত্রেরই অভীষ্ট দান করেন। মথুরার সেবা এই নববিধ। শরীরের দ্বারা মথুরাবাসে অসমর্থ হইলে মনেও বাস করিবে। বিশেষতঃ রাগানুগা ভক্তিসাধক ব্যক্তির স্বীয় চিন্তনীয় সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজে বাস পরমান্তরঙ্গ সাধন। **ইহা রাগানুগা সাধনের জীবন স্বরূপ।**

৫। **শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন** ; শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবৎ প্রতিমাকে অর্চ্চাবিগ্রহ, অর্চ্চামূর্ত্তি বলা যায়। এই বিগ্রহের সেবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিবেন। সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে উপাসকগণ এই অর্চ্চাবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ রূপেই বোধ করিবেন। সাক্ষাৎ ভগবদ্বিশ্বাসে প্রীতিপূর্ব্বক দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের মধ্যে সাধকের স্বীয় ভাবোচিত সেবাই প্রীতি সেবা। "এই মূর্ত্তি ভগবানের অধিষ্ঠান, মূর্ত্তিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া সাধকের সেবা পূজাদি গ্রহণ করেন" এই ভাব পোষণেও অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বের ভেদ জ্ঞান হেতু ভক্তি বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। পরমোপাসক ব্যক্তি এইরূপ অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভাবও মনে আনিবেন না, সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা করিবেন। এই শ্রীমূর্ত্তিসেবাসাধনে সর্ব্বথা সেবাপরাধ বর্জ্জিত হওয়া চাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, **ভগবৎপ্রীতির দুরন্ত প্রতিবন্ধক অপরাধই।** অপরাধ বর্জ্জিত হইয়া সেবা করিতে পারিলেই অচিরে পরম ফল লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। রাগানুগীয় ভক্তিসাধক-গণ নিজাভীষ্ট সিদ্ধ দেহ চিন্তন পূর্ব্বক ভাবোচিত মানসিক সেবার অনুগামী হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন যথাবস্থিত সাধক দেহের অযোগ্য, কেবল মাত্র মানসিক চিন্তনীয় সিদ্ধ দেহেরই যোগ্য যে সকল প্রেমময় সেবা, তাহা যেন অসিদ্ধ বাহ্যিক

সাধকদেহে শ্রীমুর্ত্তিতে না করেন। যেমন মনে করুন, সখাগণ নিজোচ্ছিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন, শ্রীনন্দ যশোদা বা তত্তুল্য পিতৃমাতৃগণ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের প্রসাদ অর্পণ করেন, বৃদ্ধ গোপগোপীদের পদধূলি প্রভৃতি দেন, তাড়ন ভর্ৎসন বন্ধনাদি করেন, কান্তাগণ আলিঙ্গন চুম্বনাদি করেন। তত্তদ্‌ভাবানুগ সাধকগণ চিন্তনীয় সিদ্ধদেহে এই সকল মানসিক সেবা করিলেও সাধকদেহে শ্রীমূর্ত্তির সেবায় তাদৃশ উচ্ছিষ্ট দান করা বা নারায়ণকে অগ্রে ভোগ দিয়া পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা, শ্রীমূর্ত্তিকে তাড়ন ভর্ৎসন বন্ধনাদি করা, রমণোচিত আলিঙ্গন চুম্বনাদি করা প্রভৃতি সেবা করিলে গুরুতর ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পাইবে এবং সেবাপরাধই হইবে। অত্যচিন্তনীয়াদ্ভুতবীর্য্যবান্ এই সাধনপঞ্চকের মধ্যে যে কোনও একটির স্বল্প সম্বন্ধ ঘটিলেও **নিরপরাধচিত্ত ব্যক্তিতে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়।** তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই পাঁচটিকে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

ভক্তিসাধনে সিদ্ধ দেহ

অনেক শিক্ষিত মনীষী ব্যক্তি ভক্তিসাধনে "সিদ্ধ দেহের" পরিচিন্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং চিন্তনীয় সিদ্ধদেহের স্বরূপ কি ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া থাকেন ; তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। শাস্ত্রে ভগবদর্চ্চনপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ দেবতা না হইয়া দেবতা অর্চ্চনা করিবে না, "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—সাধক ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বয়ং দেবতা হইয়া দেবতা অর্চ্চন করিবে। এই জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় দেবার্চ্চনে "ভূতশুদ্ধির" ব্যবস্থা আছে ; সাধক প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধি করিয়া অর্চ্চনীয় দেবতার সহিত "সোঽহম্" ভাবে অভিন্ন ভাব পোষণ করিয়া দেবার্চ্চন করিয়া থাকেন, ইহা অহংগ্রহোপাসনার মধ্যে পূর্ব্বে (৩১ পৃঃ) বলা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির বিঘাতক বলিয়া ভক্তি সাধকগণ "সোঽহম্" শব্দে "তদীয়োঽহম্" ভাব পোষণ করেন অর্থাৎ চিদংশে সমানজাতীয়তা বশতঃ জীব ভগবদভিন্ন হইলেও ব্যক্তি অংশে ভিন্ন, সুতরাং দেবতার আকৃতি প্রভৃতি অংশে সর্ব্বতঃ ঐক্যভাব পোষণ করেন না, ভগবদীয় চিদানন্দ পার্ষদ দেহ চিন্তা করিয়া "তদীয়োঽহম্" ভাবে ভগবদর্চ্চনাদি করেন। "ভূতশুদ্ধি নিজাভিলষিতভগবৎসেবৌপয়িকতৎপার্ষদদেহভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা," অর্থাৎ ভগবৎ সেবাই একমাত্র পুরুষার্থ যাঁহাদিগের তাঁহারা নিজাভীষ্ট ভগবানের সেবার উপযোগী ভগবানের পার্ষদদেহ ভাবনা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ভূতশুদ্ধি। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" এই নিষেধ বাক্যের মর্ম্মার্থ এই যে "তৎসদৃশতাভাবনামন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎ-সেবায়ামনধিকারাৎ" অর্থাৎ ভগবৎসদৃশতা ভাবনা বিনা উদ্দেশেও ভগবৎসেবার অধিকার হয় না। শাস্ত্রের এই অন্বয় মুখে বিধি এবং ব্যতিরেক মুখে নিষেধের দ্বারা ভগবৎসেবাভিলাষী ভক্তের নিজ আত্মাকে ভগবৎপার্ষদদেহ চিন্তা করিতে হইবে, ইহা সুদৃঢ় স্থির হইল। উক্ত

পার্ষদ দেহই সাধকের সিদ্ধ দেহ, তাহার চিন্তনই নিজ সিদ্ধদেহের চিন্তন। ভগবৎপ্রেমসেবাই ভক্তের **প্রয়োজন,** ভগবৎ পার্ষদদেহ ভিন্ন সেবা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সেবৈকপুরুষার্থী সাধকের নিজকে পার্ষদ দেহ চিন্তা করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

এখন সিদ্ধ দেহের স্বরূপের কথা বলি। নিজের বলিয়া যে পার্ষদ দেহ সাধক ব্যক্তি চিন্তা করেন, সেই পার্ষদ দেহটি কি কল্পিত, অথবা সত্য ? উত্তর—মিথ্যা কল্পিত নহে। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার কল্পনা করিয়া শাস্ত্র এবং তাদৃশ বিদ্বদ্ বৈষ্ণব মহাত্মা গণ আকাশ কুসুমের মালা গাঁথিবার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা সত্যই, মিথ্যা কল্পিত নহে। এস্থলে আর একটি প্রশ্ন— সাধক ব্যক্তি যখন নিজের আত্মাকে পার্ষদদেহরূপে চিন্তা করেন, তখন বস্তুতঃ সাধকের আত্মাটি ত আর পার্ষদ দেহ বিশিষ্ট নহে, কেননা "জীবাত্মা ত শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ এবং অনুপরিমাণ, সুতরাং নিরবয়ব," ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। সুতরাং সাধকের চিন্তাটি একটি কল্পিত মানসিক দেহকে আশ্রয় করিয়াই হয়, পরে হয়ত সাধনে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই নিয়মানুসারে সাধকের আত্মাকে পার্ষদ করিয়া দেন; এইভাবে পরিণামে পার্ষদ দেহ সত্য হইলেও চিন্তনের কালে ত সাধকের কল্পিত ? উত্তর—না, চিন্তাকালেও সেই পার্ষদ দেহের অস্তিত্ব বর্ত্তমান; যে নিত্য সত্য পার্ষদ দেহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, সেই নিত্য সত্য পার্ষদ দেহকেই সাধক নিজের বলিয়া চিন্তা করেন। প্রশ্ন—অদ্ভুত কথা! সাধকের শুদ্ধ আত্মাতে ত আর হস্তপদাদি অবয়ব নাই, উহা ত নিরবয়ব চৈতন্য, সুতরাং তাহাতে হস্তপদাদি বিশিষ্ট পার্ষদ দেহ নিত্য সত্যরূপে কি প্রকারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ? উত্তর—জীবাত্মাতে উহা বর্ত্তমান না থাকিলেও ভগবৎ স্বরূপ বৈভবে ঐ পার্ষদ দেহ অনাদি অনন্তকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে; ঐ পার্ষদ দেহই সাধক সাধন কালে চিন্তা করেন এবং সাধনসিদ্ধ অবস্থায় ঐ পার্ষদ দেহই লাভ করেন। শুনুন,— ভগবন্নিত্যধামে ভগবৎপার্ষদ দ্বিবিধ। এক ভগবানের সাক্ষাৎ সেবকরূপে যাঁহারা সেবা করিতেছেন তাঁহারা, আর এক সাক্ষাৎ সেবক না হইলেও ভগবৎসেবোপযোগী দেহে যাঁহারা ভগবল্লোকের শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা। নিত্যধামের শোভারূপে অবস্থিত ভগবৎসেবোপযোগী দেহও ভগবৎ পার্ষদ দেহ। কেননা এই দেহসমূহও ভগবচ্চিদানন্দ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।১৫। তাৎপর্য্যার্থ এই যে ভগবানের জ্যোতির অংশভূত যে সকল অনন্ত মূর্ত্তি ভগবদ্বৈকুণ্ঠের শোভারূপা হইয়া তথায় বর্ত্তমান আছেন, তাহারই মধ্যে কোনও একমূর্ত্তিকে সাধক ব্যক্তি স্বীয় পার্ষদ দেহ বলিয়া চিন্তা করেন। **এই মূর্ত্তিকে "আমি" অভিমানে চিন্তন করার নামই সিদ্ধদেহের চিন্তন।** ইহাই ভগবৎসেবোপযোগী নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দময় দেহ, ইহা প্রাকৃত কর্ম্মারব্ধ জড়সংঘাতময় দেহ নহে। এই মূর্ত্তিসমূহ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হইলেও ভগবদিচ্ছায় যোগমায়া শক্তির বৈভবে অচেতনের ন্যায়ই কেবলমাত্র শোভারূপা হইয়াই ভগবল্লোকে অবস্থান করিতেছেন। আবার এই মূর্ত্তি সকল অচেতনের ন্যায় থাকিলেও ইঁহাদের **সর্ব্বাবয়বে**

ভগবৎসেবার উপযোগিতা আছে। তাই এই প্রকার ভগবন্নিত্যালোকস্থিত নিত্যদেহকে ভগবৎসেবোপযোগী পার্ষদ দেহ, সেবোপযোগী সাধ্য দেহ, সেবোপযোগী সিদ্ধ দেহ ইত্যাদি শব্দে পরিভাষিত করা যায়। ভগবদ্‌ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় জীব যখন শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হয়, তখন যোগমায়া জীবের শুদ্ধ আত্মায় সাধক জীবের সঙ্কল্পানুসারী ঐ মূর্ত্তি সমূহের একটি মূর্ত্তি **স্বরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট করিয়া যুক্ত করিয়া দেন**। ঐ মূর্ত্তির সহিত তাদৃশ ভক্তের আত্মার যোগের ক্রম রহস্যই পূর্ব্বে (যোগমায়া প্রবন্ধে) সংগঠন শব্দে বলা হইয়াছে। সাধনসিদ্ধদশায় সেই মূর্ত্তির সহিত সেই সাধকের আত্মার একমূর্ত্তিরূপ ভগবতী যোগমায়াই সম্পন্ন করেন। তাহাই **প্রেমবৎপার্ষদদেহলাভ**।

প্রশ্ন—"যোগমায়া শক্তি শুদ্ধভক্তিসাধক ভক্তের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপর চিদানন্দ স্বরূপ প্রেমবৎপার্ষদ দেহ গঠন করেন" ইহাই যোগমায়া প্রকরণে বলা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, যেন যোগমায়া শক্তি ভক্তের চিদানন্দ দেহের সৃষ্টি করিয়া ভক্তের আত্মাতে সংযোজনা করেন। সে স্থলে কোনও নিত্যসিদ্ধ দেহ সংযোজিত করেন ইহা ত আপনি বলেন নাই।

উত্তর—হাঁ, যোগমায়া প্রকরণে ইহা সুস্পষ্ট বলা হয় নাই। বস্তুতঃ কিন্তু শুদ্ধভক্তি সাধকের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে শুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎসেবোপযোগী নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ দেহেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। মহৎ কৃপা এবং ভক্তি সাধনের তারতম্যে অর্থাৎ অজাতরতি সাধকভক্তের সাধনের মান্দ্য মধ্য তীব্রতার তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ সেবোপযোগী পার্ষদদেহেরও অস্পষ্ট, ঈষৎ স্পষ্ট, সুস্পষ্ট রূপে যে ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব হয় এবং সাধকের সেই দেহে অভিমানটিও অস্পষ্ট, ঈষৎ স্পষ্ট, সুস্পষ্টরূপে যে ক্রমে ক্রমে জাগিতে থাকে, সিদ্ধ দেহের সেই ক্রমাবির্ভাব এবং সাধকাত্মার সেই দেহে সেই ক্রমিকাভিমানের ক্রম পরম্পরা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে যোগমায়ার দ্রব্যবৃত্তি এবং গুণবৃত্তির দ্বারা যোগমায়ারই সংগঠন কার্য্য বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে যোগমায়া ভক্তের আত্মতত্ত্বের সহিত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদেহেরই একত্ব স্থাপন করেন। ঐ স্থাপনটি অজাতরতি সাধকের সাধনের ক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে **সংগঠনের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতে থাকে**, ইহাই যোগমায়ার পার্ষদদেহের গঠন কার্য্য; ইহা প্রাগভাব বস্তুর আদি গঠন নহে অর্থাৎ নূতন সৃষ্টি নহে, ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তুর আবির্ভাবমূলক গঠন কার্য্য। ইহা মায়াশক্তির মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টির ন্যায় বৈকারিক সৃষ্টি নহে, ইহা অপ্রাকৃত দিব্য সৃষ্টি বিশেষ, সৃষ্টির ন্যায়, বস্তুতঃ সৃষ্টি নহে। এই ভগবন্নিত্যধামস্থিত শোভারূপা পার্ষদ মূর্ত্তির শুদ্ধভক্তজীবের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে আবির্ভাবের প্রযোজিকা ভক্তিশক্তিরই ধর্ম্মভূত জ্ঞানাংশের বৃত্তিভেদে মূর্ত্তিমতী যোগমায়াই। বড়ই জটিল, অতীব রহস্যপূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত সহজগম্য নহে। দেখুন নিত্যধামস্থিত শোভারূপ পার্ষদদেহ সমূহে যে সকল দ্রব্যবৃত্তি হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গাবয়বাদি, তত্তৎ সমূহের মূল দ্রব্যবৃত্তিময়ী যোগমায়াই। এমন কি ভগবন্নিত্যধামস্থিত যাবতীয় দ্রব্যজাতীয়

পদার্থ সকলের প্রকাশ এবং তত্তদ্ব্যবহারের মূল শক্তিই যোগমায়া। আবার শুদ্ধ জীবাত্মতত্ত্বে বা মুক্তাত্মাতে স্বরূপভূত যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমন্তৃত্বাদি গুণ সমূহ, এবং সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসমূহ, **এই সর্ব্ববিধ গুণবৃত্তির মূলাশ্রয় শক্তি যোগমায়াই।** সুতরাং তাদৃশী যোগমায়া শক্তির নিজাংশ দ্রব্য নিত্যধামস্থ শোভারূপ পার্ষদ দেহের সহিত নিজেরই গুণবৃত্তির অংশ শুদ্ধজীবের শুদ্ধ কর্তৃত্বাদির সংযোজন করার নামই নিত্যপার্ষদ দেহের সংগঠন করা। যোগমায়া কর্তৃক সেই চিদানন্দাংশ জ্যোতির অংশভূত ভগবল্লোকের শোভারূপ দেহের সহিত চিদানন্দ-শক্তিস্বরূপ ভক্তিশক্তির বিলাসানুগৃহীত জীবের শুদ্ধ চিদাত্মস্বরূপের শুদ্ধ কর্তৃত্বাদি অভিমানাদির যে সংযোগটি ঘটিত হয়, তাহা পরস্পরে স্বরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে পরস্পরের স্বরূপাতিরিক্ততা কিছু নাই। তাই স্বরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই স্বরূপ পদার্থগুলির ধ্বংস নাই, তাই এই অচিন্ত্য স্বরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট সংযোগের ধ্বংস হয় না। এই প্রকার পার্ষদ দেহে আর দেহ দেহীর ভেদ থাকে না। এই সংযোগের কোন কালে আর **বিয়োগও নাই।** ভক্তি-সাধকের ইহাই **সাধ্যভক্তির প্রাদুর্ভাবরূপ মুক্তি নামক পুরুষার্থ।** সাধনকাল হইতেই সঙ্কল্পানুযায়ী সেবোপযোগী এই সিদ্ধদেহ লাভ হয়।

কোনও কোনও শাস্ত্রদর্শী ভক্তিরসবিজ্ঞ মহানুভবী ব্যক্তিরা বলেন যে কোনও কোনও ভক্তিসাধকের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে যখন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় শুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব হয় তখন হইতেই ভাগবতী ভক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবৎশক্তি যোগমায়ার বলেই **শুদ্ধ আত্মতত্ত্বই ভক্তির অনুরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ ধারণ করে,** "আত্মতত্ত্বস্যৈব তদনুরূপদেহেন্দ্রিয়াদিরূপতা," **ভগবন্নিত্যলোকস্থিত শোভারূপ সিদ্ধ দেহের আবির্ভাবের অপেক্ষা রাখেনা।** সাধকের আত্মাই ভক্তি শক্তির স্ফুরণে স্বয়ংই দেহেন্দ্রিয়াদি ধারণ করে, ইহাই যোগমায়ার প্রেমবৎ পার্ষদ দেহ গঠন, পূর্ব্বে যোগমায়া প্রকরণে ইহা বলিয়াছি। ইহাও ভক্তিশক্তির জ্ঞানবৃত্তি যোগমায়া শক্তির দ্রব্যবৃত্তি (উপাদানরূপা) এবং গুণবৃত্তি অভিমানাদির সাহায্যেই সংগঠিত হয় ("যোগমায়া" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অতি গূঢ়রহস্যময়ী গুহ্যবিদ্যা ভক্তিশক্তির মহিমা যেমন অচিন্তনীয় তেমনই ভক্তিসিদ্ধান্ত রহস্যও অচিন্ত্যানির্ব্বচনীয়, কেবলমাত্র তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন সাধুগুরু কৃপোল্লসিতানুভববেদ্য। অপূর্ব্ব রহস্য কথা শুনুন,—আপনারা সন্দেহ বা আশঙ্কা করিতে পারেন যে ভক্তি ত জ্ঞান এবং আনন্দ শক্তির সার, ইহার মধ্যে দ্রব্য এবং গুণ কি প্রকারে সম্ভব হয়? জ্ঞানের দ্রব্যরূপতা অসম্ভব, জ্ঞানকে না হয় একটা গুণ বা মানসিক ক্রিয়া বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান একটা দ্রব্য ইহা ত বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু উপনিষদাদি পরতত্ত্বকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্," "বিজ্ঞানমানন্দম্" ইত্যাদি বলিতেছেন, সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ দ্রব্য। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞান সত্তা আনন্দাদিকে ব্রহ্মের গুণ বা শক্তি বলিতেছেন। ঐ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার গুণরূপ জ্ঞানটি পৃথক্

নহে; এখানে গুণ গুণী, বা শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন, তথাপি একটি দ্রব্য রূপে, একটি গুণ বা শক্তি রূপে সত্যানুভূত হয়, ইহাই অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ। সেই পরব্রহ্মেরই চিৎকণরূপ গৌণ অংশ জীবাত্মাও জ্ঞানরূপ দ্রব্য এবং তাহারই স্বরূপ হইতে অভিন্ন তাহারই গুণরূপ জ্ঞান আছে যে গুণবশতঃ জীবাত্মা জ্ঞাতা। এখন দেখুন, শুদ্ধ জীবাত্মার শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্বাদি জ্ঞানগুণের এবং শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ দ্রব্যের উপর যখন ভগবজ্‌জ্ঞানশক্তির সাররূপা ভাগবতী ভক্তি শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন ঐ ভক্তির জ্ঞানাংশের যে দ্রব্যবৃত্তি (ব্যাপার), তাহার **স্বাভাবিক বিলাসের প্রভাবেই** শুদ্ধ জীবাত্মতত্ত্বের দ্রব্যাংশটি পরমোল্লসিত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তির উপযোগী দেহ ইন্দ্রিয়াদি রূপে প্রকাশ পায়। ইহা তাহার **পরমোল্লসিত স্বরূপেরই অভিব্যক্তি**। আবার ঐরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব অভিমন্তৃত্বাদি গুণাংশটিও ঐ ভক্তির জ্ঞানাংশের গুণবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ বিলাস প্রভাবে পরমোল্লসিত হইয়া ভগবৎ সেবোপযোগী সেই স্বস্বরূপদেহে "অহং" "মম" ইত্যাদি প্রকাশ পায়, ইহাও পরমোল্লসিত স্বরূপভূত গুণের স্বরূপাভিব্যক্তি। ইহা শৃঙ্গ ন্যায়ে যুগপৎ হয়। ভক্তির এই **দ্রব্যগুণবৃত্তিক জ্ঞানাংশ শক্তিই যোগমায়া।** ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাধকের ভক্তিবাসিত শুদ্ধাত্মতত্ত্বের উপর ঐ আত্মস্বরূপই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে গঠিত হয় এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদিতে ভক্তির অনুরূপ "অহং ভগবদ্দাসঃ, সখা, কান্তা" ইত্যাদি অভিমান স্ফুরিত হয় যে ভগবৎশক্তিবিশেষের বলে তাহাই অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া। স্পর্শমণি সংযোগে যেমন লৌহ সুবর্ণ হয়, সেইরূপ অচিন্ত্য ভক্তির প্রভাবে নিরবয়ব শুদ্ধ চিদাত্মাই চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়। সাধনকালে এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপদেহের সঙ্কল্প করার নামই সিদ্ধদেহ চিন্তন। **বিশেষতঃ রাগানুগাভক্তিসাধনে এই প্রকার সিদ্ধ দেহের সঙ্কল্প করা একটি অন্তরঙ্গ সাধন।** বৈধী ভক্তিসাধনেও সিদ্ধদেহ চিন্তনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈধী ভক্তিসাধনে মানসিক ভাবের প্রাচুর্য্য নাই। রাগানুগা ভক্তি সাধনে মানসিক ভাবের প্রাচুর্য্য। সুতরাং মাধুর্য্যময় সম্বন্ধ বিশিষ্ট সখ্য বাৎসল্য কান্তা প্রভৃতি ভাবময় সিদ্ধ দেহের চিন্তন দ্বারা মাধুর্য্যভাবটি পুষ্ট হইয়া রাগানুগা ভক্তি সিদ্ধ হয়। তাই রাগানুগমার্গে তাদৃশ নিত্য পার্ষদ দেহ বা আত্মস্বরূপ বিগ্রহ চিন্তনের বিশেষ ব্যবস্থা।

এখানে একটি সন্দেহ হইতে পারে,—ভক্তিসিদ্ধ দশায় সাধকের শুদ্ধাত্মা ভগবল্লোকস্থিত শোভারূপ পার্ষদ দেহ লাভ করুক, অথবা সাধকের আত্মাই ভক্তির প্রভাবে পার্ষদ দেহ রূপে প্রকাশ পাউক, ইহা বুঝিলাম; কিন্তু সাধনকালে সাধকের তাহার চিন্তনের সম্ভাবনা কোথায়? কেননা, সেই নিত্য পার্ষদদেহ ভগবল্লোকেই অবস্থান করে, তাহার রূপ গুণ আকৃতি আদি যে সকল চিন্তনীয় বিষয় তাহা ত অজ্ঞেয়ই রহিল, শাস্ত্রাদিতেও তাহা বর্ণিত হওয়াও অসম্ভব, কেননা ঐ দেহ অনন্ত, কয়টিই বা বর্ণিত হইবে? সুতরাং সাধনকালে সাধক ব্যক্তি সিদ্ধদেহ বলিয়া যাহা চিন্তা করে তাহা কল্পনা মাত্র বলিয়াই মনে হয়।

এই প্রকার সন্দেহের সমাধানে ইহা বলা যায় যে ঠিক তাহা নহে; শাস্ত্রে সিদ্ধদেহের বিশেষভাবে সমগ্র বর্ণন না থাকিলেও সামান্যরূপে দিগ্‌দর্শন আছে। "শ্যামাবদাতাঃ শত-পত্রলোচনাঃ," "প্রবালবৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ" "সর্ব্বে চতুর্বাহবঃ" (—শ্রীমদ্ভাগবত) ইত্যাদি রূপ গুণ আকৃতি প্রভৃতির সামান্য বর্ণন শাস্ত্রে আছে; আবার বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী উপাসনাতেও "আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।" (—সনৎকুমার সংহিতা)। ভক্তিসাধন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। যথা— "**সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ**"; ইহার বিস্তৃত তাৎপর্য্যার্থ মৎকৃত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তি ভক্তিপরিকর পদার্থসমূহ নিত্যচিন্ময় স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ। ভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ব্যাপার নহে। মহৎকৃপায় ভক্তিশক্তি জীবে আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির উপর ভগবৎসেবার জন্য একটি উন্মুখভাব প্রকাশ করায়, সেই ভগবৎসেবোন্মুখ জিহ্বা, শ্রোত্র, হৃদয় প্রভৃতিতে স্বয়ংপ্রকাশ ভগবন্নামাদি স্বয়ং কীর্ত্তন শ্রবণ স্মরণাদি রূপে উদিত হইতে থাকে। সাধক যখন মহৎ মুখনিঃসৃত ভগবৎ শাস্ত্রাদিতে ভগবন্নিত্যপরিকরদিগের রূপ গুণ, ভগবৎপ্রীতিসেবা, ভাবাদি শ্রবণ করিয়া নিজে তৎসদৃশ পরিকরভাবে ভগবৎপ্রীতিসেবার জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখনই সেই সেবোন্মুখ মানসে ভগবৎ কীর্ত্তন শ্রবণাদির সাহায্যে ইচ্ছার উদ্রেক হয় যে "আমি এইরূপ সেবোপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করি", ইহাই সাধকের ভগবৎসেবোন্মুখ মানস ইন্দ্রিয়। সেই মানসে তখন পার্ষদদেহের চিন্তনের চেষ্টা হইতে থাকে। ইহাও স্বপ্রকাশ ভক্তিবাসিত মানস চেষ্টা। এই চেষ্টাকে আশ্রয় করিয়া সাধকের নিজ নিজ ভক্তিভাবের অনুকূল নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ দেহ, যাহা পূর্ব্বে মহৎ মুখ নিঃসৃত শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করিয়াছে, তাহাই ভক্তির তারতম্যানুসারে অস্পষ্ট ঈষৎ স্পষ্ট সুস্পষ্ট ইত্যাদি ভাবে সাধকহৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে, সাধক মনে করে "আমি স্মরণ করিতেছি," বস্তুতঃ তাহা নহে, স্বয়ং প্রকাশ নিত্যসিদ্ধদেহই ভগবৎসেবোন্মুখ সাধকহৃদয়ে উদিত হইয়া স্মৃত হইতেছে। **ইহাই সিদ্ধদেহের স্মরণ**। বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রীত্যেক-তাৎপর্য্যে ভগবৎসেবাভিলষিত ভাগবতী ভক্তি শক্তি পরিভাবিত চিত্তে স্মরণাদিতে উদিত ভগবদ্ভক্তির অনুরূপ সঙ্কল্পাদি যদি মিথ্যা কল্পনা হয়, হরি! হরি! তাহা হইলে সিদ্ধ যোগী ব্যক্তিদিগের সমাধিতে অনুভূত পদার্থসমূহ তদপেক্ষা অধিকতর মিথ্যা কাল্পনিক হওয়াই উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন শুনুন,—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

ব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিতেছেন, "হে নাথ, শ্রুতেক্ষিতপথ তুমি (অর্থাৎ সাধুগুরু মুখনিঃসৃত বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা প্রদর্শিত প্রাপ্তির মার্গ যাহার এমন যে তুমি সেই তুমি) জীব সকলের ভক্তিযোগ দ্বারা পরিভাবিত অর্থাৎ ভক্তিতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হৃদয়কমলে সর্ব্বদাই বাস কর।

তাঁহারা হৃদয়ে তোমার যে যে রূপ চিন্তা করেন, হে উরুগায়, সদ্ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহের জন্য তুমি সেই সেই বপুঃ (বিগ্রহ) প্রকট করিয়া থাক, তাঁহারা তোমার সেবাসুখোৎসুক হইয়া ভক্তির অনুকূল নিজের যেমন যেমন দেহ চিন্তা করেন তুমি সেই সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত অর্থাৎ তাঁহাদের অভীপ্সিত দেহের দ্বারা **নিত্য সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সেই সেই শরীর তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্তি করাইয়া থাক।**" এই শ্লোকটির মধ্যে কয়েকটি বাক্যের মর্ম্মার্থ অবধারণ করুন। ভক্তের হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধি মন অহঙ্কার এবং চিত্তে যাহা নিশ্চয়তা, যাহা সঙ্কল্প বিকল্প, যাহা অভিমানাদি বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহা যখন ভক্তি পরিভাবিত হৃদয় হইতে প্রকাশ পায়, তখন তাহাতে প্রাকৃত মিথ্যা কল্পনার আশঙ্কা কোথায় ? সমস্ত বৃত্তিই যে চিদানন্দ শক্তি **ভক্তিরই বিলাস বৈচিত্র্য,** কেননা তাঁহাদের হৃদয় ত ভক্তি দ্বারা পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের ভক্তির অনুকূলে যে নিশ্চয়, যে সঙ্কল্প, যে অভিমান, তাহা সেই ভগবদ্ভক্তিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হৃদয় হইতে উদিত হইতেছে। তাহাতে আবার তাঁহারা "শ্রুতেক্ষিতপথেই" ভক্তির অনুকূল নিশ্চয় সঙ্কল্প অভিমানাদি করেন, তাৎপর্য্য এই যে বেদাদি শাস্ত্রে অনাদিকাল হইতে বর্ণিত সাধুগুরু মুখ নিঃসৃত ভক্তির পরিকর পদার্থ সমূহ শ্রবণ করিয়াই সেই শাস্ত্রসিদ্ধ ভক্তিপরিকর পদার্থে যে হৃদয়ের নিশ্চয়তা সঙ্কল্প অভিমানাদি তাহা ত আকাশ কুসুমের ন্যায় অপ্রসিদ্ধ মনঃকল্পনা নহে। "হে উরুগায়" (বহুধা গীয়তে), অনন্তরূপে তুমি শাস্ত্রাদিতে গীত হইতেছ, সুতরাং **সাধুশাস্ত্র সম্মত যে রূপে তোমাকে যে যেভাবে চিন্তা করে তাই যে তুমি**। তুমি "ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃদয়ে" "আস্সে"—নিরন্তর অবস্থান করিতেছ। ভক্তহৃদয়ে ভক্তির অনুকূল যাহা ভক্ত চিন্তা করেন তাহা মিথ্যা কল্পনা নহে, কেননা ভক্তিবশ ভক্তবৎসল ভগবানই তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, পরমাত্মস্বরূপের ন্যায় উদাসীন হইয়া শুদ্ধ কর্ম্মপ্রেরক রূপে বাস করেন না, ভক্তবৎসল ভক্তির ভগবান্ রূপেই বাস করিয়া তাঁহাদের ভক্তিবাসিত হৃদয়ের বৃত্তিসকল **স্বয়ংই পরিচালিত করেন।** ভগবৎকর্ত্তৃক ভক্ত হৃদয়ের এই পরিচালনা সামান্য নহে। ইহা 'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'র ন্যায় পরিচালনা নহে, ইহা 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এর ন্যায় পরিচালনা নহে, **ইহা ভক্তহৃদয়ে ভক্তিযন্ত্রিত ভক্তির অধীন ভগবানের 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং' এর পরিচালনা।** ধর্ম্মার্থকাম এমন কি মোক্ষসুখাদিকেও অতিতুচ্ছ বোধ করিয়া যাঁহারা কেবল পরমপ্রেমাস্পদ পরমপ্রেমসেব্য রূপে শ্রীভগবানের প্রাপ্তির জন্য বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত ভগবৎ প্রেমসেবা প্রাপ্তির উপায়ীভূত সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা পবিচালিত হৃদয়ে চিন্তিত সিদ্ধদেহের চিন্তন করেন, তাঁহারা মিথ্যা কল্পনা মাত্র করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবল্লোকে শোভারূপে নিত্য বিদ্যমান যে সকল পার্ষদ বিগ্রহ আছেন, ভক্তি সংস্কার বলে তাঁহাদের **স্বয়ং আবির্ভাবকেই** সাধক ভক্ত মনন করেন। ভক্তের হৃদ্বৃত্তি ভগবান্ই সাক্ষাৎ পরিচালিত করিয়া থাকেন। শুনুন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ শ্রীগীতা।

অস্যার্থঃ।—যাঁহারা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি সুখাকাঙ্ক্ষা এবং তত্তৎ প্রাপ্তির সাধন কর্ম্ম জ্ঞানাদি পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাত্র আমাতেই যুক্তহৃদয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক প্রেম সেবার অনুকূল ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগই দান করি যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা তাঁহারা আমাকে স্বাভীপ্সিত প্রেমসেব্যরূপে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীগীতার এই শ্লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখুন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে ভগবৎ প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তের ভক্তিবাসিত হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম-সেবার উপযোগী যে সিদ্ধ দেহের চিন্তন এবং চিন্তিত সিদ্ধ দেহে যে ভগবৎ মানসিক সেবাদি ব্যাপার, **তাহা সমস্তই নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দময়**। সেই নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দময় সেবাদি কার্য্যে যে প্রবৃত্তি তাহা সাক্ষাৎ ভগবানেরই ভক্তিশক্তির প্রেরণা, সুতরাং **কল্পনা মাত্র নহে**।

ভগবৎ সেবা চিন্তনের একটি আখ্যায়িকা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, শ্রবণ করুন। পুরাকালে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানপুর নামক গ্রামে কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি দরিদ্র হইলেও নিজকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়া গুরুতর দারিদ্র্যাবস্থাতেও শান্ত থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণ সরলবুদ্ধি ছিলেন। কোন এক সময়ে বিজ্ঞতম বিপ্রদিগের সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। **বৈষ্ণব ধর্ম্ম মনের দ্বারাও সিদ্ধ হয়**, এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যনিবন্ধন মনে মনেই ঐ ধর্ম্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গোদাবরীনদীতে স্নান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে নিশ্চলমনে নির্জ্জন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়ামাদির দ্বারা স্থির হইয়া মনে মনেই শ্রীহরিমন্দির চিন্তা করিয়া সেই মন্দির মধ্যে নিজের অভিমত শ্রীহরি মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, এবং ঐ প্রকার মনে মনেই নিজে পবিত্র পট্টবসন পরিধান করিলেন, পরে মনে মনেই সেই মন্দিরস্থ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। পরে পরিধেয় বসনে দৃঢ়রূপে কটি বদ্ধ করিয়া হরিমন্দির সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক হরিমূর্ত্তিকে পুনশ্চ প্রণাম করিয়া সুবর্ণ কলসী দ্বারা গঙ্গাদি তীর্থ সমূহের জল আনয়ন করিলেন। ঐরূপ মনে মনেই নানাবিধ বহুমূল্য উত্তম উত্তম ভগবৎ পরিচর্য্যার দ্রব্যাদিও আনিলেন, পরে ভগবানের স্নান বস্ত্রপরিধাপন তিলকরচন মাল্যার্পণ ভোগনিবেদন আরাত্রিকাদি পর্য্যন্ত মহারাজোপচারে সম্পন্ন করিলেন। এই প্রকারে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ মানসিক ভগবৎ সেবাসুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে কোন একদিন মনে মনে সঘৃতপায়সান্ন রন্ধন করিয়া সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভগবানের ভোগের জন্য সেই পাত্র উচ্চ করিয়া ধরিলেন, তখন পরমান্নের উষ্ণতা নিবন্ধন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া "হায়! পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল! ভগবানের ভোগে লাগিল না!" এই বলিয়া দুঃখে সেই পরমান্নের পাত্র পরিত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের সেই মানসিক চিন্তাসমাধিও ভগ্ন হইল। তখন

ব্রাহ্মণ **বাহিরেও সাক্ষাৎ দগ্ধাঙ্গুলীর পীড়া অনুভব করিলেন,** তিনি দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীযুগল সত্যই দগ্ধ হইয়াছে। মানসিক ভগবৎ সেবার পরম সত্যতা ব্রাহ্মণের নিকট প্রকাশ পাইল। এদিকে বৈকুণ্ঠে প্রিয়াবর্গ সমন্বিত ভগবান্‌ও হাস্য করিয়া উঠিলেন; লক্ষ্মী আদি প্রিয়াগণ হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বৈকুণ্ঠীয় বিমানে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বীয় সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মীদিগের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণকে সেবোপযোগী করিয়া নিজ সমীপে স্থান দান করিলেন। ভগবন্মানসিক সেবার এই আখ্যায়িকায় উক্ত ব্রাহ্মণের মানসিক সাধনটি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানানুগ বৈধীভক্তির সাধন। এখন বুঝুন, ভগবানের ভগবত্তার পরম সার বিশুদ্ধ মাধুর্য্যের জ্ঞানানুগ অতিশয় বলবৎতন্ময়তা-উৎপাদক রুচি প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তি সাধনে সাধক ব্যক্তি ভগবন্মাধুর্য্যময়ী সেবার আনুকুল্যে যে নিজের **সিদ্ধদেহের চিন্তন** করেন এবং **মানসিক সেবাদি** করেন তাহা কত **পরম সত্য।**

ভক্তের নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ দেহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দুইটি প্রধান মত বলিলাম তাহা শাস্ত্রসম্মত মহানুভবিক। একটি মত সাধকের শুদ্ধ ভক্তিবাসিত **শুদ্ধাত্মাতে ভগবল্লোকীয় নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ বিগ্রহের সংযোগাবির্ভাব।** আর একটি শুদ্ধভক্তিবাসিত **শুদ্ধাত্মতত্ত্বেরই ভগবৎসেবোপযোগী চিদ্দেহাদিরূপে সংগঠনাবির্ভাব।** ভক্তির তারতম্যে ভগবান্ উভয়বিধ প্রকারেই পার্ষদগতি দান করেন। ইহা ভিন্ন, কোথাও ভগবদিচ্ছায় স্পর্শমণি ন্যায়ে সেবার যোগ্যতানুসারে সাধকের **প্রাকৃত দেহই অপ্রাকৃত পার্ষদাকার ধারণ করে,** যথা ধ্রুবের সেই দেহই বৈকুণ্ঠপার্ষদরূপ ধারণ করিয়াছিল। অন্য সর্ব্বনিরপেক্ষ কেবলমাত্র ভগবন্মাধুর্য্যাপেক্ষ ভগবৎপ্রেমসেবাচাতুরীসুদক্ষ ভাগ্যবান্ সাধকের পক্ষে রুচিপ্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিমার্গে এই **সিদ্ধদেহ চিন্তন পূর্ব্বক সেই দেহে মানসিক ভগবৎসেবাই মুখ্যসাধন।** বস্তুতঃ ভক্তি ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ এই রাগানুগামিনী ভক্তির সাধনে, তার মধ্যে **গোপীভাবানুগ ভক্তি সাধনটি চরমপরমোৎকর্য প্রাপ্ত হইয়াছে**; ইহার তুল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষের সাধন আর নাই। উপযুক্ত অধিকারে যোগ্য সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে এই সাধন দ্বারা আত্মার সর্ব্বোর্দ্ধ চরম পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, যাহার তুলনা হয় না।

শ্রীগুরো রাধিকানাথ দয়ার্দ্র দীনপাবন।
গোপীভাবামৃতাব্ধৌ মাং স্বরূপেণ নিমজ্জয়॥

সাধক, একবার স্মরণ করুন অমন্দানন্দবৃন্দাকাননে পরমানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ। বৃন্দাবনে কালিন্দীর জলে রসালকমলমৃণালের সুরসাস্বাদনের লালসভরে চঞ্চলকলহংসকুল কলকণ্ঠস্বনঃ সহ কেলিসন্তরণ

করিতেছে। মন্দপবনে আন্দোলিত কমলকুবলয়কোকনদকুমুদপ্রমুখ জলজ-কুসুমগণ হইতে পরিমলে পূরিত পরাগ সমূহ ক্ষরিত হইয়া পরীত ব্যাপ্ত যামুন স্রোতে ভাসমান হইতেছে, যেন বিবিধবর্ণে চিত্রিত বিস্তৃত সূক্ষ্ম বসন-পরিহিতা মিহিরদুহিতা তরলতরঙ্গমালায় ভূষিতা হইয়া সলীলগতিখেলাঞ্চিতা রূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। সুখময়শীতলশ্যামলসলিলা, শ্যামরতিচপলা ব্রজকুলবালাদিগের শ্রুতিসুখদায়িনী মুরলীকাকলীসমকলকলনাদিনী কলিন্দ-নন্দিনী যমুনার কূলে কেলিকদম্বমূলে কৌতুকিনী কলাপিনী সঙ্গিনী সঙ্গে স্মরমদান্ধ কলাপিবৃন্দ আনন্দভরে পিঞ্ছ প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতেছে, আর কেকা কেকা রবে দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। তরুণতমালতরুর নবনীলপল্লবে অবলম্বিত রোলম্বকুলের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চকিত শারীশুক কপোতীকপোতবৃন্দ ক্ষণমৌনব্রত থাকিয়া পরে স্বীয় স্বীয় রবে যেন ধন্যবাদ দিতেছে। প্রফুল্লিতবকুলে আলিঙ্গিত চূতলতিকাবধূ শীতল মলয়ানিলের মৃদুল চুম্বনে মুকুলচ্ছলে যেন বিপুল পুলক ধারণ করিয়াছে। মধুর রসালমুকুল ভক্ষণে অধিকতর সুস্বর লাভ করিয়া কোকিলকুল আনন্দভরে বধূকুলের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিবার জন্যই যেন দ্বিগুণতর উজ্জ্বল কলস্বর বিস্তার করিতেছে। সাধক, স্মরণ করুন, সেই বৃন্দাবনে চম্পকবককুরুবকনাগপুন্নাগাদি পুষ্পিত বৃক্ষগণে পরিবেষ্টিত, কুসুমিত মঞ্জুল ব্যঞ্জুল কুঞ্জসমূহে সমাবৃত, বিকসিতস্থল-শতদলকানন মধ্যে অমন্দমরন্দসুগন্ধে উন্মদ মধুপবৃন্দের গুঞ্জনে গুঞ্জিত, উচ্চ-পরিসর কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার দীপ্তিকর মণিময় অষ্টকোণান্বিত যোগপীঠভূমির মধ্যস্থলে অতিমনোহর মহাসুরতরুবরের পরিসর মূলে মণিময় মণ্ডপে সিতচ্ছত্রশোভিত বিবিধরত্নখচিতমহাসিংহাসনোপরি নবকিশোরী রাধিকাসুন্দরী সহ মদন-মনোমোহকর নবকিশোরবর শ্যামসুন্দর বিরাজ করিতেছেন। ললিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম অঙ্গ যেন অনঙ্গরসমাধুরীতরঙ্গে বিভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। আহা মরি! অরুণিম চরণতলের শোণিমরাগে রঞ্জিত এবং নীলিমতমতমালদলোপমচরণো-পরি লেপিত মৃগমদের সঙ্গলাভে শ্যামলিত এবং শুভ্রনখাঞ্চলের চন্দ্রিকায় ধবলিত হইয়া মণিময় নূপুর যেন সূক্ষ্ম ত্রিবেণীধারা বক্ষে ধারণ করিতেছে। লম্বিতবনমালাগ্রচুম্বিতচারুচরণসরোজযুগলের চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠিত চঞ্চরিকা শত শত নত হইয়া যেন বন্দনা করিতেছে। ইন্দ্রনীলমণিপীঠতুল্য পরিসর নিতম্বোপরি

মণিময় রসনা পরিবীত পীতবসন যেন নব মেঘে স্থির সৌদামিনী জড়িত হইয়াছে। কটিপুরোভাগে বদ্ধপুরটপট্টাম্বরের কুঞ্চিত অগ্রভাগ জঙ্ঘাযুগলের মধ্যে লম্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে। নাভিসরোবর হইতে বাল ব্যাল তুল্য সূক্ষ্মরোমজাল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যেন হৃদয়গিরিগুহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ত্রিবলিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে বিলম্বিত গ্রথিততারকাবলীর মত হীরকহারাবলী-শোভিত নিবিড়নীলপ্রসর উরঃস্থলপর মণিবর কৌস্তুভ যেন নীলাম্বরে উদিত দিনকরের মত কিরণ বিকীরণ করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুঃসদৃশী মালা বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে, করিশুণ্ডবিজয়িভুজদণ্ডযুগলে মণিবন্ধ-বলয়কঙ্কণ শোভিত হইতেছে। কোমলকরকিশলয়ে মণিময় মুরলী বিরাজ করিতেছে। শোণিমাধরবান্ধুলীর কোলে দন্তাবলীকুন্দকুসুমকলি আস্যচন্দ্রের মৃদুহাস্যচন্দ্রিকায় যেন বিকসিত হইতেছে। শুকচঞ্চুবিজয়িমঞ্জুনাসিকাতে মণিবর মৌক্তিক তিলপুষ্পসদৃশ শোভা পাইতেছে। শ্রুতিমূলে চঞ্চল মীনাকৃতি মণিকুণ্ডল কপোলযুগলনীলমণিদর্পণে ঝলমল করিতেছে, যেন নীল যমুনার স্বচ্ছ সলিলে সুবর্ণমীন খেলা করিতেছে। বদনকমলে খঞ্জনগঞ্জন চঞ্চল নয়ন-যুগল মঞ্জুল নর্ত্তন করিয়া কর্ণতটান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছে। আহা! সজ্জিত নীল অলিমণ্ডলী অর্দ্ধকুণ্ডলী হইয়া যেন ভ্রূবল্লী রচনা করিয়াছে। কুটিল-চূর্ণকুন্তলবেষ্টিত চারুললাটফলকে চন্দনতিলকবিন্দু যেন নীলাম্বুনিধিতে ইন্দুর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। নিবিড়নীলজলদনিভ কুন্তলজালে মালতী-মালাবেষ্টিত শিখিশিখণ্ডমণ্ডিত মোহনচূড়াটি মৃদুল অনিলভরে আন্দোলিত হইতেছে। বামাংশে মিলিত কষিতকনকাঙ্গবরা নবেন্দীবরনিন্দিশ্যামাম্বরা শ্যামপ্রেমরসপীযূষধারার ন্যায় কান্তিলহরীভরা কৃষ্ণসুখসিন্ধুসুরতসুরসরিদ্বরা মদনমোহনমনোহরা শ্রীরাধা শোভা বিস্তার করিতেছেন। কখনও রাধাঙ্গকান্তি শ্যামাঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরায়মাণ করিয়া তুলিতেছে। আবার কখনও শ্যামনীলাঙ্গজ্যোতির মধ্যে রাধাঙ্গ মরকত রূপ ধারণ করিতেছে। যুগলকিশোরের সুখময় সেবনে অতি নিপুণা ব্রজকুলললনা-ললামভূতা ললিতা ললিতকরকমলে তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিয়া উভয়ের বদনে অর্পণ করিতেছেন। তারাবলীবসনা সৌদামিনীনিভাননা যুগোল-কিশোরের নর্ম্মপরিহাসরসসুরদীর্ঘিকা বররসিকা সখী বিশাখিকা মণিদণ্ডযুক্ত

চারুচামরিকার মৃদুসঞ্চালনে উভয়ের শ্রমাপনোদন করিতেছেন। চিত্রানাম্নী সহচরী চন্দনঘনসারকুঙ্কুমমৃগমদবিলেপন ধীরে ধীরে রাধা শ্যামের অঙ্গে লেপন করিতেছেন। চম্পকবর্ণা চম্পকলতা সখী প্রফুল্লমুখী হইয়া বনকুসুমমালা উভয়ের কণ্ঠে অর্পণ করিতেছেন। রঙ্গদেবী সুদেবী সহচরীদ্বয় রাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন "রাধয়া মাধবো দেবো", কেহ উত্তরে বলিতেছেন "মাধবেনৈব রাধিকা।" কেহ বলিতেছেন "মাধবারাধিকা কা বা", অপরে তাহার উত্তরে বলিতেছেন "রাধিকৈকা ন চাপরা।" তুঙ্গবিদ্যা মৃদঙ্গ বাদ্য করিতেছেন, ইন্দুরেখা মনোহর রাসলাস্যবিন্যাসে উভয়কে বিনোদন করিতেছেন। শ্রীরূপমঞ্জরী আদি প্রিয় নর্ম্মসহচরী সকলেই "জয় রাধে" "জয় শ্যাম" ইত্যাদি জয়সূচক ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। লবঙ্গ মঞ্জরী সখী সুবর্ণপাত্রোপরি মিষ্টান্ন রাখিয়া রাধা মাধবের শ্রীমুখে অর্পণ করিতেছেন। কস্তুরী নাম্নী সখী সুবাসিত শীতলবারি সমর্পণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করাইতেছেন। শেষে শ্রীল রতিমঞ্জরী দীপালি জ্বালাইয়া প্রাণকোটিনির্মঞ্ছন যুগোল কিশোরের মঙ্গল নির্মঞ্ছন আরাত্রিক করিতেছেন। গুণবতী মঞ্জরী উভয়ের চরণকমল নিজ হৃদয়কমলে রাখিয়া আনন্দে নয়ন-সলিলে চরণ প্রক্ষালন করিতেছেন, আর প্রাণকোটিপ্রিয় রসাল নাম "রাধামদনগোপাল" বলিয়া যুগল চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছেন। মধুর মৃদঙ্গকাংসকরতালঘনরবে মুখরিত, নৃত্যগীতবাদিত্রানন্দে পূরিত, "জয় রাধে" "জয় শ্যাম" "জয় রাধামদনগোপাল" ইত্যাদি ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে তরুলতা পশুপক্ষী মহানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। কলনাদিনী যমুনা তখন কলকলরবে যুগলমিলনমহোৎসবের যেন অভিনন্দন গান করিতেছেন। তখন কৃষ্ণাধরের ফুৎকারে উদ্গারিত সুধাসার-বর্ষণসম মোহনমুরলীর কাকলী গঞ্জনকলকূজনে বৃন্দাবনের বিজন বনে আনন্দ-প্লাবন করিয়া তুলিল। সাধক, এই বৃন্দাবনে প্রিয়াবৃন্দ সহ আনন্দকন্দ গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দের সেবানন্দ মকরন্দ সুগন্ধে যদি মন উন্মদান্ধ হয়, তাহা হইলে **গোপীপ্রেমামৃত রস সেবন করুন**। এই সিদ্ধ-রসের সংস্পর্শগুণে আপনার আত্মা শ্রীগোবিন্দানন্দ রস সাক্ষাৎ করিয়া চরম কৃতকৃতার্থ হইবে। ভক্তিই রস ; পরতত্ত্ব যেমন রস স্বরূপ, তাঁহার সাধন ভক্তিও

তদ্রূপ রস স্বরূপ।* যদি অদ্বয়জ্ঞানানন্দ পরতত্ত্বকে রসরূপে আস্বাদন

*শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি," অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্ব রসস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মরসস্বরূপকে রসরূপে লাভ করিয়াই জীব আনন্দী হয়, অর্থাৎ প্রশস্তানন্দে পূর্ণ হয়। তাৎপর্য্যার্থ এই, জীবাত্মচৈতন্য পরব্রহ্মেরই বহিশ্চর অংশ হইলেও অনাদি কাল হইতে বহির্ম্মুখতা রূপ বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া মায়াকবলিত হইয়াছে। আনন্দের অংশ জীব সর্ব্বদাই পূর্ণানন্দের অনুসন্ধান করিতেছে। কি প্রকারে সে আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে তাহার জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেও মায়াগ্রস্ততা নিবন্ধন মায়ামরীচিকার ন্যায় আনন্দের ছায়ামাত্র ভ্রান্তিময় চতুর্দ্দশ ভুবনপথে কেবল গতায়াতই করিতেছে। তাই আনন্দের ছায়ামাত্র মায়িক জগতে বিচরণশীল শ্রান্ত ভ্রান্ত জীবকে উদ্দেশ করিয়া ভাগবতী শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন,—ওহে রসাকাঙ্ক্ষিন্ জীব, তোমার এই রসাকাঙ্ক্ষাটি আত্মসিদ্ধ স্বতঃ আকাঙ্ক্ষা; ইহা সত্য বটে, তাই তুমি এক বিন্দু আনন্দ রসের আকাঙ্ক্ষায় এই সংসার মরুভূমিতে জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। হায় আনন্দলিপ্সু ভ্রান্ত পথিক! তুমি ধনজনস্ত্রীপুত্রদেহাদিতে কত যত্ন কত তৎপরতার সহিত কত প্রাণপাতকর দুঃখ তাপ সহন করিয়া তোমার বাঞ্ছিত একটু আনন্দকণা অনুসন্ধান করিতেছ, কিন্তু কোথাও তাহা পাইতেছ না। হায় মূঢ়! তোমার স্ত্রীপুত্রাদি ত তোমার মত নিজ নিজ বাঞ্ছিত আনন্দানুসন্ধানেই ভ্রমণ করিতেছে, ইহা তুমি জান না। ইহারাও যে তোমার মত ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, তোমার মতই আনন্দবুভুক্ষু হইয়াই আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে। হায়! সকলেই যে আনন্দের ভিক্ষুক, কে কাহাকে আনন্দ ভিক্ষা দান করিবে? হায়! জাগতিক সমস্ত পদার্থই যে **ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, ভয়সঙ্কুল, ক্ষণভঙ্গুর,** এবং সুখের ছায়ার আবরণে আবৃত **দুঃখময়**। কে তোমাকে, তোমার ক্ষুদ্রতাকে বৃহৎ করিয়া তুলিবে? কে তোমাকে পূর্ণ করিয়া তোমার অপূর্ণতা হাহাকারের নিবৃত্তি করিবে? কে তোমাকে নির্ভয় করিবে? কে তোমাকে নিত্য শান্তি দান করিবে? কে তোমাকে বাঞ্ছিত প্রকৃত বিমল আনন্দ দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিবে? "ভূমা বৈ সুখং"—যিনি স্বয়ং ভূমা, তিনিই তোমাকে বৃহৎ করিতে পারেন। "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—যিনি স্বতঃ পূর্ণ তিনিই তোমার পূর্ত্তিবিধানে সক্ষম। "যদ্বিভেতি ভয়ং স্বয়ং"—যিনি স্বতঃ নির্ভয়, ভয় ও যাঁহাকে ভয় পায়, তিনিই তোমাকে নির্ভীক করিতে পারেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"—যিনি নিত্যসত্য তিনিই তোমাকে নিত্যশান্তি দিতে সক্ষম। "বিজ্ঞানমানন্দম্," "রসো বৈ সঃ"—যিনি স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, যিনি স্বয়ংই রস, কেবল তিনিই তোমার বাঞ্ছিত আনন্দ রস তোমাকে আস্বাদন করাইয়া তোমাকে আনন্দী করিয়া প্রশস্ত আনন্দবান্ করিয়া তুলিতে পারেন, আর কেহ পারেন না। নিত্যজ্ঞানানন্দরসস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বের অনুভবটি যদি নিত্য জ্ঞানানন্দরসরূপেই হয়, তাহা হইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দই "রসো বৈ সঃ" শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য। পরব্রহ্মের পূর্ণতম রসময় বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর হাস্য করুণবীর

প্রভৃতি দ্বাদশ রসের পরিপূর্ণতম প্রকাশ যেমন একমাত্র শ্রীগোবিন্দে পরিলক্ষিত হয়, এমন আর অন্য কোনও ভগবদ্‌বিগ্রহে প্রকট পরিলক্ষিত হয় না। ইহা শাস্ত্রশতোদ্ঘোষিত সুনিশ্চিত। ভাববিশিষ্ট লীলাপরিকর বৈশিষ্ট্যে এই ভগবদ্রসেরও অনন্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য হয়। **ভাব ভিন্ন রসের স্থিতি নাই, আবার রস ভিন্ন ভাবেরও স্থিতি নাই।** তাই শ্রুতি বলেন, "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্"—অনীড়াখ্য অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম ভাবের দ্বারাই গ্রাহ্য। "ভাবগতেন চেতসা পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"—ভাবতাদাত্ম্যাপন্ন চিত্তের দ্বারাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। ভক্তের ভাবের তারতম্যে ভগবানের রসরূপে আবির্ভাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যত প্রকার ভগবদ্ভাব আছে, সকল ভাবের শিরোভূষণ অনির্ব্বচনীয় মধুরাখ্য মহাভাব। এই মহাভাবনিষ্ঠ ভগবদ্রসই পরম রস। মহাভাবভাবিতাত্মা সাধকের নিকট ভগবানের যে রসস্বরূপে আবির্ভাব হয় তাহাই বৃন্দাবনে নিভৃতনিকুঞ্জকেলিরসবিলাসী শ্রীগোবিন্দ। **মহাভাবের নামই গোপীভাব।** আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপী নাম্নী ভগবানের পরা প্রকৃতির ভগবদ্বিষয়ক পরমভাবই গোপীভাব। এই ভাবের অনুগতভাবে ভাবিতাত্মা সাধকের গোবিন্দ-পদারবিন্দে ভাবধারণটি পরব্রহ্মীয় আনন্দরসাস্বাদনের চরম সাধন। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। সাধকাত্মাতে এই মহাভাব আবির্ভূত হইয়া যে ভগবদীয় মহামাধুর্য্যরসের অভি-ব্যক্তি করে তাহাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই রস আস্বাদন করিতে পারিলে জীব ভগবদানন্দে পরমানন্দী হইতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তিসাধন বলিতে এক প্রকার বিশেষ জ্ঞানেরই সাধন বুঝিতে হইবে। জ্ঞান সামান্য, আর জ্ঞান বিশেষ। সামান্য জ্ঞান বলিতে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মরূপে পরতত্ত্বের জ্ঞান, আর জ্ঞান বিশেষ বলিতে সবিশেষ ভগবদাখ্য পরতত্ত্বের জ্ঞানকেই বুঝায়। সুতরাং ভক্তি জ্ঞানবিশেষেরই নামান্তর। দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে জ্ঞাননিষ্ঠ জাতি বিশেষই ভক্তি। যেমন তৃণারণিমণ্যাদিজন্যতাবচ্ছেদক রূপে বহ্নিনিষ্ঠ এক প্রকার জাতি বিশেষের সিদ্ধি দার্শনিক ন্যায়ে প্রসিদ্ধা। অর্থাৎ বহ্নি বলিতে বহ্নিত্বজাতিসামান্যাবচ্ছিন্ন বুঝাইলেও ইহা তৃণজন্য তার্ণ বহ্নি, অরণিজন্য আরণ্য বহ্নি, ইত্যাদি স্থলে তার্ণত্বাদি জাতি বিশেষ যেমন সামান্য বহ্নি হইতে উক্ত বহ্নিকে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট করাইয়া বোধ করায়, উহা যেমন তার্ণত্ববিশিষ্টবহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নিই বুঝায় এবং উহা যেমন ঐ বহ্নিনিষ্ঠ জাতিবিশেষই, এইরূপ পরতত্ত্বজ্ঞানটি জ্ঞানত্বজাতিসামান্যাবচ্ছিন্ন হইলেও পরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি বিলাস-বৈচিত্র্যের অনুভবজনকতাবচ্ছেদকরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ জাতিবিশেষেরও সিদ্ধি হয়। সুতরাং **ভগবদৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যানুভাবক জ্ঞানবিশেষের নামই ভক্তি।** আবার এই ভক্তিই ভগবদৈশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের কার্য্যভেদে ঐশ্বর্য্যবিষয়িনী (বৈধীভক্তি) এবং মাধুর্য্য-বিষয়িনী (রাগভক্তি) রূপে প্রকাশ পায়। ভক্তিকে যে জ্ঞানবিশেষ বলা হইতেছে তাহা

আত্মাকে রসভাবিত করিয়া পরব্রহ্মের চরম রস আস্বাদনে চিত্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে মহাভাববতী পরাশক্তি গোপী অনুগত ভক্তির সাধন করুন।

আমাদের ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানের মত মায়িক উপাধিবিশিষ্টজৈবজ্ঞান নহে, অথবা মায়িক উপাধিবিমুক্তশুদ্ধচিদাত্মজৈবজ্ঞান নহে। ভগবানেরই স্বরূপভূত শক্তিরূপ জ্ঞানই ভক্তি। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ আহ্লাদিনী শক্তির সারাংশের সহিত মিলিত ভগবানেরই নিত্যসিদ্ধ চিৎ-শক্তির সার যে জ্ঞান তাহাই এখানে জ্ঞান বিশেষ, ইহাই ভক্তি। এই **ভক্তিশক্তিটি ভগবানে অপৃথক্ বিশেষণরূপে:এবং নিত্য পরিকর ভক্তগণে পৃথক্ বিশেষণরূপে** অনাদি কাল হইতেই ভগবল্লোকে অবস্থান করিয়া ভগবান্ এবং পরিকর ভক্ত এই উভয়কেই সাম্যাতিশয়রহিত আনন্দ দান করিতেছেন। যেমন যুবক ব্যক্তির বর্ত্তুল কোমল ভুজ যুবতীর স্কন্ধে নিহিত হইলে যুবক যুবতী উভয়েরই সুখের উদয় হয়, এখানে যুবকের ভুজ যুবক হইতে অভিন্ন বিশেষণ এবং যুবতীর স্কন্ধে নিহিত হওয়ায় যুবতীর পৃথক্ বিশেষণ হইয়া যুবক যুবতী উভয়কেই সুখ দান করে, সেইরূপ ভগবানেরই স্বরূপ শক্তির বৃত্তি ভক্তিশক্তিও ভগবানে অভিন্ন বিশেষণ হইয়া অনাদি কাল হইতে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিত্যপরিকর-ভক্তাশ্রয়া হওয়ায় নিত্যপরিকর ভক্তে পৃথক্ বিশেষণ রূপে অবস্থিতি লাভ করিয়া ভক্ত ভগবান্ উভয়কেই পরমানন্দ দান করিতেছেন।

ভক্তিতে যে সম্বিদংশসার তাহারই সর্ব্বত্র হেতুতা, অর্থাৎ ভগবৎ প্রকাশ, ভক্তের সিদ্ধদেহ গঠন ইত্যাদি ভক্তির কার্য্য সমূহের প্রতি ঐ জ্ঞানাংশই সাধকতম কারণ বিশেষ। সাধন ভক্তিটি সাধ্য ভাবভক্তি রূপে সাধকাত্মাতে যখন আবির্ভূত হয় তখন সেই ভক্তকে জাতরতি ভক্ত বলা যায়। মনে রাখিবেন, ভক্তি এক অখণ্ড ভগবৎ শক্তি বিশেষ। ইহার আবির্ভাবের অবস্থাভেদে সাধন ভক্তি এবং সাধ্য ভাবভক্তি এই প্রকার পৃথক্ বলা যায়। যেমন একই বস্তুর অপক্কাবস্থা এবং তাহারই পক্কাবস্থা। অপক্কাবস্থার নাম সাধন ভক্তি, পক্কাবস্থার নাম সাধ্য ভাবভক্তি বা প্রীতি বা রতি। তাদৃশ জাতরতি ভক্তহৃদয়স্থা ভাবভক্তিটি নিজের জ্ঞানাংশেই রসের সর্ব্ববিধ কারণ হয়। অর্থাৎ জাতরতি ভক্তহৃদয়ে যে রস নিষ্পত্তি হয় তাহা ঐ সাধ্য ভাবভক্তির জ্ঞানাংশের হেতুতা বলেই হয়। জাতরতি ভক্তহৃদয়ে ভাবভক্তিটি স্থায়ি-ভাবতা প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞানাংশের শক্তি বলেই বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারীকে অতি ঝটিতি আবির্ভাবিত করাইয়া স্বয়ং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাংশে রসরূপে নিষ্পন্ন হয়। জাতরতি ভক্তের হৃদয়ে ভাবটি স্থায়ী দশা প্রাপ্ত হইলে স্বীয় ভাবোচিত ধাম লীলাপরিকর এবং তদুচিত রূপগুণলীলাবয়োবেশাদি বিশিষ্ট ভগবান্‌কে আবির্ভূত করায়। তখন ঐ স্থায়ী ভাবটি আহ্লাদষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্‌কে বিষয়ালম্বন করিয়া, স্বজাতীয় ভাববিশিষ্ট কেবল আনন্দময় নিত্যলীলাপরিকরকে আশ্রয়ালম্বন করিয়া এবং ভগবদ্ধাম ভগবৎ রূপগুণলীলাদিকে উদ্দীপন স্থানীয় করিয়া স্বয়ং উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহার নামই বিভাবের

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কতিপয়

বিভাবনা। ঐ স্থায়িভাব তাহার কার্য্যস্বরূপ গীতনৃত্য আদি অনুভাব এবং স্বেদ কম্প পুলকাদি মানসিক ভাবপ্রধান সাত্ত্বিক বিকার সকলকে প্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থায়িভাব হইতেই তরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন দৈন্য বিষাদাদি ব্যভিচারী ভাব সকলের সহিত মিলিত হইয়া এক অখণ্ড চমৎকারী রস রূপ ধারণ করে। যেমন একই দধি বস্তু ঘৃত মধু শর্করা মরিচ কর্পূরাদি নানাবস্তু সহ মিলিত হইয়া রসালা নামক এক আস্বাদ্য বস্তু হয় এবং তাহার আস্বাদন কালে যেমন চিত্র-রসের সাক্ষাৎকার হয়, এই প্রকার আহ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদংশসার ভাবভক্তিও নিজের জ্ঞানাংশের বলে বিষয়ালম্বন বিভাব আশ্রয়ালম্বন বিভাব উদ্দীপন বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী সমূহকে অতিঝটিতি উপস্থাপিত করিয়া আনন্দাংশে মিলিত করাইয়া ঐ ভাবভক্তি স্বয়ংই কোনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দাস্বাদরূপ হইয়া উঠে। এই প্রকারে ভক্তির সাধ্যাবস্থায় যে রসতাপত্তি হয় তাহার কারণ যে বিভাব এবং কার্য্য যে অনুভাবাদি তাহাদের উপস্থিতিটি ভক্তির জ্ঞানাংশের সাধকতমকারণতা বলেই হয়, আর আনন্দাংশটি সর্ব্বত্রই সুখরূপে অনুস্যূত হইয়া থাকে। তখন তাদৃশ ভক্তের এক রসাস্বাদনোপযোগী পদার্থ ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থে অন্তরিন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয়ের কোনও বৃত্তিই প্রবর্ত্তিতা হয় না। ভক্ত কেবলমাত্র রসতাদাত্ম্যবৃত্তিতেই অবস্থান করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় ভগবদীয় আনন্দরস বারিধিতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ইহা ভাগবতী প্রীতিবাসিত হৃদয়ের কোনও **অনির্ব্বচনীয় উল্লাসময় অনুভব বিশেষ,** সুতরাং জ্ঞান বিশেষই।

আবার ভক্তির সাধনাবস্থায় মহৎসঙ্গ মহৎকৃপার প্রভাবে জীবের ভাগবতী ভক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইতে ক্রমশঃ রতি পর্য্যন্ত ভক্তির সাধন সমূহের যে স্তর সকল প্রকাশ পায় সেই স্তরে স্তরে সাধকের যে সাধন তাহাতেও সর্ব্বত্র ভক্তির সম্বিদংশের (জ্ঞানের) সাধকতমহেতুতা। আনন্দাংশও সর্ব্বস্তরেই সাধনের তারতম্যে অনুস্যূত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। সাধনাবস্থায় এই আনন্দাংশ এবং সম্বিদংশ পূর্ণ প্রকাশিত হয় না বলিয়া রসটি যৎকিঞ্চিৎ অংশ রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে। নিষ্ঠা রুচি আসক্তির অন্তে ভক্তিটি রতি দশা প্রাপ্ত হইলে আনন্দাভিন্ন সম্বিৎটিও পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখনই সেই রতিতে রসের অভিব্যক্তি হয়। বস্তুতঃ কিন্তু ভজনের প্রথম আরম্ভ হইতেই রসাংশ তাহাতে থাকে। কেবল অনভিব্যক্ত আর অভিব্যক্ত এই মাত্র ভেদ। সুতরাং সাধনাবস্থা সাধ্যাবস্থা উভয় অবস্থাতেই ভক্তির রসতা সুনিশ্চিতা।

ভক্তিতে সমস্ত জ্ঞানের পর্য্যবসান। ভাগবতী ভক্তি শুদ্ধ চিদাত্মার ভগবৎপরিপোষণরূপ কর্ম্ম; সুতরাং চরম নৈষ্কর্ম্ম্য। ভক্তি ভগবানের সহিত তাঁহার নিত্য তটস্থশক্তি জীবাত্মাকে সেবোপযোগী করিয়া মিলিত করায়। সুতরাং ভাগবতী ভক্তি পরম যোগ। সাধন ভক্তির স্তরের ক্রম—

সতাং কৃপা, মহৎ সেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়ঃ। ভজনেষু স্পৃহা, ভক্তি, রনর্থাপগম স্ততঃ॥
নিষ্ঠা, রুচি, রথাসক্তিঃ, রতি, প্রেমাথ, দর্শনম্। হরে র্মাধুর্য্যানুভব, ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥

শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তির সহিত যখন যখন আমার মিলন হয়, তখন তখন তাঁহারা প্রায়শঃ আমাকে সাধন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নাদি করেন; আমি অজ্ঞ হইয়াও তাঁহাদের নিকট বিজ্ঞ সাজিয়া যে সকল প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে যাহা যাহা বলি তৎসমুদয় তাঁহারা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলোচনাও করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সেই আলোচনা প্রসারের জন্যই তাঁহাদেরই অত্যাগ্রহে কতকগুলি সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা, যাহা আমি সাধুগুরূপদেশে বুঝিয়াছি, তাহাই এক একটি প্রবন্ধাকারে নিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা ধারাবাহিক গ্রন্থের কোন নিয়মে লিখিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেও তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয্যবশতঃ "ধর্ম্ম" "শৌচ" "সত্য" "দয়া" প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থ নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থও তদ্রূপ কতকগুলি প্রবন্ধসমষ্টিই। সুতরাং সুধী পাঠকদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যদি এই পুস্তক দেখেন তাহা হইলে যেন কৃপাদৃষ্টিতেই দেখেন। বিশেষতঃ জীবনে লেখাপড়া শিক্ষার অবকাশ খুব কমই পাইয়াছি। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" জ্ঞানে যেন তাঁহারা ক্ষমাই করেন। ইতি শ্রীগুরুপূর্ণিমা, ২০শে আষাঢ়, সন ১৩৪৩ সাল।

ওঁ শ্রীমদ্ রাধিকানন্দ রাধিকানাথের সন্ন্যাস বিগ্রহের শ্রীপাদ-পদ্মোদ্দেশে মদীয় যাবতীয় কৃতি সমর্পিত হইয়া তাঁহারই সন্তোষ বিধান করুক। ওঁ শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদেভ্যো নমো নমঃ।

রাধিকানাথদেবস্য সন্ন্যাসবিগ্রহং ভজে।
মম সাধনসর্ব্বস্বং যস্য পাদাম্বুজাশ্রয়ঃ॥

সমাপ্তম্